স্বর্ণলতা প্রসঙ্গে

আজ থেকে একশো তেরো বছর আগে অর্থাৎ ইংরাজী ১৮৭৪ সালের ২৮শে এপ্রিল (বাং ১২৮১ সাল) তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়। যে সময়ে ইংরাজী উপন্যাস সাহিত্য, বাংলা উপন্যাসের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল—সেই সময়ে তারকনাথ গ্রামবাংলার মধ্যবিত্ত পরিবারের সুখ-দুঃখের এক নিখুঁত চিত্র এই 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের মাধ্যমে তুলে ধরেন। বাঙালি পাঠক-পাঠিকাদের কাছে 'স্বর্ণলতা' অত্যন্ত সমাদর লাভ করে।

তারকনাথ পেশায় ছিলেন মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস-করা এক কৃতবিদ্য চিকিৎসক। তাঁকে সরকারী চিকিৎসক রূপে দীর্ঘ ২২ বৎসর কাল কলকাতা, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, যশোহর ও বক্সারে কাটাতে হয়েছে। প্রথমত অ্যাসিস্টেন্ট সার্জন রূপে তিনি যোগদান করেন। পরে ১৮৭১ সালে ডেপুটি-সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ ভ্যাক্সিনেশন, এবং সর্বশেষে তিনি বক্সারে প্রথম শ্রেণীর অ্যাসিস্টেন্ট সার্জন রূপে সেন্ট্রাল জেলের চিকিৎসক হন।

তারকনাথের জন্ম ১৮৪৩ সালের ৩১শে অক্টোবর, নদীয়া জেলার অন্তর্গত বাগআঁচড়া গ্রামে (বর্তমান যশোহর জেলা)। তাঁর পিতা মহানন্দ গঙ্গোপাধ্যায় অত্যন্ত ধার্মিক ও উদারচেতা ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ইংরাজী শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তাই তারকনাথের যখন মাত্র দশ বৎসর বয়েস তখন তাঁকে লেখাপড়া শেখানোর জন্য কলকাতায় পাঠিয়ে দেন। তাঁর জ্যেঠতুতো ভাই অম্বিকাচরণ ভবানীপুরে থাকতেন। তাঁর বাসায় থেকে তিনি লন্ডন মিশনারী সোসাইটির স্কুলে পড়াশুনা করেন। ১৮৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে ১৪ টাকা বৃত্তিলাভ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি বছর। এর পরেই তিনি মেডিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট হন, এবং পাঁচ বৎসর পরে ১৮৬৯ সালে দ্বিতীয় বিভাগে এল. এম. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেকালের প্রথা অনুযায়ী মাত্র ১৪ বছর বয়েসে তাঁর বিবাহ হয়।

কৈশোরকাল থেকেই তিনি সাহিত্যানুরাগী হয়ে ওঠেন। কর্মজীবনে তিনি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ান এবং গ্রামবাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের পারিবারিক জীবনের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সুযোগ ঘটে। 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসখানি সেই অভিজ্ঞতারই ফলশ্রুতি। 'স্বর্ণলতা' প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-রসিক সমাজে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং অনতিকাল মধ্যেই কয়েকটি সংস্করণ হয়। কিন্তু 'স্বর্ণলতা'র লেখক কে, এ সম্বন্ধে পাঠকদের মধ্যে কৌতূহলের অন্ত ছিল না। কারণ, তারকনাথ উপন্যাসের রচয়িতারূপে নিজের নাম প্রকাশ করেননি। এ সম্পর্কে তাঁর বন্ধু, সে-যুগের প্রথিতযশা রস-

সাহিত্যিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ১২৯০ সালে এক পত্রের দ্বারা তারকনাথকে জানান—

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
সমীপেষু।

প্রিয়তমেষু

নামের ভার নাই, বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর নাই, তবু তোমার "স্বর্ণলতা" চতুর্থ বার মুদ্রিত হইতেছে। বাঙ্গালা ভাষায় এখনকার অবস্থায় ইহা সামান্য শ্লাঘার কথা নয়। তাহার উপর ইংরেজী ধরণের প্রণয়-লীলা, চোর ডাকাইতের অদ্ভুত খেলা, আকস্মিক বিচ্ছেদ, অভাবনীয় মিলন—এ সকল প্রসঙ্গের ছায়াপাতবর্জ্জিত হইয়াও যে গ্রন্থ এত আদরের সামগ্রী, তাহার অসাধারণ কোনও গুণ আছে, ইহা কে না স্বীকার করিবে? বাস্তবিক স্বর্ণলতা "স্বর্ণলতাই" বটে।

মনে করিও না যে, তোমার গ্রন্থের গুণগান করিবার জন্যই এ পত্র লিখিতেছি। যে জন্য এ পত্র লিখিতেছি, বলি—"স্বর্ণলতা"র যশে তুমি যশস্বী হইয়াছ, বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিচয় দিবার জন্য এখন যে সকল বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে এ যশের ঘোষণা দেখিতে পাই, অথচ তুমি কে, তাহা অনেকেই জানেন না। না জানাটা বড় অন্যায় বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। প্রথমতঃ ইহাতে পাপিষ্ঠের প্রলোভন; এই সে দিন বগুড়াতে এক ব্যক্তি "স্বর্ণলতা"র যশোলাভে মুগ্ধ হইয়া আপনাকে গ্রন্থকার পরিচয় দিয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়াছিল। ইহা আমার অসহ্য। দ্বিতীয়তঃ আমার আত্মীয় লোকের মধ্যেও কোনও কোনও ব্যক্তি আমাকে "স্বর্ণলতা" লেখক মনে করিয়া থাকেন। এ পরিচয়ে আমি গর্ব্বিত হইতে পারি বটে, কিন্তু যাহাতে আমার অধিকার নাই, তোমার সে গৌরব চুরি করিয়া আমি বড় হইব কেন? যাঁহাদের এ প্রকার ভ্রম আছে, তাঁহাদের ভ্রম দূর করা উচিত। তাই বলিতেছি যে, তুমি আপন সম্পত্তি আপনার করিয়া লও।

আমি জানি, তুমি আমার কথা রাখিবে। জানি বলিয়া অনুরোধ করিতেছি যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গ্রন্থে নাম যোজনা করিতে তোমার মনে যদি কোনও দ্বিধা হয়, বিজ্ঞাপন স্বরূপে আমার এই পত্রখানি গ্রন্থারম্ভে মুদ্রিত করিয়া আমার বাসনা পূর্ণ করিবে, ইতি।

প্রণয়গর্ব্বিত

বর্দ্ধমান, জ্যৈষ্ঠ, ১২৯০ সাল। শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইন্দ্রনাথের উপরোক্ত চিঠি পাওয়ার পর, তারকনাথ 'স্বর্ণলতা'র লেখক হিসেবে নিজের নাম ব্যক্ত করেন। অচিরেই চিকিৎসা-বিজ্ঞানী তারকনাথ ঔপন্যাসিক রূপে পরিচিত হয়ে ওঠেন এবং অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেন। 'স্বর্ণলতা'র অধিকাংশ চরিত্রই তাঁর নিজের দেখা চরিত্র। উপন্যাসের চরিত্র রচনার ক্ষেত্রে

যেটুকু বর্ণনার প্রয়োজন হয়, সেটুকুও তিনি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

'স্বর্ণলতা' ছাড়াও তিনি আরও ৫টি উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ রচনা করেছেন কিন্তু তাঁর প্রথম সাহিত্যবৃক্ষের ফলটি অর্থাৎ 'স্বর্ণলতা' আজও সমভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে সমাদৃত হয়ে আসছে।

১৮৮৩-৮৪ সনে মিসেস জে. বি. নাইট Journal of the National Indian Association-এ 'স্বর্ণলতা'-র ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৯০০ সালে স্বর্ণলতার ইংরাজী অনুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন দক্ষিণারঞ্জন রায়। এইসব ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারি, তারকনাথের 'স্বর্ণলতা'র অপরিমেয় জনপ্রিয়তা।

'স্বর্ণলতা' প্রকাশিত হওয়ার ৭ বৎসর পরে ১৮৮৮ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর 'স্টার থিয়েটার'-এ স্বর্ণলতার নাট্যরূপ 'সরলা' নামে অভিনীত হয়। নাট্যরূপ প্রদান করেন রসরাজ অমৃতলাল বসু। এই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় রূপদান করেন : সরলা—কিরণবালা, শ্যামা—গঙ্গামণি, প্রমদা—কাদম্বিনী, শশীভূষণ—নীলমাধব চক্রবর্ত্তী, বিধুভূষণ—অমৃত মিত্র, গদাধর—বেলবাবু, নীলকমল—পরাণ শীল। নাটকটি অভিনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও অভিনন্দন লাভ করে। 'সরলা'র অভিনয়ের জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গে নট-নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রঙ্গালয়ে ত্রিরিশ বৎসর' গ্রন্থের ১১২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—"এই সরলা নাটকের অভিনয় নাট্যজগতে একটা যুগান্তর আনে। ইহার পূর্বে এরূপ ধরণের সামাজিক নাটক বাংলার কোনও রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় নাই। 'সরলা'র অভিনয় প্রায় একবৎসর সমভাবেই চলিয়াছিল এবং স্টার সম্প্রদায় এই পুস্তকে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।"

'সরলা'র নাট্যরূপ কলিকাতার প্রতিটি রঙ্গালয়ে কোন না কোনও সময়ে অভিনীত হয়েছে এবং রঙ্গালয়ের অতি সংকটকালেও 'সরলা'র অভিনয় করে নাট্যসম্প্রদায়গুলি আর্থিক সাফল্যলাভ করেছেন। শুধু মঞ্চাভিনয়ে নয়, গ্রামোফোন রেকর্ডে ও চলচ্চিত্রে 'সরলা' রূপায়িত হয়ে জনসমাদর লাভ করেছে। এই কিছুদিন পূর্বে যাত্রার আসরেও 'সরলা' অভিনীত হয়ে একাধারে আর্থিক সাফল্য, অপরদিকে নাট্যামোদীদের প্রশংসালাভে সমর্থ হয়েছে।

'স্বর্ণলতা' অথবা 'সরলা'র অসাধারণ জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে, বাংলা ও বাঙ্গালীর মধ্যবিত্ত যৌথ পরিবারের এক সংবেদনশীল পারিবারিক চিত্র। ১৯৪৪ সালে আমি সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদান করার পরেও বহুবার 'স্বর্ণলতা'র অভিনয় হতে দেখেছি।

বহু সার্থকনামা অভিনেত্রীকে আমি 'সরলা'র চরিত্রে রূপদান করতে দেখেছি। যিনি যেভাবেই অভিনয় করে থাকুন, 'সরলা'র মৃত্যুদৃশ্যে তারকনাথের সংলাপ দর্শকদের অশ্রুজলে সিক্ত করে তুলতো।

অভিনয়-জগতে সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রে 'সরলা' একটি Landmark বা

দিক্‌চিহ্ন রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। তারকনাথের দুটি অনন্যসাধারণ চরিত্র গদাধরচন্দ্র ও নীলকমলের ভূমিকায় দানীবাবু ও হীরালাল চট্টোপাধ্যায়ের রূপদানের কথা আজও স্মরণীয় হয়ে আছে এবং 'ক্লাসিক'-এ অমরেন্দ্রনাথ—বিধুভূষণের চরিত্র-চিত্রণে আজও অমর হয়ে আছেন।

অনেকেই হয়তো জানেন না, দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে তারকনাথ বাসগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। সেই বাসগৃহটি তাঁর নামের ফলকের সঙ্গে আজও বিদ্যমান। তারকনাথের ন্যায় সার্থকনামা সাহিত্যস্রষ্টার নামে সে-রাস্তাটির কিন্তু নামকরণ করা হয়নি। তাঁর সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টি 'স্বর্ণলতা' পুস্তকের নামে সে-রাস্তাটির নামকরণ করা হয়েছে—'স্বর্ণলতা স্ট্রীট'। আজ পর্যন্ত কোনও সাহিত্যিকের কোনও পুস্তকের নামে কোনও রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

তারকনাথের পরলোকগমনের পর বিভিন্ন সংস্থা 'স্বর্ণলতা' উপন্যাস প্রকাশ করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তনও চোখে পড়েছে। সাহিত্যলোকের আলোচ্য সংস্করণটি তারকনাথের জীবদ্দশার শেষ সংস্করণ থেকে হুবহু গৃহীত হয়েছে। এর দ্বারায় দীঘির জলে সদ্যপ্রস্ফুটিত পদ্মের শোভা রক্ষিত হয়েছে বলেই আমি মনে করি।

দেবনারায়ণ গুপ্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ

উপক্রমণিকা

কৃষ্ণনগরের অনতিদূরে কোন গ্রামে চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম শশিভূষণ ও কনিষ্ঠের নাম বিধুভূষণ।

বিধুভূষণের বয়ঃক্রম যখন দশ বৎসর, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, এ জন্য তিনি তাঁহার মাতার বড় স্নেহের পাত্র ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহা অপেক্ষা সাত আট বৎসরের বড় ছিলেন। সুতরাং শশিভূষণ যৎকালে বিদ্যাভ্যাস করিতেন, তখন বিধুভূষণ কেবল খেলা করিয়া কালাতিবাহন করিতেন।

শশিভূষণ যেমন বয়সে বড় ছিলেন, তেমনি বুদ্ধিতেও তদীয় ভ্রাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ১৬।১৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালেই তিনি পাঠশালার লেখাপড়া সমাপ্ত করিয়া ঐ গ্রামের জমিদারের সরকারে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনের একটি কর্ম পাইয়াছিলেন। জমিদারের সরকারে কার্যের বেতন নাম মাত্র। বোধ হয়, বেতন না থাকিলেও অনেকে জমিদারের সরকারে কার্য্য করিতে অসম্মত হন না। ফলতঃ শশিভূষণের বিলক্ষণ প্রাপ্তি ছিল। সুতরাং অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি এক জন সঙ্গতিপন্ন লোক হইয়া উঠিলেন।

শশীভূষণের চাকরি ও বিধুভূষণের বিদ্যারম্ভ এক সময়েই হইয়াছিল। ভালবাসা কখনই অপ্রতিশোধিত থাকে না। হয়, যে তোমাকে ভালবাসে, তুমি তাহাকে ভালবাসিবে, নতুবা তাহাকে ঘৃণা করিবে। অন্যান্য বিষয়ে নানাবিধ প্রতিশোধ আছে, কিন্তু ভালবাসার প্রতিশোধ এই দুইটি মাত্র। এ দুয়ের মাঝামাঝি আর কিছুই নাই। বিধুভূষণের মাতা বিধুকে যৎপরোনাস্তি যত্ন করিতেন; মা-সরস্বতীও যে তাঁহার উপর কুপিত ছিলেন, এরূপ বলা যায় না। কারণ প্রথম প্রথম অনেকে বলিয়াছিল, বিধু ভাল লেখাপড়া শিখিবে, কিন্তু শিখিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবে। বিধুভূষণ পার্থিব মাতার ভালবাসা ভালবাসার দ্বারা প্রতিশোধ করিতেন, কিন্তু মা-সরস্বতীর যে কিঞ্চিৎ ভালবাসা ছিল, তাহা ঘৃণার দ্বারা পরিশোধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে মা-সরস্বতীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সমর উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে প্রথমতঃ গুরুমহাশয়, পরে প্রতিবাসিবর্গ একে একে সকলেই বিধুভূষণের সহিত মা-সরস্বতীর সদ্ভাব সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহারা বিধুভূষণকে যতই তাড়না করিতে আরম্ভ করিলেন, বিধুর ততই আমোদ প্রমোদ অনুরক্তি ও বিদ্যাভ্যাসে বিরক্তি জন্মিতে লাগিল। কিন্তু মূর্খতাবশতঃ কখন কুলীনের বিবাহ বন্ধ থাকে না। এ জন্য ১৫ বৎসর বয়সের সময়েই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহ অন্তে বউও ঘরে এলেন, এ দিকে মা-সরস্বতীও চিরকালের জন্য বিদায় লইলেন।

বিধুর বিবাহের পর তাঁহার মাতা পাঁচ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। এ পাঁচ বৎসরের মধ্যে শশিভূষণের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ও বিধুভূষণের একটি ছেলের জন্ম ভিন্ন, এ স্থানে উল্লেখের যোগ্য আর কোণ ঘটনাই উপস্থিত হয় নাই। এ জন্য আমরা এইখানেই এ অধ্যায়ের শেষ করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মনোহারীর দোকান

গ্রন্থকারেরা লোকের মনের কথা টের পান এবং ইচ্ছা হইলে সকল স্থানেই গমনাগমন করিতে পারেন। নহিলে সুন্দর বকুলতলায় বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন, ভারতচন্দ্র রায় তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিলেন ; এবং মাইকেলই বা কি প্রকারে পরলোকের বৃত্তান্ত অবগত হইলেন ? এবং তদপেক্ষাও দুর্গম যে মুসলমানের অন্তঃপুর, বঙ্কিম বাবু কি প্রকারে তথায় উপস্থিত হইয়া ওসমান ও আয়েসার কথোপকথন শুনিতে পাইলেন ? এ ভিন্ন গ্রন্থকারদিগের আরও একটি শক্তি আছে, অর্থাৎ ইচ্ছা হইলেই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন। এটি বড় সাধারণ শক্তি নহে। এ শক্তি না থাকিলে অনেক গ্রন্থকার মারা যাইতেন। বিষ্ণুশর্মা ত একেবারে বোবা হইতেন। কিন্তু এই শক্তিটি ছিল বলিয়াই, লঘু-পতনক ন্যায়শাস্ত্রের বিচার করিতেছে এবং চিত্রগ্রীব অবোধ কপোতদিগকে উপদেশ দিতেছে। এই শক্তির প্রভাবেই বঙ্কিমবাবু আড়াইশত বৎসব পূর্বে এক যবন-তনয়ার মুখ হইতে অধুনাতন ইউরোপীয় সুসভ্য জাতীয় কামিনীগণের ভাষা অবলীলাক্রমে নির্গত করাইয়াছেন। এ কথা আমাদিগের বলিবার প্রয়োজন এই যে, এই গ্রন্থে উত্তরোত্তর যে সকল বিষয় বর্ণনা করিব—তাহা, হে পাঠকবর্গ ! আপনাদিগের পার্থিব কর্ণ ও চর্মচক্ষুর অগোচর হইলেও অমূলক নহে। আমরা আপনাদিগের অপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণ অধিক দেখিতে ও শুনিতে পাই। অতএব সে সমুদায় অবিশ্বাস করিবেন না।

এ অধ্যায়টি পাঠ করিবার সময় পাঠকবর্গকে বুঝিয়া লইতে হইবে যে, শশী ও বিধুভূষণের মাতার কাল হওয়া অবধি চারি পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে ; এবং বালক-বালিকাগুলিও পাঁচ সাত বৎসরের হইয়াছে। এক্ষণে তাহারা দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়ায় ও ইচ্ছামত নানাবিধ পুতুল গড়াইয়া খেলা করে। দাস দাসীর সঙ্গে হাটে বাজারে যায় ; এবং প্রয়োজন-মত পাড়ার অন্যান্য বালক-বালিকাদিগের সহিত দ্বন্দ্ব বিবাদাদিও করিয়া থাকে।

যত দিন শশী ও বিধুভূষণের মাতা জীবিত ছিলেন, তত দিন দুটি ভাইতে যৎপরোনাস্তি সদ্ভাব ছিল। ছোটটি বড়টিকে হিংসা করিত না, এবং বড়টিও ছোটটির প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিত না। কিন্তু তাহাদিগের মাতার পরলোক গমনের পর শশীভূষণের স্ত্রী স্বামীকে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, এক

সংসারে আর অধিক কাল থাকা আয় ব্যয় সম্বন্ধে সুবিধার বিষয় নহে। শশিভূষণ তথাচ হঠাৎ কোন অসদ্ভাব প্রকাশ করেন নাই। হাজার হউক, তবু দুই ভাই। উভয়েই এক মায়ের গর্ভে জন্মিয়াছে, এক মায়ের স্তন্য পান করিয়াছে। সহস্র বিবাদ হইলেও পরস্পরের প্রতি একেবারে স্নেহশূন্য হয় না। কিন্তু তাঁহাদের স্ত্রীদিগের মধ্যে ত আর সে রক্তের টান নাই। মাঝে মাঝে তাঁহাদিগের মধ্যে কলহ বিবাদ হইতে আরম্ভ হইল, কিন্তু স্বামীর পোষকতা কেহই পান না, এ জন্য এ পর্য্যন্ত গৃহবিচ্ছেদ ঘটে নাই।

সকলে এই ভাবে অবস্থিত, এমন সময়ে এক দিবস বৈকালে নানাবিধ দ্রব্যপূর্ণ দোকান লইয়া একজন মনোহারী ঐ পাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে পাড়ায় যাবতীয় ছেলে পিলে ও বউ ঝি তথায় একত্র হইল। কেহ কেহ কিনিতে লাগিল, কেহ কেহ (অর্থাৎ যাহাদের পয়সার অপ্রতুল, তাহারা) জিনিসের দর জানিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। যে সকল ছেলে পিলে খেলনা পাইল, তাহারা আহ্লাদে নৃত্য আরম্ভ করিল। যাহারা কিছু পাইল না, তাহারা কান্না ধরিল। প্রমদা (শশীর স্ত্রী) নিজের মেয়ে ও ছেলেটিকে এক একটি বাঁশী কিনিয়া দিলেন, কিন্তু বিধুর ছেলের জন্য কিছু কিনিলেন না। সরলাও (বিধুর স্ত্রী) সেইখানে ছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিকট পয়সা ছিল না বলিয়া পুত্রের জন্য কিছু লইতে পারিলেন না। তাঁহার পুত্রও তৎকালে সে স্থানে ছিল না। এ জন্য সরলা ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময় দূর হইতে মা মা করিয়া গোপাল আসিয়া কহিতে লাগিল,—"মা, ওখানে কি, চল আমরা গিয়ে দেখি।"

সরলা কহিলেন, "ওখানে সব ঝগড়া করছে। আমরা ওখানে যাব না, গেলে আমাদের মারবে।"

"কেমন ক'রে ঝগড়া কচ্ছে, কে মারবে আমি দেখবো।"

"না, ও দেখ্‌তে নাই ; চল আমরা শীগ্‌গির পালাই।"

"না, আমি যাবো।"

প্রমদা, সরলা ও তদীয় পুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া, তাঁহার পুত্র কন্যাকে বলিলেন—"যা না বিপিন, এখানে কি করিস ; যা, গোপালকে তোর কেমন বাঁশী হয়েছে দেখা গে। যা কামিনী, তুইও যা।"

মাতৃআজ্ঞা প্রাপ্ত মাত্র উভয়ে বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে গোপালের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। গোপাল তদ্দর্শনে "আমায় একটা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সরলা বলিলেন, "আজ আর নেই, কাল যখন নিয়ে আসবে, তখন তোরে একটা দেব।"

গোপাল "না—আছে, আজই দিতে হবে" বলিয়া ক্রন্দন ও অঞ্চল আকর্ষণ করিতে লাগিল।

সরলা কি করেন, অগত্যা মনোহারীর দোকানের নিকট গমন করিলেন –

গোপাল দোকান দেখিবা মাত্রেই একটি বাঁশী লইয়া যেখানে বিপিন ও কামিনী খেলিতেছিল, সেইখানে চলিয়া গেল। সরলার নিকট একটিও পয়সা ছিল না, এ জন্য তিনি প্রমদাকে কহিলেন, "দিদি, একটা পয়সা ধার দেবে ?"

দিদি অন্য সময়ে তিন ক্রোশের কথা শুনিতে পান, ঘরের দেয়ালে কর্ণ সংলগ্ন করিয়া অভ্যন্তরস্থ শিশুর স্বপ্নের কথা বলিয়া দিতে পারেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সরলা যাহা বলিলেন, তাহা শুনিলেন না। সরলা এ জন্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, একটা পয়সা ধার দেবে ?"

দিদি যেন সে দেশেও নাই।

সরলা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। এবার কাছে একজন দাঁড়াইয়া ছিল, সে কহিল—"শুনতে পাওনা, ছোট বউ কি বলছে, উত্তর দাও না ?"

অনেক ক্ষণ নিদ্রার পর জাগ্রত হইলে যেমন চেহারা হয়, প্রমদা তেমনি মুখভঙ্গী করিয়া এক চক্ষু দ্বারা সরলার পানে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন—"কি, কি বলছো ?"

সরলা কহিলেন, "একটা পয়সা ধার দিতে পার দিদি ?"

প্রমদা। দিদি ত মহাজন নয় যে, ধার দেবে ?

"যদি ধার না দাও ত গোপালকে এই বাঁশীটা কিনে দাও।"

প্রমদা। আমি ত আর কল্পতরু হয়ে বসি নি যে, যে যা চাবে, তাই দেব।

সরলা কহিলেন, "এ ত তোমার দান করা হচ্ছে না। গোপাল তোমার পর নয়। যেমন বিপিন কামিনী, তেমনি গোপালও তোমার একটি মনে কর না কেন।"

"লোকে যা মনে করে, তাই যদি হ'ত, তবে কি আর দুঃখ থাক্‌তো ? আমি যদি মনে কল্লেই রাজরাণী হ'তে পাত্তাম, তা হ'লে কি আর আমি এমন ক'রে বেড়াই ?"

সরলা, প্রমদার এই সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া অধোবদন হইয়া রহিলেন।

প্রমদা বলিতে লাগিলেন, "কেমনই পৃথিবীর লোক, এদের যত দাও, ততই এদের আশা বৃদ্ধি হয়। আমার যাহা মাসে মাসে আসে, আমি যদি তা রেখে চল্‌তে পারতাম, তবে আমার ভাবনা কি ? কিন্তু তা তো হবার জো নাই। এক জন মাথায় মোট ক'রে আন্‌বে, আর পাঁচ জন তাই ঘরে ব'সে উড়াবে। ওরা যে বোকা, কিছু বুঝে না। ওদের বুদ্ধি যদি থাক্‌তো, তা হ'লে কি আজও ওর খেটে খেটে মাথার ঘাম পায়ে পড়্‌তো। এত দিন টাকার বস্তার উপর ব'সে থাকে না কেন ?" প্রমদা আরও বলিতেন, কিন্তু তাঁর স্বামী বোকা, এই দুঃখে একেবারে সহস্র ধারে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

পাড়ার কোন কোন গিন্নী, যাঁরা সময়ে সময়ে প্রমদা বড়ঘরের মেয়ে, কেমন শান্ত, কেমন সুন্দর মুখখানি, কেমন সুন্দর পটল-চেরা চক্ষু দুটি, কেমন বাঁশীর মত নাকটি, ইত্যাদি অপক্ষপাতী সত্য কথা বলিয়া দরকারমত নুনটুকু

তেলটুকু লইয়া যান, তাঁহারা প্রমদার রোদনে একবারে গলিয়া গেলেন। কেহ কাঁদিতে লাগিলেন, দু এক জন সরলাকে তিরস্কার করিতেও ত্রুটি করিলেন না। এক জন বেঁটে স্থূলোকার বিধবা ছিলেন। তাঁহার বিশেষ বাজিয়া উঠিল ; তিনি কহিলেন, "ঠিক কথা বল্‌বো, তার আর ভয় কি ? সরলার বড় লম্বা লম্বা কথা, ওর সোয়ামী রোজগার করে, তবু প্রমদার মুখে একটু উঁচু কথা কেহ শুন্‌তে পায় না।"

একটা শৃগাল ডাকিয়া উঠিলে জঙ্গলের সব শৃগাল যেমন ডাকিয়া উঠে, তেমনি তথায় যত বিধবা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই দিগম্বরীর মতে মত দিয়া সরলার নিন্দা করিতে লাগিলেন। কথার প্রসঙ্গে কথা উঠে। সরলার কথা কহিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সমুদায় স্ত্রীলোকের চরিত্র সমালোচনা করিলেন। পরিশেষে স্থির হইল যে, এ-কেলে মেয়ে একটিও ভাল নয় (প্রমদা ছাড়া)। মানবপ্রকৃতির পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন, বৃদ্ধেরা যদিও যুবকদিগকে 'ছেলেমানুষ' বলিয়া তুচ্ছ করেন, তথাপি তাঁহারা পুনরায় যুবা হইতে পারিলে তিলার্দ্ধও গৌণ করিতেন না। ফলতঃ যৌবনকালের তুল্য কাল নাই। সকলেই যুবা হইবার নিমিত্ত শশব্যস্ত। বালকেরা কামাইয়া গোঁফ তোলে, বৃদ্ধেরা কলপ্ দিয়া কালো করে। তবে যে প্রাচীনেরা 'ছলেমানুষ' এই কথাটি গালিস্বরূপ প্রয়োগ করেন, সেটি বস্তুতঃ তাঁহাদের প্রকৃত ভাব নয়।

সরলা সজল নয়নে কিয়ৎক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিলেন। মনোহারী আর তথায় অপেক্ষা করা বৃথা মনে করিয়া দোকান বাঁধিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে সরলা অধিকতর ভীতা হইলেন। এ দিকে গোপাল কাছে নাই যে, বাঁশীটি ফিরাইয়া দেন, অথচ মূল্যদানেরও শক্তি নাই। কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময়ে মনোহারী গমনোন্মুখ হইল। দিগম্বরী, সেই বেঁটে স্থূলোকার বিধবাটি কহিলেন, "তোমার পয়সা নে গেলে না ?" মনোহারী উত্তর করিল, "আমি ও বাঁশীটির দাম চাই না, অনেক ব্যাপার কোরে থাকি, একটা মাল নয় অমনি দিলাম।" সরলা এই কথা শুনিয়া পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর দুঃখিত হইলেন। সুবুদ্ধি মনোহারী তাঁহার মুখ পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বুঝিতে পারিল, বিনা মূল্যে দানের কথা বলা ভাল হয় নাই। এ জন্য পুনরায় কহিল, "আমি ত প্রায়ই এ-পাড়ায় আসি, এবার যে দিন আস্‌বে, সেই দিন পয়সা নিয়ে যাব।" সরলা এই কথা শুনিয়া যার-পর-নাই শান্তি লাভ করিলেন। প্রমদা যার-পর-নাই দুঃখিত হইলেন ; আর উপস্থিত গিন্নীরা পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সোনার গাছে মুক্তার ফল

সরলা মনোদুঃখে বাটী আসিলেন এবং নিয়মিত গৃহ-কর্ম্ম সমাপন করিয়া বিরলে বসিয়া বৈকালের ঘটনা মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকের বল বুদ্ধি সমুদায়ই স্বামী, কিন্তু সরলার সে বল বুদ্ধি না থাকার মধ্যে। বিধুভূষণ সমস্ত দিনই পাড়ায় থাকিতেন। আহারের সময় কেবল বাটীতে পদার্পণ করিতেন। গৃহকার্য্য দেখিতেন না ; এক পয়সা উপার্জ্জনের ক্ষমতা ছিল না। বাদ্য, গীত এবং তাস-পাশাতেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। কিন্তু তিনি যৎপরোনাস্তি ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন। দাদার সহিত বিবাদ করা আর পিতার সহিত বিবাদ করা তিনি এক কথাই মনে করিতেন। লেখাপড়া দ্বারা যাহাদের স্বভাব পরিমার্জ্জিত হয় নাই, তাহারা অত্যন্ত রাগী হইয়া উঠে। বিধুরও এ দোষটি ছিল। তিনি সামান্য কারণে রাগ করিতেন না বটে, কিন্তু একবার করিলে আর সে রাগ সহজে দূর হইত না।

সরলা ভাবিতে লাগিলেন, বৈকালের ঘটনা তাঁহাকে বলা কর্ত্তব্য কি না। বলিলে যে কোন বিশেষ উপকার হইবে, তাহার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আবার মনের দুঃখ ব্যক্ত না করিলেও চিত্তের স্বচ্ছন্দতা জন্মে না। এই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় গোপাল আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবা মাত্র সরলা অঞ্চল দ্বারা চক্ষু মুছিয়া ফেলিলেন। গোপাল জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুই কাঁদিচস্ কেন ?"

সরলা কহিলেন, "কৈ কাঁদিচি ?"

"ঐ যে তোর চোখ দিয়ে জল পড়্ছে ?"

সরলা কহিলেন, "আমার পেট ব্যথা কচ্চে।"

গোপাল উত্তর করিল, "আমার পেট কামড়ালে শ্যামা যে ওষুদ দেয়, তবে সেই ওষুদ খাস্ না কেন ? যাই, আমি শ্যামাকে ডেকে দি, তার ওষুদ খেলে সেরে যাবে।"

সরলা কহিলেন, "না না, শ্যামাকে ডাক্‌তে হবে না ; আমার পেট ব্যথা কচ্ছে না ; আমার চোকে কি পড়েছে, তাই চোক দিয়া জল বেরুচ্ছে।"

"তবে আয়, তোর চোকে ফুঁ দিয়ে দি, তা হ'লে বেরিয়ে যাবে এখন।" এই বলিয়া গোপাল নিকটে আসিল। সরলা তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া সতৃষ্ণ নয়নে তাহার মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন।

স্নেহের কি চমৎকার গুণ ! সরলা কাঁদিতেছিলেন কেন, গোপাল তাহার কিছু মাত্র অবগত ছিল না, কিন্তু মাতাকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহার আপন চক্ষুদ্বয় আর্দ্র হইয়া আসিল। সরলা গোপালের ছল ছল নেত্র নিরীক্ষণ করিয়া সমুদায় দুঃখ বিস্মৃত হইলেন এবং তাহাকে কোলে লইয়া বাহিরে বেড়াইতে লাগিলেন।

গোপাল মাতার স্কন্ধে শিরঃস্থাপন করিয়া চুপ করিয়া রহিল। তদ্দর্শনে সরলা তাহাকে কথা কহাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং তাহাকে হাসাইবার জন্য নিজেও হাসিতে লাগিলেন।

সুন্দরী যুবতীর সাশ্রু নয়নে হাসি যে একবার দেখিয়াছে, সে কখনও ভুলিতে পারিবে না। সোনার গাছে মুক্তাফল, এর সহিত কি তুলনা হইতে পারে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সোনার চন্দ্রহার

পিতা মাতার সদ্‌গুণ সন্তানে সর্ব্বদা বর্ত্তে না বটে, কিন্তু তাহারা দোষের ভাগ সচরাচর সুদ সমেত প্রাপ্ত হয়। পিতা পুত্র উভয়েই পণ্ডিত অতি বিরল, কিন্তু উভয়েই চোর, এরূপ প্রায়ই দেখা গিয়া থাকে। প্রমদা তাহার এক উদাহরণস্থল। তাঁহার পিতার নাম রামদেব চক্রবর্ত্তী। বাটী শশিভূষণের বাটীর অতি নিকটে। দ্বেষ, হিংসা, কলহপ্রিয়তা ইত্যাদি কতকগুলি রামদেব চক্রবর্ত্তীর বংশের দোষ. তাঁহার বংশের কন্যা যে-পরিবারে গিয়াছে, সেই পরিবারেই দ্বন্দ্ব কলহের ভদ্রাসন হইয়াছে। প্রমদা এই পৈতৃক সম্পত্তির সম্পূর্ণ অংশই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতার যে সরলতা একটি গুণ ছিল, তাহার লেশ মাত্রও পান নাই। তাঁহার পিতার অবস্থা ভাল ছিল না। বিবাহ হওয়া অবধী প্রমদা দুটি একটি টাকার মুখ দেখিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে যখন শাশুড়ীর মৃত্যুর পর গৃহের একমাত্র কর্ত্রী হইলেন, তখন তিনি আর পৃথিবীকে তৃণজ্ঞানও করিতেন না।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, বিধুভূষণ কোন কার্য্য কর্ম্ম করিতেন না। কিন্তু সরলার নিকট হইতে প্রমদা তাহার বিলক্ষণরূপে ক্ষতি-পূরণ করিয়া লইতেন। প্রমদা নিজ গৃহ হইতে কখনই বাহির হইতেন না। রন্ধনাদি এবং গৃহকার্য্য সমুদায়ই সরলাকে করিতে হইত। যদি কেহ কখন এ বিষয় লইয়া প্রমদাকে কিছু বলিত, প্রমদা অমনি বলিতেন, "কিই বা কাজ যে, তা নিয়ে এত কথা জম্মে, আমার যদি ব্যামো না থাক্‌তো, তা হ'লে এ কাজ দেখতে দেখতে ক'রে ফেলতে পারতাম।" প্রমদা যখন-তখন এই পীড়ার কথা কহিতেন। পীড়াটি কি, তাহা বলা দুঃসাধ্য। কারণ সে পীড়াবশতঃ প্রমদাকে এক দিনও উপবাস করিতে দেখা যায় নাই, শরীর কখন ক্ষীণ হয় নাই, বরঞ্চ উত্তরোত্তর পুষ্ট দেখা যাইত। পীড়াটির এই এক লক্ষণ মাত্র জানা আছে যে, সকালে সকালে আহার না হইলে অত্যন্ত বৃদ্ধি হইত। পাঠকবর্গ এখন বুঝুন, এ কোন্ পীড়া।

বৈকালে মনোহারীর দ্রব্যাদি লইয়া প্রমদা ও সরলার যে কথোপকথন হয়, তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন। সরলা বাটী আসিয়া যাহা করিয়াছিলেন, তাহাও জানিতে পারিয়াছেন। অতঃপর প্রমদা কি করিলেন, শ্রবণ করুন।

স্বভাবতঃ যেরূপ পদধ্বনি করিয়া থাকেন, তদপেক্ষা দশগুণ অধিক শব্দ

করিয়া প্রমদা নিজগৃহে প্রবেশপূর্বক দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলেন। বাটীর লোকে সেই শব্দ শুনিয়া স্থির করিল, আজ একটা-না-একটা বিভ্রাট ঘটিবেক।

প্রমদার বাক্যগুলি এমন মিষ্ট যে, এক বার শুনিলে আর কেহ তাহা দুই বার শুনিতে ইচ্ছা করিত না। সুতরাং কারণ জিজ্ঞাসা করিতে কেহ অগ্রসর হইল না।

বিপিন পাঠশালা হইতে বাটী আসিয়া মাতার নিকট যাইতেছিল, কিন্তু দরজা বন্ধ দেখিয়া ফিরিয়া গেল। কামিনী 'মা, মা' করিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রমদা তথাপি উত্তর দিলেন না।

বাটীর দাস দাসী, কর্ত্তা ও গৃহিণীরই বশীভূত হইয়া থাকে, কিন্তু শশিভূষণের বাটীতে এ নিয়ম প্রচলিত ছিল না। শ্যামা প্রমদাকে যত ভক্তি না করিত, সরলাকে তদপেক্ষা অধিক ভক্তি করিত; তাহার কারণ, উভয়কেই সমান তিরস্কার খাইতে হইত। এ জন্য উভয়ের পরস্পর মিত্রতা হইয়াছিল। সরলাকে তিরস্কার করিলে শ্যামার চক্ষে জল আসিত। শ্যামাকে তিরস্কার করিলে সরলা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেন না। শ্যামার এক বিশেষ গুণ ছিল যে, যে যেখানে পরামর্শ করুক না কেন, শ্যামা তাহা শুনিতে পাইত। এমন নিঃশব্দপদসঞ্চারে সর্ব্বস্থানে যাইত যে, কেহই তাহা জানিতে পারিত না। কথাটি সমাপ্ত হইলেই তথা হইতে প্রস্থান করিয়া সরলার নিকট আসিয়া আনুপূর্বিক সমুদায় বর্ণনা করিত। সরলাও শ্যামার নিকট কোন কথা গোপন করিতেন না।

সরলা শ্যামাকে মনোহারীর দোকান সম্বন্ধীয় সমুদায় বিবরণ কহিলেন। শ্যামা শুনিয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "আজ আর একখানা গয়না হবে।"

ক্রমে ক্রমে দিবা অবসান হইল। শশীভূষণের বাটী আসিবার সময় উপস্থিত দেখিয়া শ্যামা নিয়মিত জলগাড়ুটি, গামছাখান ও খড়মজোড়া বারাণ্ডায় রাখিল এবং ঠাকুর-ঘরে আহ্নিকের জায়গা করিয়া দিল। সরলার চিত্তে নানাবিধ আশংকা উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রমদা শয্যোপরি শয়ন করিয়া ফোঁস ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ছাড়িতে আরম্ভ করিলেন। নেত্রাসার বর্ষণ হইতে লাগিল। পাড়া হইতে খেলা করিয়া বিপিন আসিয়া মা মা করিতে লাগিল। কামিনী কান্না ধরিল। এমন সময় শশিভূষণ বাটী উপস্থিত হইলেন।

প্রত্যহ যেরূপ প্রথমতঃ নিজ গৃহে যাইতেন, অদ্যও শশিভূষণ সেইরূপ যাওয়াতে গৃহদ্বার রুদ্ধ দেখিয়া দ্বারে আঘাত করিলেন। কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া 'ঘরে কে আছে' বলিয়া বারম্বার ডাকিতে লাগিলেন। তথাপি কোন উত্তর পাইলেন না। পরিশেষে শ্যামাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "শ্যামা, এরা কোথায় গিয়েছে?"

শ্যামা উত্তর করিল, "ঐ ঘরের মধ্যেই আছেন।" এই বলিয়া একটি কলসী লইয়া জল আনিবার ছলে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

শশিভূষণ এবার কিঞ্চিৎ রাগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলি, দোর খুলে দেবে, না আমি চলে যাব ?"

প্রমদা বুঝিতে পারিলেন যে, আর অধিক কস্‌টাইলে লেবু তিক্ত হইবেক ; এ জন্য আস্তে আস্তে উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া পুনরায় শয়ন করিলেন। শশিভূষণ তাঁহার আরক্ত নয়ন, মলিন বদন ও ঘন নিশ্বাস দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন—কাণ্ডটা কি। কারণ, প্রমদার পক্ষে এরূপ রাগ করা নূতন ব্যাপার নহে। মধ্যে মধ্যে প্রয়োজন হইলেই রাগ হইত। একখান নূতন গহনা, কিম্বা একখান ভাল কাপড় লইতে হইলেই প্রমদা রাগ করিতেন। এবং শশিভূষণও প্রার্থিত দ্রব্যাদি দিয়া রাগ ভঙ্গ করিতে ত্রুটি করিতেন না। এ জন্য শশিভূষণ নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ আবার কি ?"

কোন উত্তর নাই।

"বলি, আজ আবার কি হ'ল ?"

নিরুত্তর। যেন দেওয়ালের সহিত কথোপকথন হইতেছে।

তৃতীয় বার জিজ্ঞাসায় কোন উত্তর না পাইয়া, শশিভূষণ মনে করিলেন, আজকার ব্যাপারটি বড় লঘু নহে, শ্যামাকে ডাকিয়া বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যাউক, এ জন্য 'শ্যামা শ্যামা' করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারও উত্তর না পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কি বিপদ, কেউ কি আমার কথার জবাব দেবে না ?"

এই কথা শুনিয়া প্রমদা সকরুণ বচনে কহিলেন, "কি, কি বলছো ?"

শ। এত ক্ষণ পরে হুঁস হ'ল না কি ? তুমি কি এখানে ছিলে না ? না কালা হয়েছ যে, আমার কথা এতক্ষণ শুনতে পাও নি ?

প্র। আমি কালাই হই, আর কাণাই হই, লোকের তাতে কি ক্ষেতি ? আমাকে যদি কেউ দেখতে না পারে, তবে আমাকে বলে না কেন ? তা হ'লে আমি চলে যাই, তাদের উৎপাত যায়।

শশিভূষণ সমস্ত দিবস পরিশ্রমের পর বিরক্ত হইয়া বাটী আসিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া রাগত হইয়া কহিলেন, "রোজই বল চলে যাব। কৈ যাও দেখি, কোথায় যাবে ?"

প্র। কেন, আমার কি আর যাবার জায়গা নেই ? বাপের বাড়ী গিয়ে প'ড়ে থাকলে তারা চাট্টি না দিয়ে খেতে পারবে না।

বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই, কুলোপানা চক্র। প্রমদার বাপের বাড়ীর অবস্থা ত অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণঃ। নিকট বলিয়া প্রমদা মাঝে মাঝে চালটে, ডালটে, কখন টাকাটা সিকেটা চুরি করিয়া পাঠাইয়া দিতেন ; এবং তাহার জোরেই রামদেবের প্রত্যহ আহার চলিত।

শশিভূষণ টের পাইয়াও সে সকল দেখিতেন না। এ জন্য প্রমদার বাপের বাড়ী যাইবার কথা শুনিয়া তাঁহার হাসি আসিল। বলিলেন, "যাও, এক্ষণেই

যাও, কিন্তু আমি চাল ডাল পাঠাতে পারব না।"

বাপের বাড়ীর নিন্দা কখনই স্ত্রীলোকের সহ্য হয় না। বিশেষতঃ প্রমদা রাগ করিয়াছিলেন, এ জন্য শশিভূষণের ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া একেবারে মর্ম্মে বেদনা পাইলেন এবং অধোবদনে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। শশিভূষণ বুঝিতে পারিলেন, প্রমদাকে গুরুতর বেদনা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তখনই কোন সান্তনার কথা কহিলে বেদনার হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইবেক, এই ভাবিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু স্থানান্তরে গিয়াও অধিক ক্ষণ থাকিতে পারিলেন না। এ জন্য অর্দ্ধ ঘণ্টা আন্দাজ পরে আবার গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, প্রমদা শয়ন করিয়াই আছেন। কাছে বসিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কি হয়েছে?" প্রমদা উত্তর দিলেন না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তথাপি কোনও উত্তর পাইলেন না।

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া শশিভূষণ আরম্ভ করিলেন, "অদৃষ্টে যার যা লেখা থাকে, কার সাধ্য তা খণ্ডন করে; মনে ক'রে আসিতেছিলাম যে, যে-চন্দ্রহারের জন্য এক বৎসর দরবার হচ্ছে, আজ তার বায়না দিলাম; আজ বাড়ী গিয়ে বড়ই আদর পাব। কিন্তু অদৃষ্টে তা ত নেই, সুতরাং কি প্রকারে তা ঘটবে? আদর প'ড়ে মরুক, আজ কথাটিও শুনতে পাই না।"

শশিভূষণ পূর্ব্ববৎ বলিতে লাগিলেন, "বিধু কহিত, 'এখন চন্দ্রহার স্থগিত রেখে বরঞ্চ বৈঠকখানা-ঘরটি সম্পূর্ণ করুন।' আমি মনে করলাম, বৈঠকখানা ত হবেই, যেখানে অর্দ্ধেক হয়েছে, আর অর্দ্ধেক বাকি থাকবে না।"

প্রমদা আর থাকিতে পারিলেন না। প্রথমতঃ সোনার চন্দ্রহারের কথা, দ্বিতীয়তঃ তদ্বিষয়ে বিধুভূষণের প্রতিবন্ধক হওয়া, ইহা শুনিলে মৃত হইলেও প্রমদার চৈতন্য হইত। তিনি কহিলেন, "ওদের দু-জনের জ্বালাতেই ত চিরকালটা জ্বালাতন হলাম। আমার এত অনিষ্ট করেও কি ওদের মনবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল না?"

শশিভূষণ ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরা কারা, আর তোমাকেই বা কি জ্বালাতন কল্লে?"

প্র। কি জ্বালাতন কল্লে, আবার জিজ্ঞাসা করছো? কেন, বাকি রয়েছে কি?

শ। স্পষ্ট ক'রে না বললে ত আমি বুঝতে পারি না। আমি ত জানু নই যে, এক কথার অর্দ্ধেক না শুনিয়াই সম্পূর্ণ বুঝতে পারব? তুমি ত একা বিধুর নাম কর নাই, 'ওরা' বললে সে কে কে, তা কি প্রকারে জানব?

প্র। কে কে? আবার কে হ'তে পারে? কর্তা আর গিন্নী। কর্তাটি আমার পাছে লেগেছেন; আমার কিছু হ'লেই যেন তাঁর সর্ব্বনাশ হয়। তিনি যেন নিজের টাকা ভেঙ্গে দিচ্ছেন। আর গিন্নীটি যাতে আমি পাঁচ জনের কাছে অপদস্থ হই, তারই চেষ্টায় থাকেন।

শ। কেন, বিধু তোমাকে ত না দেবার কথা বলে নি, সে বলেছিল, লোক জনটা এলে স্থানাভাবে কষ্ট হয়, এ জন্য বৈঠকখানা আগে হ'লেই ভাল হয়।

প্র। ইচ্ছায় বলি কি, তোমার বুদ্ধি কম? তুমি ভালমানুষ, ও-সব ত

বুঝতে পার না। বিধুটিকে বড় সহজ লোক জ্ঞান ক'রো না। বৈঠকখানার উপর ওর এত যত্ন কেন, তা ত জান না। ও কি বৈঠকখানা হ'লে তোমার যে ভাল হবে, তার জন্য বলে ? তা নয়। ও ত এখনও পাড়ায় থাকে, তখনও পাড়ায় থাক্‌বে। তবে কি না বৈঠকখানা হ'লে তার ভাগ পাবে, আমার গয়না হ'লে ত পৃথক হবার সময় তার অংশ পাবে না।

প্রমদা যে শশিভূষণকে বোকা বলিতেন, সেটি বড় মিথ্যা কথা নয় ; বস্তুতঃ এ-সব বিষয়ে তাঁহার বুদ্ধি তাদৃশ ঘুরিত না। কি প্রকারে প্রজাদিগকে কষ্ট দিয়া পয়সা আদায় করিতে হয়, এবং উহার জমা খরচ রাখিতে হয়, তাহাই বুঝিতেন। এক্ষণে প্রমদা যাহা বলিলেন, তাহা ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় সত্য জ্ঞান করিলেন। মনে করিলেন, হাঁ, এত দিনের পর বুঝ্‌তে পারলাম। এই জন্যই ভায়া আমায় যখন-তখন সর্ব্ব কার্য্যের আগে বাড়ীটি সম্পূর্ণ করা ও বিষয়-আশয় করার পরামর্শ দেন ; আর স্ত্রীর গয়না দেওয়া আর টাকা জলে ফেলে দেওয়া সমান ব'লে থাকেন।

এত দূর পর্য্যন্ত মনে মনে করিয়া প্রকাশ্যে কহিলেন, "তুমি ঠিক কথা বলেছ। আমি যদি আগে জান্‌তে পারতাম, তবে একখানিও ইট প্রস্তুত করতাম না।"

প্র। তুমি ত আমার কথা শুন না, জিজ্ঞাসাও কর না। তুমি মনে মনে ভাবো, তোমার ভাইটি যেমন রামের ভাই লক্ষ্মণ। কিন্তু ওটি যে ভরত, তা ত জান না।

শ। বৈঠকখানা ঐ পর্য্যন্ত থাক্‌লো, দেখি কে করে ? আর কি বল্‌ছিলে ? গিন্নীর কথা কি বল্‌ছিলে ?

প্র। বল্‌তেছিলাম—গিন্নীটি কর্ত্তাকে হারান, তাঁর মুখের কাছে দাঁড়ায় কার সাধ্য ? তাঁর সর্ব্বতোভাবে যত্ন, কিসে আমাকে আর তোমাকে অপমান কর্‌তে পারেন।

শ। কি, আমাকে অপমান ? যারই খাবেন, তারই বদ্‌নাম করবেন্ ?

প্র। সে কথা বলে কে ?

শ। কি, কি অপমানের কথা বলেছে বল ত ?

প্র। বাকিই বা কি রেখেছেন ? তুমি শুন্‌লে প্রত্যয় কর্‌বে না : আজ একজন মনোহারী দোকান নিয়ে এসেছিল। বিপিন কামিনী ছাড়ে না, তাই ও-পাড়ার দিগম্বরী ঠাকরুণদিদির কাছ থেকে দুটি পয়সা ধার ক'রে ওদের দুটি বাঁশী কিনে দিলাম। ছোট গিন্নী তাই দেখে রাগ ক'রে, সেখান থেকে চলে এসে, গোপালকে ডেকে নিয়ে একটা বাঁশী দিলেন। দাম দেবার সময় বললেন, "দিদি, আমাকে একটা পয়সা ধার দাও, আমি সুদ দেবো।" আমি বললাম, "এক পয়সার আবার সুদ কি ভাই আমি ত জানি না।" ছোট বউ বললেন, "চিরকাল মহাজনি করছো, জান না কেন ?" আমি শুনে অবাক্ হয়ে থাকলাম। ছোট বউ তার পর যা মুখে এল, তাই বললে।

শ। কি কি কথা বললে ?

প্র। আমার তত মনে নাই, আমি সাদা মানুষ, অত কথার পেঁচ বুঝি না ; ও-পাড়ার সকলে ছিল, শুনেছে। তোমার যদি শুনবার ইচ্ছা থাকে, কাল দিগম্বরী ঠাক্‌রুণদিদিকে ডেকে আন্‌ব ; সে-ই সমস্ত বল্‌বে।

শ। হাঁ, এ শোনা উচিত। কাল অবশ্য ক'রে দিগম্বরীকে ডেকে আনা হয় যেন।

প্র। তা ত হবে, কালকার কথা কাল হবে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্য বল্‌বে ?

শ। কেন বল্‌বো না, অবশ্য বল্‌বো।

প্র। যথার্থ কি চন্দ্রহারের বায়না দেওয়া হয়েছে ?

শশিভূষণ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "হাঁ হয়েছে ; কেন ?"

প্র। তোমার কথা শুনে বোধ হচ্ছে হয় নাই !

শ। তবে হয় নাই।

প্র। কেন তবে মিথ্যে কথাটি বললে ?

শ। মিথ্যা বলেছি বটে, কিন্তু কাল সত্য হবে। কালই সেকরা ডেকে বায়না দেবো। ভেবেছিলাম আগে বৈঠকখানাটাই সমাধা কর্‌বো, কিন্তু তোমার মুখে যে-সব কথা শুন্‌লাম, তাতে আর বাড়ী প্রস্তুত কর্‌তে আমার ইচ্ছা নাই। নিজে পরিশ্রম ক'রে কে কোথায় পরকে অংশ দিয়ে থাকে ?

প্রমদা আর কথা কহিলেন না।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিবে, শ্যামা দাসীর গুপ্ত কথা শোনা একটা রোগ ছিল। দ্বারে কর্ণ সংলগ্ন করিয়া উল্লিখিত কথোপকথনের আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া সরলার নিকটে গিয়া কহিল, "কেমন খুড়ী-মা, আমি যা বলেছিলাম, তা সত্য হ'ল কি না ?"

সরলাও কি কথোপকথন হইয়াছে, শুনিতে নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। শ্যামাকে দেখিয়া কহিলেন, "কি শ্যামা ? কি সত্য হ'ল ?"

শ্যা। আমি ত বলেছিলাম, যে-দিন রাগ করবেন, সেই দিন একখানা গয়না হবে। আজ সোনার চন্দ্রহার।

শ্যামা, চন্দ্রহার হইতে আরম্ভ করিয়া আনুপূর্বিক সমস্ত বিবরণ সরলাকে কহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সরলার উৎকণ্ঠা

যে রাত্রিতে প্রমদা ও শশিভূষণ পূর্বাধ্যায়োল্লিখিত কথোপকথন করেন, বিধু সে রাত্রি বাটীতে আইসেন নাই। পাড়ায় এক বাটীতে যাত্রা হইতেছিল, তিনি

সেইখানেই ছিলেন। স্ত্রীলোকের সকল বল স্বামী; সরলা এ সমস্ত বৃত্তান্ত স্বামীকে কিছুই জানাইতে না পারিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হইলেন। কি করা কর্ত্তব্য, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া মনে করিলেন, আজ নিদ্রা যাই। শয়ন করিলেন, নিদ্রা হইল না। শয্যায় উপবেশন করিলেন। ভাবিলেন, অনেক ক্ষণ বসিয়া থাকিলে নিদ্রা হইবেক। কিন্তু বসিয়া থাকিয়াও কোন ফল দর্শিল না। নানাবিধ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, শ্যামাকে পাঠাইয়া দিয়া স্বামীকে ডাকিয়া আনা কর্ত্তব্য। শ্যামা শ্যামা করিয়া ডাকিতে ডাকিতে শ্যামা উঠিল। সরলা কহিলেন, "শ্যামা, তুই এক বার গিয়া ওদের ডেকে আন্‌তে পারিস্‌ ?"

শ্যা। কোথা থেকে ডেকে আন্‌ব ? তিনি কোথায়, কেউ কি জানে ?

স। সে যাত্রার কাছে আছে। আমাকে ব'লে গিয়েছিল, আজ যাত্রা শুন্‌তে যাবে।

রাত্রিকালে নিদ্রাভঙ্গ করিয়া কাহাকে কোন কাজ করান বড় সহজ নহে। নিদ্রা তন্দ্রা ইত্যাদিতে পুরুষকেই জড়ীভূত করিয়া ফেলে—শ্যামা ত দূরে থাকুক। আপাততঃ দুই হস্ত দ্বারা চক্ষু মর্জ্জন করিয়া শ্যামা কহিল—"আমি কেমন ক'রে সেখানে যাব, আর অত লোকের মধ্যে আমাকে যেতেই বা দেবে কেন ?"

স। শ্যামা, তুই আজ নূতন যাত্রার কাছে যাচ্ছিস্‌ না কি ? আর কখন কী বেশী লোকের কাছে যাস্‌ নি ?

শ্যা। তোমাকে ত আর কথায় পার্‌ব না। এই চললাম।—এই বলিয়া শ্যামা প্রস্থান করিল।

শ্যামাকে পাঠাইয়া দিয়া সরলার চিত্ত চাঞ্চল্য কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস হইল। ক্ষণকাল তাহার প্রতীক্ষা করিয়া শয়ন করিলেন। প্রত্যূষের সুস্নিগ্ধ সমীরণ সঞ্চালনে তাঁহার নিদ্রাবেশ হইল। সরলা নিদ্রিত হইলেন।

শ্যামা যাত্রার নিকট গিয়া ক্ষণকাল এ দিকে ও দিকে অনুসন্ধান করিল, বিধুকে দেখিতে পাইল না। তখন যাত্রা শুনিতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ যে বাজাইতেছিল, তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িল; শ্যামা দেখিল, বিধুভূষণ বাজাইতেছেন। কিন্তু কেন যে তিনি যাত্রার দলে বসিয়া বাজাইতেছেন বুঝিতে পারিল না। শ্যামা তাঁহার সহিত চক্ষে চক্ষে দেখা হইবার নিমিত্ত অনেক ক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া আবার একাগ্রমনে যাত্রা শুনিতে আরম্ভ করিল।

এ দিকে সরলা নিদ্রিত আছেন। নিদ্রা কি মনোহর! রোগ, শোক, জ্বালা, যন্ত্রণা, সকলই নিদ্রিত হইলে লোকে বিস্মৃত হয়। নিদ্রার ন্যায় মোহিনী শক্তি আর কাহার আছে? দিবসে সংসার-কোলাহলে চিত্তে যে সমস্ত উদ্বেগ জন্মে, রজনীতে নিদ্রাকর্ষণ হইলে সে সমস্ত দূরীভূত হইয়া যায়। নিদ্রার ন্যায়

শান্তিদায়িনী আর সংসারে কিছুই নাই। নিদ্রা মনের প্রিয়তমা সহচরী। চিন্তাদগ্ধ চিত্তকে নিদ্রা সখীর ন্যায় সুস্থ করে। কিন্তু দুঃখীর সুখ কোথাও নাই। চিরদুঃখিনীর ভাগ্যে কুস্বপ্ন নিদ্রার অরি হইয়া তাহাকে শান্তিসুখ হইতে বঞ্চিত করে।

সরলা পুত্রটি কোলে করিয়া শয্যায় নিদ্রিত আছেন। মস্তকের নিকট জানালার উপর একটি তৈলের প্রদীপ জ্বলিতেছে; বাতাসে দীপশিখা অল্প অল্প নাড়িতেছে, এ জন্য মুখখানি মাঝে মাঝে ভাল দেখা যাইতেছে না। বাতাস বন্ধ হইলে আবার সুন্দর দেখাইতেছে। মস্তকের বসন বাম পার্শ্বে পড়িয়াছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম স্থানে স্থানে একত্রিত হইয়া মুক্তার ন্যায় শোভা পাইতেছে। লোহিত ওষ্ঠ দুটি অল্প অল্প কম্পিত হইতেছে। মুখভঙ্গি চিন্তাশূন্য বোধ হইতেছে না। নিদ্রিত হইয়াও কি সরলা ভাবিতেছেন?

নিদ্রা ভঙ্গ হইলে সরলা দেখিলেন—রজনী শেষ হইয়াছে এবং গোপালের হস্ত ধারণ করিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঠাকুরুণদিদি

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, ইতিপূর্ব্বে দিগম্বরী ঠাকুরুণদিদির কথা উল্লেখ করা গিয়াছে। এক্ষণে তাঁহার সহিত আপনাদিগের বিশেষ পরিচয় করিয়া দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। শশিভূষণের বাটীর দশ বার রশি পশ্চিমে তাঁহার বাটী। ঠাকুরুণদিদির দুইখানি ঘর। একখানি থাকিবার ও আর একখানি রন্ধনশালা। সম্মুখে ছোট একটু উঠান, উঠানের দক্ষিণে ছোট একটু বাগান। বাগানের মধ্যে গুটিকতক ফুলগাছ, একটি কি দুটি পেঁপের গাছ, আর একটি নারিকেলগাছ। বাড়ীখানি এমনি পরিষ্কার যে, সিন্দুরটুকু পড়িলে তুলিয়া লওয়া যায়। এই বাটীতে ঠাকুরুণদিদি "বিকল্পে" একাকিনী বাস করেন।

ঠাকুরুণদিদির রূপ-গুণের পরিচয় দেওয়া বড় সহজ নয়। তাঁহার বর্ণটি জবা ফুলের মত নয়, গোলাপ ফুলের মত নয়, বেল ফুলের মত নয়, মল্লিকা ফুলের মত নয়, আয়েশার মত নয়, আশ্‌মানির মত নয়, প্রদীপের আলোকের মত নয়, মোমবাতির মত নয়। এ সমস্ত মিশ্রিত করিলে যেমন হয়, তাহার মতও নয়। কেমন, পাঠকবর্গ বুঝেছেন ত, এখন ঠাকুরুণদিদির বর্ণটি কেমন? যদি না বুঝিয়া থাকেন, তবে পুস্তকখানি এইখানেই বন্ধ করুন। "নবেল" পড়া আপনার কাজ নয়। গ্রন্থকারদিগের ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট করিয়া কোন বিষয় বর্ণনা করিবার নিয়ম নাই। আর যদিও ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট করিয়া কোন বিষয় বর্ণনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কি ক্ষতি? আপনাদের বুদ্ধির স্থূলত্ব প্রকাশ পায়। অতএব যদি আপনারা "অল্পবুদ্ধি" এই গালটি স্বীকার করিয়া লইতে পারেন,

তবে আমি কেবল মাত্র বর্ণ কেন, ঠাকুরুণদিদি সম্বন্ধে যাহা কিছু জানি, সকলই বর্ণনা করিতে পারি।

ঠাকুরুণদিদির বর্ণ কোন্ কোন্ জিনিসের মত নয়, তাহা বলা হইয়াছে; কোন্ কোন্ জিনিসের মত, তাহা এক্ষণে বলা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ জমিদারী সেরেস্তার কালি, রান্নাঘরের ঝুল, আল্‌কাতরা ইত্যাদির ন্যায়। ঠাকুরুণদিদি বেঁটে, স্থূলকলেবরা; মস্তকটি প্রায় কেশশূন্য, দাঁতগুলি মাঘ মাসের মূলার মতন, চক্ষু দুটি রক্তবর্ণ, পদদ্বয় স্তম্ভাকার, পায়ের অংগুলিগুলি এখানে একটি ওখানে একটি, যেন পরস্পর বিবাদ করিয়া পৃথক্ হইয়াছে। ঠাকুরুণদিদি তাঁহার পিতার বড় আদরের মেয়ে ছিলেন, এ জন্য দশ বার বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তাঁহাকে ব্যাটাছেলের মত কাপড় পরাইয়া সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্রই লইয়া যাইতেন। ঠাকুরুণদিদিকে না চিনিত, এমন লোকই ছিল না; ঠাকুরুণদিদিও সকলকেই চিনিতেন। আপাততঃ তাঁহার প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম। জন্মাবধি বিধবা বলিলেই হয়। বিবাহ হইয়া এত অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার স্বামীর পরলোক-প্রাপ্তি হয় যে, তিনি ক'দিন সধবা ছিলেন বলা বড় দুঃসাধ্য। ঠাকরুণদিদি বৈধব্যাবস্থায় একবার শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিলেন। তিন চারি দিবসের মধ্যেই কলহ বিবাদ করিয়া তথা হইতে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আইসেন। তাঁহার পিতার কিঞ্চিৎ অর্থ ছিল, এক্ষণে তাহাতে জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। ঠাকুরুণদিদির এই এক অসাধারণ গুণ ছিল যে, তাঁহার বাটীতে যে কেহ যাউক না কেন, কাহাকেও অনাদর করিতেন না। সকলকেই সমভাবে যত্ন করিতেন।

প্রত্যূষে যেমন সরলা গোপালের হস্ত ধারণ করিয়া বাহির হইবেন, সম্মুখে ঠাকুরুণদিদিকে দেখিতে পাইয়া অমনি গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। ঠাকুরুণদিদি অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া প্রমদার ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

অবিলম্বেই সরলা বাহির হইয়া দেখিলেন, ঠাকুরুণদিদি প্রমদার গৃহে প্রবেশ করিলেন। সরলার গৃহ হইতে প্রমদার গৃহ এক প্রাচীর মাত্র ব্যবধান; এ জন্য তিনি নিজ গৃহে থাকিয়া কি কথোপকথন হয়, শুনিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুই শুনিতে না পাইয়া পুনরায় বাহিরে আসিয়া সংসারের কাজকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রায় এক ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত পরামর্শ করিয়া ঠাকুরুণদিদি প্রমদার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং সরলাকে ডাকিয়া কহিলেন, "একটা কথা শুনে যাও।"

সরলা সশঙ্কিত হইয়া ঠাকুরুণদিদির নিকট অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "ক ?" ঠাকুরুণদিদি কিঞ্চিৎ কৃত্রিম দুঃখ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, "কথা এই ভাই—আমার দোষ নাই—আমি কি কর্‌ব ভাই—আমাকে তুমি এক কথা বলে পাঠালে প্রমদার কাছে বলতে হবে, আর তিনি এক কথা ব'লে পাঠালে তোমার কাছে বলতে হবে। আমাকে ভাই গালি দিও না, আমি হয়েছি সীতাহরণে মারীচ—"

সরলা ভূমিকা শুনিয়া আরও ভীতা হইলেন। ঠাকরুণদিদির উপমা শেষ না হইতে হইতেই কহিলেন, "সে সব তুলনায় আর কাজ কি ? তোমাকে যা বলতে বলেছেন, তাই বল, তোমার কথার বাঁদুনি শুনে আমার প্রাণ চমকে যাচ্ছে।"

ঠা। কতকটা চমকাবার কথাই বটে। তা যেখানে বলতে হবে, একেবারে ব'লে ফেলাই ভাল। প্রমদা বললেন কি, একত্র থাকলে ক্রমাগত বিবাদ বিসম্বাদ হয়। অতএব এ ঝগড়া বিবাদে কাজ কি ? আজ অবধি তুমিও পৃথক্ হয়ে খাও, আর তিনিও পৃথক্ হউন। আমার কি ভাই, আমি ব'লে খালাস।

কথা শুনিয়া সরলার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। যে ভয়ে তিনি কখন মুখ তুলিয়া প্রমদার নিকট কথা কহেন নাই, যে ভয়ে তিনি এত সহ্য করিয়া আসিয়াছেন, হঠাৎ সেই বিপদ্ উপস্থিত। বিধুভূষণও বাটী নাই। এ ঝগড়ার বিন্দুবিসর্গও তিনি জানেন না; হয় ত তিনি সমুদায় দোষ সরলারই মনে করিবেন।

কিয়ৎক্ষণ অধোবদনে থাকিয়া সরলা সজল নয়নে কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরও কি এই কথা বললেন ?"

ঠাকরুণদিদি একটি কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "শিব কি কখন শক্তি ছাড়া থাকেন !"

ঠাকরুণদিদির এই পৌরাণিক শাস্ত্রসম্বলিত উত্তর শুনিয়া এত দুঃখেও সরলার মুখে হাসি আসিল। কিন্তু অবিলম্বেই সে হাসি সম্বরণ করিয়া সকরুণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরুণদিদি, এখন উপায় কি ?"

ঠা। উপায়ের কথা আমি কি বল্‌ব, সে তুমিই জান। শশীভূষণ আমাকে বললেন, "ঠাকরুণদিদি, আজ তুমি চারিটি ভাত না দিলে আমায় অনাহারে থাকতে হয়, ওর ব্যাম, ও ত কোন কর্ম্ম করতে পারবে না, কাল লাগাত অন্য কোন একটা সুবিধা করব।" তাই আমি আজ চারটি রেঁধে দিয়া যাব। আমার কি ভাই, আমাকে তুমি ডাকলেও আসতে হবে, আর তিনি ডাকলেও আসতে হবে।

ঠাকরুণদিদি এই কথা বলিয়া রন্ধনশালায় গমন করিলেন, সরলাও আপনার ঘরে গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শশিভূষণ বাহির হইয়া যাইবার সময় ঠাকরুণ-দিদিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ঠাকরুণদিদি, ওদের রান্না আজকার মতন ঐ গোয়ালের পাশে হোক, তার পর কাল একখান ঘর ঠিক ক'রে দেওয়া যাবে।"

বিধুভূষণ পূর্ব্বদিবস আহারান্তে পাড়ায় গিয়া শুনিলেন, মুখুজ্যেদের বাড়ী যাত্রা হইবেক, আর তাঁহাকে পায় কে ? শুনিবা মাত্রই তিনি মুখুজ্যেদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যাত্রা সম্বন্ধীয় বন্দোবস্ত করিলেন। কখন ফরাস তদারক করিতেছেন, কখন সকলে আসিয়া কোথায় বসিবে, তাহার উদ্‌যোগ করিতেছেন। কখন এর কানে কানে কথা কহিতেছেন, কখন আর একজনের সহিত পরামর্শ করিতেছেন—অর্থাৎ যেন তিনিই বাড়ীর কর্ত্তা। ক্রমে যত সন্ধ্যা সমাগত

হইতে লাগিল, তাঁহার ততই আমোদ বাড়িতে লাগিল। সকালে সকালে চারটি আহার করিতে বাটী আসিলেন। কিন্তু রান্না হয় নাই দেখিয়া "আজ আমি যাত্রা শুনব" এই মাত্র সরলাকে বলিয়া ফিরিয়া গেলেন। বাটীতে যে গোলযোগ হইয়া গিয়াছে, সরলা সে বিষয় তাঁহাকে কিছু মাত্র বলিবার অবকাশ পাইলেন না।

বাটী হইতে ফিরিয়া গিয়া দেখিলেন, যাত্রাদলের প্রধান বাদ্যকরের ওলাউঠা হইয়াছে। এ জন্য যাত্রাওয়ালারা সে রাত্রে গান বন্ধ করিয়া রাখিবার প্রস্তাব করিতেছে। কিন্তু এ দিকে সমস্ত নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। উপায় কি, কেহ স্থির করিতে পারিতেছে না। বিধু কহিলেন, "বাজনার জন্য ভয় নাই, আমি নয় বাজাব।" উপস্থিত যাঁহারা ছিলেন, সকলেই এই প্রস্তাবে মত দিলেন। বিধুর আনন্দের আর সীমা রহিল না।

নিয়মিত সময়ে যাত্রা আরম্ভ হইল। যাত্রাওয়ালারা মনে করিয়াছিল বাদ্যের দোষবশতঃ প্রাপ্তি দূরে থাকুক, লজ্জা পাইতে হইবেক। কিন্তু দুই একটা গান সমাপ্ত না হইতে হইতেই তাহারা বুঝিতে পারিল যে, তাহারা অকারণ ভয় পাইয়াছিল। বিধুর বাজনা তাহাদের নিজ বাদ্যকর অপেক্ষা সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট, সুতরাং তাহাদের ভয় ঘুচিয়া উৎসাহ হইল। এবং যেরূপ প্রত্যাশা করিয়াছিল, প্রাপ্তি সম্বন্ধে তাহার দশগুণ ফল লাভ হইল।

যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেলে যাত্রাওয়ালারা তাঁহাকে কিঞ্চিৎ লাভের অংশ দিতে চাহিল। কিন্তু বিধুভূষণ তাহা গ্রহণ করিলেন না। হৃষ্টচিত্তে বাটী ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময় রাস্তায় শ্যামার সহিত দেখা হইল। শ্যামা, গান শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিল। বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্যামা, তুই কোথায় গিয়াছিলি ?"

শ্যা। আপনাকে ডাকতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি সে গোলের মধ্যে ব'সে বাজাচ্ছিলেন দেখলাম, আমার সেখানে যেতে ভরসা হ'ল না।

"ভয়ই বা কি ?"

"সেখানে যে লোক ?"

"লোকে কি তোকে ধ'রে খেত ? তুই ত আর পাকা আঁবটি নোস্ যে, তোকে পেলেই ধরবে ?"

"আপনার ঐ এক রকম কথা। আমি কি বলছি আমি পাকা আঁব ?"

বিধু। আমার এই রকম কথা। আমি রোজই তাই বলি, কিন্তু তুই ত তার জবাব আজও দিলি নে।

"যাও, আমি তোমার ও-সব কথা শুনতে চাই না। (উভয়েই বাটীর কাছে আসিয়াছে) যে চায়, তাকে গিয়া বলো।"

"সে কে শ্যামা ?"

"বাটীর ভিতর গিয়া দেখ, যে আমাকে ঘুম থেকে তুলে তোমাকে ডাকতে পাঠালে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যেখানে ভাই ভাই, সেখানে ঠাই ঠাই

শ্যামা যে যথার্থই বিধুভূষণকে ডাকিতে গিয়াছিল, বিধুর তাহা প্রত্যয় হয় নাই। তিনি মনে করিলেন, শ্যামা যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল, পথে তাঁহার সহিত দেখা হইয়াছে বলিয়া ও কথা কহিল। আস্তে আস্তে বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। বাহির-বাটীতে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। ভিতরে প্রবেশ করিলেন, কেহই নাই। রান্নাঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিতে পাইলেন ঠাকুরুণদিদি পাক করিতেছেন। বিধু ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "আজ কি সুপ্রভাত! স্বয়ং লক্ষ্মী ঘরে বিরাজমান।" বিধু ঠাকুরুণদিদিকে এই রূপেই সম্ভাষণ করিতেন। ঠাকুরুণদিদিও তাহাতে কখনই তুষ্ট ভিন্ন রুষ্ট হইতেন না।

আপাততঃ ঠাকুরুণদিদি কথা কহিলেন না। বিধু কহিলেন, "তৃষিত চাতক বাক্যসুধা যাচঞা করিতেছে; কথা কহিয়া তৃষ্ণা দূর করো।" ঠাকুরুণদিদি তথাপি কথা কহিলেন না, মুখ ভারি করিয়া রহিলেন। বিধু যাত্রার দলে বাজাইয়া পরম আহ্লাদিত ছিলেন। ঠাকুরুণদিদির মুখভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া করপুটে কহিলেন, "দীন জনকে কষ্ট দেওয়া মহতের উচিত নহে। তবে যদি আমার কোন দোষ হয়ে থাকে, ব্যবস্থা ত পড়েই আছে। 'অপরাধ করিয়াছি, হুজুরে হাজির আছি, ভুজপাশে বাঁধি কর দণ্ড'।"

ঠাকুরুণদিদি তথাপি কথা না কহায় বিধুর মনে সন্দেহ জন্মিল। শ্যামা তাঁহাকে ডাকিতে গিয়াছিল, তাহাও স্মরণ হইল। মনে করিলেন, শ্যামার কথা কাল্পনিক নহে। অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া নিজের গৃহে প্রবেশ করিলেন। সরলা তাঁহার কথা শুনিয়াই দুঃখে ও ভয়ে অশ্রুপাত করিতেছিলেন। সরলাকে তদবস্থ দেখিয়া বিধুর যেন কণ্ঠাবরোধ হইয়া আসিল। মুহূর্ত্ত অগ্রে হাসিতেছিলেন, হাসি দূর হইল, সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপাল কোথায়? সে ভাল আছে ত?"

সরলা কহিলেন, "গোপাল পাঠশালায় গিয়াছে, ভয় নাই—গোপাল ভাল আছে।"

বিধু। বিপিন, কামিনী?

সর। বিপিনও পাঠশালায় গিয়াছে। কামিনী কোথায় খেলা করুছে।

বিধু। তবে তুমি কাঁদছ কেন?

সর। ঠাকুর আমাদের পৃথক্ ক'রে দিয়েছেন।

বিধু। এই কথা? এরই জন্যে এত কাণ্ড? কি ব'লে দাদা আমাদের পৃথক্ ক'রে দিয়াছেন?—বিধুর বোধ হইল, যেন ইহা অপেক্ষা আর কিছুই অসম্ভব হইতে পারে না।

সরলা কহিলেন, "প্রথমে ঠাকুরুণদিদিকে দিয়ে ব'লে পাঠালেন, পরে কাছারি

যাবার সময় ঠাকুর নিজে ব'লে গেলেন।"

"কি বললেন ?"

"কাছারি যাবার সময় আমাদের আজকার মতন গোয়ালে রাঁদতে বললেন, পরে কাল একটা ঘর দেখে দেবেন।"

বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "পৃথক্ ক'রে দিলেন কেন ?"

সরলা উত্তর করিলেন, "আমি ত আর কিছুই জানি না। বোধ হয়, সেই মনোহারীর দোকানের কাছে যে কথা হয়েছিল, তাতেই রাগ করেছেন!" এই বলিয়া সরলা আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বর্ণন করিলেন। বিধুভূষণ শুনিয়া হাসিয়া কহিলেন, "এর জন্য আর ভয় কি ? দাদা বাড়ী এলেই চুকে যাবে। বোধ হয় তিনি সমুদায় কথা শুনতে পান নাই। শুনতে পেলে তিনি এমন কাজ কখনই করিতেন না। এর জন্যে আর ভাবনা কি ?"

সরলা স্বামীর বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, "মা দুর্গা করুন, যেন তাই হয়। তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক।"

বিধু। ফুল চন্দন পরে পড়ুবে, আপাততঃ আমার মাথায় একটু তেল জল পড়ুক। কাল রাত জেগে বড় অসুখ হয়েছে। তেল দাও, স্নান ক'রে আসি।

বিধুভূষণ স্নান করিতে গেলেন। সরলা কিঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইয়া ঠাকুরুণ-দিদিকে রন্ধনকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য রন্ধনশালায় গমন করিলেন। প্রমদা সরলাকে রান্নাঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া শ্যামাকে ডাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্যামা, সকলে মিলে আবার রান্নাঘরে কেন গেলেন ? আমাদের রান্নাঘরে আর কারুর গিয়ে কাজ নেই।" শ্যামা তৎকালে বাটী ছিল না। কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি ? প্রমদা যাহার উপর রাগ করিতেন, তাহার সহিত কথা কহিতেন না, কিন্তু তাহাকে কিছু বলিতে হইলে শ্যামাকে সম্বোধন করিয়া কহিতেন, শ্যামা তথায় থাকুক আর নাই থাকুক।

প্রমদার কথা শুনিয়া সরলা রান্নাঘর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নিজ গৃহে আসিলেন। শ্যামা বাটী আসিল এবং রান্নাঘরে ঠাকুরুণদিদিকে দেখিয়া সরলার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বলি আজ কি তোমার ছুটি ? ঠাকুরুণদিদিকে একটিন্ দিয়াছ না কি ?

শ্যামার মুখে সদাই হাসি। হাসিতে হাসিতে সরলাকে উল্লিখিত প্রশ্ন করায় সরলা কহিলেন, "শ্যামা, তোর কি আর সময় অসময় নেই, যখন তখনই হাসি।"

"হাসবো না কি তোমার মতন ব'সে কাঁদবো ? কার জন্যে আমি কাঁদবো ?" এই কথা কহিতে কহিতে শ্যামার স্বর গাঢ় হইয়া আসিল এবং চক্ষে এক বিন্দু বারিও দেখা দিল। শ্যামা যেন লজ্জিত হইয়া মুখ ফিরিয়া বসিল।

সরলা কহিলেন, "শ্যামা, আমাদের পৃথক্ ক'রে দিয়েছেন, ঠাকুরুণদিদি ওঁদের জন্যে রাঁধছেন। আমাদের আজ কি হবে ভাবছি।"

শ্যামা। পৃথক্ ক'রে দিয়াছেন ?

'হাঁ'—এই বলিয়া সরলা শ্যামার নিকট প্রাতঃকালের ঘটনার পরিচয় দিলেন।

শ্যামা পুনরায় হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে আমি কোন্ দিকে যাব ? ভাগ্গি আমি বাবুদের মা নই। মা হ'লে ত আমার গংগা পাওয়া ভার হ'ত। কিন্তু সাজার দাসীর কি হয়, তা ত জানি নে। হাঁ খুড়ী-মা, কি হয় জান কি ?

সরলা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোর আর হাসি আমার ভাল লাগে না। দু-দণ্ড কাল কি তুই না হেসে থাক্‌তে পারিস না ?

সরলার কথা শেষ না হইতে হইতেই বিপিন ও গোপাল পাঠশালা হইতে বাটী আসিল। গোপাল আসিয়া সরলার নিকট "মা, কি খাব" বলিয়া উপস্থিত হইল। সরলা অঞ্চল দিয়া গোপালের মুখের কালি পুঁছিয়া দিয়া কহিলেন, "একটু দেরি করো, খাবার দেবো এখন।" বিপিন মায়ের নিকট একটি সন্দেশ পাইল। প্রমদা সন্দেশটি বিপিনের হাতে দিয়া কহিলেন, "এইখানে ব'সে খাও। না খেয়ে বাইরে যেও না।" বিপিন তাহা শুনিবে কেন ! সন্দেশটি পাইবা মাত্রেই ঘরের বাহিরে আসিয়া গোপালকে ডাকিল। গোপাল বাহিরে আসিয়া দেখিল, বিপিন সন্দেশ খাইতেছে। দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, আমারে একটু দেবে ?"

বিপিন উত্তর করিল, "না, ভাই, দিলে মা বক্‌বে।"

গো। মা কেন বক্‌বে। আমি যখন যা পাই তোমাকে দি, তাতে ত আমার মা কিছু বলেন না।

বি। আমি ভাই এখন দিতে পারব না। আমি বড় হ'লে দেবো।

গো। আমিই কি চিরকাল ছোট থাক্‌ব ? বড় হ'লে আমি আর তোমার কাছে চাব না।—এই কথা কহিতে কহিতে উভয়েই রান্নাঘরের নিকট গেল। বিপিন এ দিক্ ও দিক্ চাহিয়া দেখিল—কেহ কোনখান হইতে দেখিতেছে না, তখন সন্দেশটি ভাঙ্গিয়া একটু গোলাপের হাতে দিতে গেল। ঠাক্‌রুণদিদি রান্নাঘর হইতে দেখিতে পাইয়া কহিয়া উঠিলেন, "বিপিন, বিপিন, থামো। আমি দেখতে পাচ্ছি ; মাকে ব'লে দেবো এখন।"

বি। তুমি কি ব'লে দেবে ? আমি কারুকে সন্দেশ দিই নি।—এই বলিয়া গোপালকে না দিয়া সন্দেশটুকু আপনার মুখে নিক্ষেপ করিল। গোপাল ম্লানমুখে মায়ের নিকট ফিরিয়া আসিল। শ্যামা ইত্যবসরে দোকান হইতে একটি সন্দেশ আনিয়াছিল। গোপাল আসিবা মাত্রেই তাহার হাতে দিল। গোপাল হৃষ্টচিত্তে সন্দেশ খাইতে খাইতে বিপিনের সঙ্গে গিয়া মিশিল।

বিধুভূষণ স্নান করিয়া বাটী আসিলেন। শশীভূষণও কাছারি হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছেন বলিয়া বিধু আপাততঃ তাঁহাকে কিছু বলিলেন না। শশিভূষণ স্নানাহ্নিক সমাপন করিলেন। পাকশাক প্রস্তুত করিয়া ঠাক্‌রুণদিদি স্নান করিয়া শশিভূষণকে আহার করিতে ডাকিলেন।
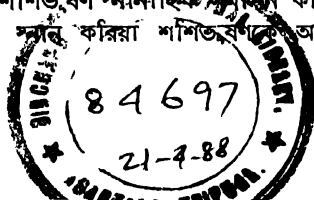
অন্যান্য দিবস আহার করিতে যাইবার সময় শশিভূষণ বিধুকে ডাকিয়া যাইতেন, অদ্য একাকী গম্ভীর ভাবে আহার করিতে গেলেন। আহারান্তে নিজ গৃহে পান তামাক খাইতেছেন, এমন সময় বিধুভূষণ তথায় গিয়া বসিলেন। মনে করিলেন, দাদাই অগ্রে কথা কহিবেন। এই ভরসায় ক্ষণেক বসিয়া রহিলেন। কিন্তু দাদার মুখ হইতে বাক্য নিঃসরণ হইল না। তখন বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা, আমাকে না কি পৃথক্ হ'তে বলেছেন ?"

শশিভূষণ কহিলেন, "হাঁ, আর একত্র থেকে কলহ বিবাদ বরদাস্ত হয় না। যদি পৃথক্ হ'লে ঝগড়ার শেষ হয়, এই ভেবেই পৃথক্ হ'তে বলেছি।"

বিধু। কার দোষে ঝগড়া হয়, সেটা অনুসন্ধান ক'রে দেখলে ভাল হয় না কি ?

শ। তা না দেখেই কি আমি পৃথক্ হবার কথা বলেছি ?

বিধু। তুমি কি শুনেছ, আমি কি শুনতে পাই ?

শ। পাবে না কেন ? কাল এক জন মনোহারী দোকান নিয়ে এসেছিল, ঠাকুরুণদিদির কাছ থেকে দুটি পয়সা ধার ক'রে বিপিনকে আর কামিনীকে দুটি বাঁশী কিনে দেয়। ছোট বৌ মা তাতে বললেন, "দিদি, একটা পয়সা ধার দেবে, আমি সুদ দেবো।" এটা কি ভাল কথা হয়েছে ? আমি তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি ?

বি। আগে ভালো—

শ। চুপ কর, আগে আমার কথা শেষ হোক্, পরে যা বল্‌বার থাকে ব'লো। পয়সা ধার চাওয়ায় ওদের কাছে পয়সা ছিল না, কিন্তু তা না ব'লেও বললে—"একটা পয়সা ধার, তার আর সুদ কি ?" তার উত্তর হ'ল এই, "কেন, তুমি ত মহাজনি ক'রে থাক।" আমি একটা কথা বলি—আমি যে কারুকে লক্ষ্য ক'রে বল্‌ছি তা নয়—আমি দু-জনকেই বল্‌ছি—এই যে ধার কর্জ্জ করা হয়, এর শোধ কি কেউ বাপের বাড়ী থেকে পয়সা এনে দেন ?"

বিধুভূষণের এত ক্ষণ পুনর্ম্মিলনের আশা ছিল, কিন্তু শশিভূষণের শেষ কথা শুনিয়া সে আশা দূর হইয়া গেল। তিনি কহিলেন, "তুমি যা বললে, তা মিথ্যা নয়, কেউ বাপের বাড়ী থেকে কিছু পয়সা আনে না। কিন্তু ঘটনাটি তুমি যেরূপ শনেছ, তা সত্য নয়।" এই বলিয়া সরলার নিকট তিনি যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিলেন এবং কহিলেন, ইহাই সত্য।

শ। তার প্রমাণ কি ?

বিধু। প্রমাণ আবার কি ? এ ত মোকদ্দমা নয়। তবে সেখানে যারা ছিল, সকলেই জানে।

শ। সেখানে ঠাকুরুণদিদি ছিলেন। আমি তাঁর কাছে সমুদায় শুনেছি। তোমারই কথা মিথ্যা, তাতে টের পাওয়া গেল।

বিধু। কে বললে, আমার কথা মিথ্যা ?

শ। ঠাকুরুণদিদি। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, ঠাকুরুণদিদি ত আর দু-মাস ছ-মাসের তফাৎ নয়। রান্নাঘরে আছেন, ডেকে জিজ্ঞাসা করো।

বিধু। আর আমার জিজ্ঞাসা করবার দরকার নাই। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) ঠাকুরুণদিদি যা বলেছেন, তা ত মিথ্যা হবার নয়।

এই বলিয়া বিধু উঠিয়া গেলেন। দুয়ার পর্যন্ত না যাইতে যাইতেই শশিভূষণ তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইলেন। কহিলেন, "আজ ত পৃথক্ খাওয়া গেল। কাল তোমাদের একটা রান্নাঘর দেবো, আর বিষয়-আশয় পাঁচ জন লোক ডেকে ভাগ ক'রে দেবো।"

বিধু। "লোক ডেকে দরকার কি? আমি তোমার সঙ্গে বিবাদ করবো না। তুমি ত সব জান। যা আমাকে দেবে, আমি তাই নেবো।"—এই বলিয়া বিধুভূষণ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

প্রমদা এত ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। বিধুভূষণ চলিয়া গেলে বলিলেন, "দেখছ একবার অহংকারটা? তুমি এক কথা বলেছ, তা নয় দুটি মিষ্টি ক'রে তোমার অনুনয়-বিনয় করুক্। তা নয়।"

শশিভূষণ উত্তর করিলেন, "ও অহংকার আর ক'দিন থাকবে, শীঘ্রই সব সেরে যাবে।" এই বলিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

চিরদিন কখন সমান না যায়

ইং ১৮—সালের পৌষ মাসের—তারিখে ঠিক দুই প্রহরের সময় যদি কেহ কৃষ্ণনগর হইতে কলিকাতার রাস্তায় হাঁসখালির নিকট উপস্থিত থাকিতেন তাহা হইলে ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী এক বৃক্ষমূলে একটি পথশ্রান্ত পথিককে দেখিতে পাইতেন। দূর হইতে পথিকের বয়স চল্লিশ বৎসরের ন্যূন বোধ হইত না, কিন্তু নিকটে গিয়া দেখিলে তদপেক্ষা অন্ততঃ দশ বার বৎসর কম নিশ্চয়ই বিবেচনা হইত। মস্তকে দুটি একটি পক্ক কেশ দেখা যাইত, কিন্তু তাহা বয়োবৃদ্ধিহেতু নহে। মুখশ্রী ম্লান ও চিন্তাকুল। দেখিবা মাত্রেই জানিতে পারা যাইত, চিন্তায় পথিককে যৌবনেই বৃদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। পথিকের পায়ে এক জোড়া পাঁচ সাত জায়গায় তালি দেওয়া জুতা। তাহাও ধূলায় আবৃত। পায়ের হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলি। পরিধান একখানি অর্দ্ধমলিন থানের ধুতি, গায়ে একটি তালি-দেওয়া জামা। জামাটি পূর্ব্বে পশমী কাপড়ের ছিল, কিন্তু কালে দুর্দ্দশাবশতঃ লোমহীন হইয়াছে। জামার উপর একখান তেহাতা মার্কিনের চাদর। পথিকের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি জলশূন্য হুকা, একটি কলিকা ও একগাছি বাঁশের ছড়ি ধরাতলে নিপতিত রহিয়াছে।

"চিরদিন কখন সমান না যায়।" বিধুভূষণ স্বপ্নেও জানিতেন না যে, তিনি

কখন এরূপ দুরবস্থাতে পতিত হইবেন। পাঠকবর্গ ! বৃক্ষমূলে আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত বিধুভূষণ, তাহা কি আর বলিবার প্রয়োজন আছে ? কিন্তু আপনারা যদি তাঁহাকে পূর্ব্বে দেখিতেন এবং পরে বৃক্ষমূলে তাঁহার সহিত দেখা হইত, তাহা হইলে এ ব্যক্তি যে সে-ই, তাহা কখনই বুঝিতে পারিতেন না। বিধুভূষণের আর পূর্ব্বের মতন বেশভূষা নাই, তেমন ভাব ভংগী নাই, সে প্রফুল্ল মুখমণ্ডল নাই, সে মুহুর্মুহু হাসি নাই, পূর্বের কিছুই নাই—সকলই গিয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া আপনারা বিধুকে ঘৃণা করিবেন না। এখনও বিধুর যাহা আছে, বোধ করি, তাঁহার ন্যায় দুরবস্থায় পড়িলে অনেকের থাকে না। বিধুর অন্তঃকরণের সারল্য কোথাও যায় নাই। এত দুঃখেও তাঁহার নিস্মর্ল চরিত্রে কোন মলিনতা স্পর্শ করে নাই।

বিধুভূষণ বৃক্ষমূলে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, "কোথায় যাই ? কার কাছে আমার দুঃখ জানাই ? কেই বা আমার কথায় বিশ্বাস করবে ?"

বিধু শশিভূষণের সহিত পৃথক হইয়া দিনকতক স্বচ্ছন্দে ছিলেন। পরে যখন দোকানে ধার বন্ধ হইল, তখন বন্ধুবর্গের নিকট কর্জ্জ ধরিলেন। দিনকতক পরে তাহাও দুষ্প্রাপ্য হইল। তখন আজ ঘটিটি, কাল গহনাখানি, পরদিবস ভাল জামাটি বিক্রয় আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে প্রত্যহ দু-সন্ধ্যা আহার বন্ধ হইল। পরিবার চারটি : নিজে, সরলা, গোপাল ও শ্যামা। পৃথক্ হইবার সময় শ্যামা বিধুভূষণের দিকে আসিয়াছিল। এক সন্ধ্যা আহার করিয়াও তাহার সরলার সহিত থাকিবার স্পৃহা নিবৃত্তি হয় নাই ! এক দিবস মলিন বসন প্রযুক্ত বিধু-ভূষণ বাহির হইতে পারেন না। শ্যামাকে ধোপার বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। কাপড় আসিলে পরিয়া আহার অন্বেষণে যাইবেন। ধোপা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই প্রমদাকে দেখিতে পাইল। দেখিয়া ক্ষণকাল তথায় দাঁড়াইয়া রহিল। প্রমদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামধন, কার কাপড় ?" রজকের নাম রামধন।

রজক উত্তর করিল, "ছোটবাবুর কাপড় ময়লা হয়েছে, বেরুতে পারেন না, তাই তাড়াতাড়ি এই একখান ধুতি, আর একখানা চাদর সাঁজ ক'রে আনলাম।"

প্রমদা কহিলেন, "কাপড় অভাবে বেরুতে পারেন না, তবু বাবু, আর বেশী থাকলে না জানি আরও কি পদবী হ'ত।"

রজক। সে সব আপনারা জানেন, আমি তার কি বলবো ?

প্র। রামধন, কত ক'রে মাইনে পাও ?

রজক। বছরে পাঁচ টাকা হিসাবে দেবার কথা আছে।

প্র। দেবার কথা আছে। আজও পাও নি ?

রজত। কৈ আর পেলাম ! আজ কাল ক'রে এই এক বছর হ'ল। এই সময়ে ধান চাল সস্তা ছিল, টাকাকড়ি পেলে কিছু কিনে রাখতাম। যাই, আজ আবার চাই গে, দেখি কি বলেন।

প্র। চাবি, না আদায় করবি ?

রজক। না দিলে কেমন ক'রে আদায় কর্‌বো ?

প্র। যদি আমার পরামর্শ শুনিস্, তবে আদায় হয়।

রজক। শুন্‌বো বলুন।

প্র। তুই কাপড় হাতে ক'রে রেখে গিয়ে বল্, "আজ টাকা না পেলে কাপড় দেবো না।" যদি দেয় ভালই, নইলে বলিস্, "যে কাপড় ধোয়াবার পয়সা দিতে পারে না, তার এত বাবুয়ানা কেন ?

রজক। তা বললে যদি রাগ করেন ?

প্র। ওর রাগে তোর ভয় কি ? যদি তাতে টাকা না পাস্, যাবার বেলা আমার কাছ দিয়া যাস, আমি তোকে আপাততঃ দু-টাকা ধার দেবো এখন।

রজক প্রথমতঃ শঙ্কিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রমদার উৎসাহবাক্যে তাহার শঙ্কা দূর হইল। একে ছোট লোক, তাতে নগদ দু-টাকা ধার পাইবার আশা রহিল। রজক বাটীর ভিতর গিয়া দেখিল, সরলা দ্বারে বসিয়া আছেন।

রামধন কহিল, "এই কাপড় ত আনলাম, কিন্তু আমাকে কিছু খরচা না দিলে চলে না।"

সরলা কাতর স্বরে কহিলেন, "রামধন, তুমি আজ যাও, রাজবাটীতে উনি আজ যাবেন, সেখানে নিশ্চয় কিছু পাবেন। কাল তুমি এলে কিছু খরচ পাবে।"

রামধন। আজ আমার নইলে নয়।

সরলা। রামধন, আজ হাতে কিছু ছিল না ব'লে আমাদের সকালে খাওয়া হয় নাই, থাক্‌লে কি তোমার সঙ্গে মিথ্যা কথা কই ?

সরলার হাতে দু-গাছা পিতলের বালা ছিল। রজক তাহা সুবর্ণ মনে করিয়া কহিল, "যার পয়সা অভাবে খাওয়া চলে না, তার হাতে আবার সোনার গয়না কেন ?"

রজকের কথা শুনিয়া সরলার মুখ চোখ লাল হইল, কিন্তু তখনই ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "রামধন ! সেই আশীর্ব্বাদ কর যে, হাতের বালা সোনার হউক। সোনা কি আর আছে ? একে একে সকল বিক্রী হয়েছে। এ দু-গাছি পিতলের।" এই কথা কহিতে কহিতে সরলা আর চক্ষের জল রাখিতে পারিলেন না, অঞ্চল দিয়া চক্ষু পুঁছিয়া ফেলিলেন। রজক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাপড়খানি রাখিয়া তথা হইতে আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। যাইবার বেলা আর প্রমদার কাছে গেল না।

ধোপা চলিয়া যাইতে না যাইতে শ্যামা পাড়া হইতে "কৈ গা, ছোট গিন্নী কি কর্‌ছো ?" বলিতে বলিতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সরলা কহিলেন, "শ্যামা, তোর কি হিসেব কিতেব নেই ? অত চেঁচাচ্ছিস, এখনি গোপাল জাগবে।"

শ্যামা কহিল, "জাগলেই বা, দিনে ঘুমান কেন ?"

সরলা। তুই থেকে থেকে অজ্ঞান হোস, এখন জাগলে সে যখন খাব খাব করবে, তখন কি দিবি ?

শ্যামা। আমি তার জোগাড় ক'রে এসেছি।—এই বলিয়া শ্যামা কতকগুলি কলা ও শশা কাপড়ের ভিতর হইতে বাহির করিল।

সরলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্যামা, এ কোথায় পেলি ?"

শ্যামা। তাতে তোমার কাজ কি ?

যখন ঘরে কিছু না থাকিত, শ্যামা পাড়ায় গিয়া কারু বাড়ী কোন কর্ম্ম কাজ করিয়া আসিবার সময় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আহারীয় দ্রব্য আনিত। এইরূপে বিধুভূষণের ঘরে কিছু না থাকা সত্ত্বেও গোপালকে কখন উপবাস করিতে হয় না। এবং সময়ে সময়ে সকলেরই খাবার আনিত। যদি কাহারও বাটী কিছু না পাইত, তাহা হইলে শ্যামা পূর্ব্বের সঞ্চিত বেতন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ খরচ করিত।

গোপালের উপর শ্যামার স্নেহ দেখিয়া সরলা কহিলেন, "শ্যামা, তুমিই যথার্থ গোপালের মা।"

শ্যামা হাসিয়া কহিল, "তবে তুমি কি হবে ? গোপালের পিসি ?"

সরলা সাশ্রুনয়নে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "শ্যামা, ও আমার গর্ভে হয়েছিল বটে, কিন্তু তুমিই ওকে বাঁচালে।"

শ্যামার সরল হৃদয় একেবারে দ্রব হইয়া গেল। উভয়ে সজল নয়নে গোপালকে গিয়া জাগাইলেন।

বিধুভূষণ বস্ত্র পরিধান করিয়া রাজবাটী গেলেন। যে বাবু বিধুকে সাহায্য করিবেন বলিয়াছিলেন, তিনি আহার করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। যে সমস্ত ভৃত্য নিকটে ছিল, তাহাদিগকে বাবুর নিকট খবর দিতে কহিলেন। কিন্তু কেহই বাবুকে জাগাইতে ভরসা করিল না! তাদের মধ্যে এক জনের নাম রামা। বিধুভূষণ তাহাকে, আর আর দু এক জন অপেক্ষা একটু ভাল মানুষ জ্ঞানে কহিলেন, "রাম, আজ আমার আহার হয় নাই। বাবুকে যদি খবর দাও, তবে বিশেষ উপকার হয়।"

রামা কহিল, "তুমি ঠাকুর একেবারে যে বিরক্ত করেই মারলে ?"

বিধু কহিলেন, "রাম, আজ আমার আহার হয় নাই।"

রাম। তোমার আহার হয় নাই, তা আমার কি ? অমন কত লোকেব আহার হয় না, আর একটি পয়সা পেলেই শুঁড়ীর দোকানে যায়।

বিধু ঈষৎ রাগ করিয়া কহিলেন, "হাঁ রে, আমাকে দেখে কি মাতাল গুলি-খোর ব'লে বোধ হয় ?"

রামা কহিল, "তার আমি কি জানি ? এখন বকাইও না ঠাকুর, গরজ থাকে ঐখানে ব'সে থাক। যখন বাবু উঠবেন, তখন দেখা হবে। এখানে চোকরাঙানি ভাল লাগবে না। তোমার ত কেউ চাকর এখানে নয়।"

রামার মিষ্ট কথা শুনিয়া বিধুভূষণের স্মরণ হইল, আর সে কাল নাই। ছল

ছল নেত্রে গৃহের এক কোণে একখানা টুলের উপর বসিয়া রহিলেন। রামা ও অন্যান্য ভৃত্যগণ নিদ্রা যাইতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা আগতপ্রায় হইল। রাজবাটী বিধুভূষণের বাটী হইতে নিতান্ত নিকটও নহে। রাত্রি অন্ধকার। সাত পাঁচ ভাবিয়া বিধুভূষণ চলিয়া আসিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় গৃহের অভ্যন্তর হইতে "রামা রামা" শব্দ হইল। বাবু জাগিলেন। বিধুভূষণ একটু অপেক্ষা করিলেন।

রামা নিদ্রিত। কিন্তু অন্য এক জন চাকর জাগরিত ছিল। পাছে রামার উত্তর না পাইয়া বাবু তাহাকে ডাকেন, এ জন্য ব্যস্তসমস্ত হইয়া সে রামার গা টিপিয়া জাগাইয়া দিল। রামা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "আজ্ঞা যাই।"

রামা যাইবার সময় বিধুভূষণ কহিলেন, "রাম, বাপু, আমার কথাটা ব'লো একবার।"

রামা গৃহের কোণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "তুমি এখনও আছ ঠাকুর?"

বাবু রামাকে কহিলেন, "আজ শনিবার মনে আছে ত? শ্যামবাবু, চন্দ্রবাবু- আর আর সকলে আস্‌বেন, তার জোগাড় আছে ত?"

"জোগাড় আর কি? ওই এক বোতল পোর্ট আছে আর এক বোতল শেরি।"

বাবু। এক বোতল শেরি কি রে? তিন বোতল ছিল যে?

রামা তার দু বোতল পার করিয়াছে, বাবু তার বিন্দুবিসর্গও জানেন না।

রামা। ঐ জন্যেই ত আমি ওসব জিনিস রাখ্‌তে চাই নে। সে দিন যে পাঁচ বোতল গেল, আপনি ত আর হিসাব রাখেন না?

বাবু। সে দিন পাঁ—চ বোতল গেল?

রামা। আজ্ঞা গেলই ত?

বাবু। তবু ত শ্যামবাবু বাপের ভয়ে আর মাথা মুড়াইয়া প্রায়শ্চিত্ত করার ভয়ে বেশী খায় না। (জানালা দিয়া বৈঠকখানার দিকে দৃষ্টি করিয়া) ও আবার কে?

রামা। ও এক ঠাকুর এসেছে। আপনি না কি ওকে কিছু দেবেন কথা ছিল, তাই নিতে এসেছে। বল্‌ছে—ওর আজ খাওয়া হয় নাই।

বাবু। ওকে আজ যেতে বল্‌। বল্‌—আমার ব্যারাম হয়েছে। কাল যেন বৈকালে আসে।

রামাকে আর আসিয়া বলিতে হইল না। বিধুভূষণ বাহিরে বসিয়াই সমুদায় শুনিতে পাইয়াছিলেন। শুনিয়াই প্রস্থান করিলেন।

বাবু বিধুভূষণকে আপনা হইতে ভরসা দিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে নিষ্ফল আসিতে হইবেক, বিধু কখনই মনে করেন নাই, এ জন্য বাবুর কথা শুনিয়া তিনি একেবারে ভাবনায় ম্রিয়মাণ হইলেন। কি করেন, দুঃখে বাটী ফিরিয়া আসিয়া সরলাকে সমুদয় পরিচয় দিলেন। সরলা কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রমদা কোনরূপে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, বিধুভূষণের ঘরে সে দিবস উনন জ্বলে নাই। এ জন্য সন্ধ্যার পর বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ও শ্যামা, শ্যামা, বলি আজ তোদের কি রান্না হ'ল ?"

শ্যামা উত্তর করিল, "যা বিধি মাপিয়েছিলেন, তাই হ'ল।"

প্র। সে কি, একদিন ত সাবেক মনিব ব'লে চাট্টি খেতেও বললি নে ?

শ্যামা। আমার বল্‌তে হবে কেন, কপালে থাক্‌লে আপনিই হবে।

বিধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে শ্যামা ?—কার সঙ্গে কথা কচ্চিস্ ?"

শ্যামা। বড় গিন্নী আমাদের কি কি রান্না হয়েছিল জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন।

বিধুভূষণ শ্যামার কথা শুনিয়া জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। সরলাকে কহিলেন, "দেখ্‌লে, আচরণটা দেখ্‌লে ? চণ্ডালেরও এরূপ ব্যবহার নয়। যাই দাদার কাছে, তিনি শুনে কি বলেন, তাই দেখি।"

সরলা কহিলেন, "না, আর কোনখানে গিয়ে কাজ নাই, ও'র যা ইচ্ছা বলুন। ও সব কথায় কান না দিলেই হ'ল।"

ঘরে গোল শুনিয়া প্রমদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও শ্যামা, তোদের ঘরে অত গোল কিসের ? বলি কারুকে নেমন্তন্ন করেছিস্ না কি ?"

বিধু। (সরলার প্রতি) "শুন্‌লে শুন্‌লে, আক্কেলটা শুন্‌লে ?"—বসিয়াছিলেন, এই বলিয়া উঠিলেন।

সরলা তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "ছি, ও সব কথা ব'লো না। হাজার হউক, গুরুলোক ত ?"

বিধুভূষণ কহিলেন, "ও কিসের গুরুলোক। আমি চললাম। দাদাকে বলি গে, দেখি তিনি কি বলেন।" এই বলিয়া সরলার হস্ত হইতে নিজ হস্ত জোরে মুক্ত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে "দাদা দাদা" বলিয়া বিধুভূষণ শশিভূষণের ঘরের দিকে চলিলেন। প্রমদা কৃত্রিম ভয় প্রদর্শনপূর্বক অগ্রে অগ্রে দৌড়িয়া গিয়া ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া কহিলেন, "ওই দেখ, তোমার ভায়া মদ খেয়ে আমাকে মারতে আস্‌ছে।"

শশিভূষণ বিধুভূষণের কথা শুনিয়া কহিলেন, "কে ও ?"

বিধু কহিলেন, "আমি। দাদা, একটা বিচার করতে হবে। বউ যা মুখে আসে, তাই ব'লে আমাদের ঠাট্টা করছেন।"

প্রমদা। ঐ দেখ মদ খেয়েছে। মদ না খেলে অমন মাতালের মত বক্‌বে কেন ?

শশিভূষণ রাগত হইয়া কহিলেন, "ও সব মাতলামি আমার কাছে খাট্‌বে না যাও গে শুয়ে থাক, যদি কিছু বল্‌বার থাকে কাল শুন্‌বো।"

বিধু। মাতলামিটা আবার কি ? আমি মাতাল, না তুমি মাতাল ?

শশি। কি, তুই আমাকে মাতাল বললি ! বেরো আমার বাড়ী থেকে। অমন কর্‌বি ত যে ঘর দিয়েছি, তাও কেড়ে নেবো।

বিধু। ঘর দিয়াছি ? ই—ঘর ভিক্ষা দিয়াছেন আর কি ?

শশিভূষণ ক্রোধে কম্পমান হইয়া কহিলেন, "তবু ঐখানে দাঁড়িয়ে মাতলামি করতে লাগলি ? হরে—এই মাতালটাকে নিয়ে থানায় দিয়ে আয় ত।"

বিধু। হরে আসবে কেন, তুমি এস না ?

এই কথা শুনিবা মাত্র শশিভূষণ দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া কাপড় পরিতে পরিতে বাহিরে আসিলেন। রাগ হইলেই তাঁহার কাপড় খসিয়া যাইত। সরলা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া বিধুভূষণের হাত ধরিয়া গৃহের মধ্যে লইয়া গেলেন। নতুবা একটা হাতাহাতি হইত, তাহার আর সন্দেহ নাই।

বিধুকে গৃহমধ্যে আনয়ন করিয়া সরলা গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। বিধুভূষণ ক্ষণকাল আরক্ত লোচনে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, "সরলা, আর এ বাটীতে থাকার প্রয়োজন নাই। আমি আর এ বাটীতে ত্রিরাত্রি বাস করবো না।"

সরলা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "কপালে যা আছে, তা ভোগ করতেই হবে। আর কোথা যাবে ? বাড়ী থাকলেও আমার একটা ভরসা থাকে। সে যা হোক কাল হবে, এখন কান্না ত্যাগ কর। চোক মুছে ফেল। মিথ্যা কাঁদলে কি হবে ?"

বিধুভূষণ কহিলেন, "একটা কথা বলবো সরলা, বিশ্বাস করবে ? আমি নিজের জন্য এক বিন্দুও দুঃখ করি না। আমার সকল কষ্ট তোমার জন্যে আর ঐ ছোঁড়ার জন্যে। যদি তুমি আমার হাতে না পড়তে, তা হলে তোমায় এত কষ্ট সইতে হ'ত না।"

এই কথা শুনিয়া সরলা পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্রগুণ দুঃখ পাইলেন। ঝর ঝর বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। কণ্ঠ রোধপ্রায় হইয়া আসিল। কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন। বাক্য নিঃসরণ হইল না। নিজের অঞ্চল দ্বারা স্বামীর চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

বিধুভূষণ হস্ত ধরিয়া সরলাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, "সরলা, আর কষ্ট বাড়াইও না। তুমি যদি অত ভাল না বাসতে, আমার দুঃখে অত দুঃখিত না হ'তে, যদি অন্য স্ত্রীলোকের মত আমার সহিত বিবাদ করতে, তা হ'লে আমার কখনই এত দুঃখ হ'ত না। এত দিন কিছু বলি নাই, এখন বলি। তুমি আমাকে নিজে থেকে এক একখানি গহনা যখন বিক্রী করতে দিয়াছ, তখন আমার মনে হয়েছে, যেন আমার এক এক অঙ্গ ছিঁড়ে গেল। কি করি ? না বেচলে নয়, তাই বেচেছি। মাথার উপর ঈশ্বরই জানেন, সে গহনা বেচে ভাত খাওয়া আমার পক্ষে যেন প্রতি গ্রাসে কালকূট খাওয়া হয়েছে। কিন্তু যদি তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক গহনাগুলি নিজে না দিতে, তা হ'লে বোধ হয় আমার এত কষ্ট হ'ত না। এখন এক কথা বলি—সরলা, তুমি বাপের বাড়ী দিন-কতকের জন্য যাও। আর শ্যামাও অন্যত্র কোনখানে যাউক। এখানে থেকে সে গরিব কেন কষ্ট পায় ?"

সরলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমি বাপের বাড়ী গেলে যদি তোমার কষ্ট নিবারণ হ'ত, তা হ'লে বাপের বাড়ী কেন, তুমি যেখানে বল, সেইখানে যেতে পারি। কিন্তু তোমাকে এ অবস্থায় রেখে আমি স্বর্গে গেলেও সুখী হব না। যখন মনে হবে যে, তুমি হয় ত অনাহারে আছ, তখন কেমন ক'রে আমার মুখে অন্ন উঠ্‌বে। তবে গোপালের জন্যে মাঝে মাঝে যেতে ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু গোপাল ত আজও উপোস করে নাই। ওর যত দিন উপোস কর্‌তে না হয়, তত দিন আমি তোমাকে ছেড়ে কোনখানেই যাব না। কিন্তু শ্যামার কথা যা বললে, তা করা উচিত, ও কেন আমাদের সঙ্গে থেকে কষ্ট পায়, আর গঞ্জনা সহ্য করে?"

বিধুভূষণ শ্যামাকে ডাকিলেন। শ্যামা অন্য সময় এক ডাকে তিন উত্তর দিত, আজ কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে আসিল। শ্যামার চক্ষু লাল, মুখ ভার।

বিধুভূষণ কহিলেন, "শ্যামা, আমরা বিবেচনা ক'রে স্থির করলাম, তোমার আর আমাদের কাছে থেকে কষ্ট পাওয়া উচিত নয়। তোমার মাইনা পাওয়া দূরে থাক্‌, দু-সন্ধ্যা খেতেও পাও না। অতএব তুমি অন্য কোন স্থানে যাও। যদি পরমেশ্বর দিন দেন, তখন আবার এস।" বিধুভূষণ আর কথা কহিতে পারিলেন না, কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তিনি অধোবদনে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

শ্যামা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "আমি কি মাইনে চেয়েছি, না মাইনে নেবো ব'লে এসেছি? আমার টাকার দরকার কি? আমারে যাই বল, আমি গোপালকে ছেড়ে থাক্‌তে পারবো না। আমি যদি ভার বোঝা হয়ে থাকি, তোমাদের এখানে আমি খাব না, কিন্তু গোপালকে ছেড়ে আমাকে থাক্‌তে ব'লো না।

বিধু কহিলেন, 'শ্যামা কেঁদ না, স্থির হও। আমি যা বল্‌ছি, ভাল ক'রে বুঝে দেখ। আমাদের সঙ্গে থাকা আর উপবাস একই কথা। গোপালকে না দেখে তুমি থাক্‌তে পার না সত্য, কিন্তু আর কোন বাড়ী গেলেও সেখানে ছেলে-পিলে পাবে। আবার সেখানে মন বস্‌লে আর কোন জায়গায় যেতে ইচ্ছা হবে না।"

"ছেলেপিলে পাব সত্যি, কিন্তু আমার সোটর মতন আর কোনখানে পাব না।"—শ্যামা এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

বিধু কহিলেন, "শ্যামা, স্থির হও।"

শ্যামা কহিল, "গোপালের মতন আমার একটি ছেলে ছিল। আদর ক'রে আমিও তার নাম গোপাল রেখেছিলাম। এখানে থাক্‌লে আমার গোপাল যে নেই, তা আমি ভুলে যাই। আমি এখান থেকে কোন স্থানে যাব না।"

বিধুভূষণ সাশ্রুনয়নে সরলার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এর উপায় কি?" সরলা অধোবদনে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

শ্যামা কহিল, "আমার কিছু টাকা আছে। মনে করেছিলাম গোপালকে দিয়ে যাব। কিন্তু আমার কথা যদি শোন, তবে এক পরামর্শ আছে। (বিধুর প্রতি)

তুমি কোন যাত্রার দলে কাজ নিতে চেষ্টা কর। পাবেই, তার সন্দেহ নেই। আর তত দিন আমরা ঘরে থেকে এই টাকায় চালাই। এর পর সচ্ছল হয়, আমায় টাকা দিও। দিলে গোপালেরই থাক্‌বে।

শ্যামার সকরুণ বচনে সরলা ও বিধু উভয়েই দ্রব হইয়া গেলেন এবং তাহারই পরামর্শ কর্ত্তব্য স্থির করিলেন।

পরদিবস প্রাতে শ্যামার টাকা হইতে রাস্তার খরচ স্বরূপ পাঁচ টাকা লইয়া বিধুভূষণ বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। কলিকাতায় যাইবেন স্থির করিয়া কলিকাতার রাস্তা ধরিলেন এবং মধ্যাহ্নকালে বিশ্রাম হেতু হাঁসখালির নিকটবর্ত্তী গাছতলায় বসিয়া ভাবিতেছিলেন—"বাদ্য গীত ভাল বটে, কিন্তু যাত্রার দলে থাকাটা বড় নীচ কর্ম্ম।" বিধুভূষণ চিন্তা করিতেছেন, অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিলে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে কি না, এমন সময় এক পথিক তথায় উপস্থিত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

মিত্র লাভ

পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষে যে পথিকের কথা বলা হইয়াছে, সে কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘাকার, অপেক্ষাকৃত কৃশ। বয়স ৩২।৩৩ ; বাম করে তামাকসাজা কলিকা সহ হুঁকা, বাম স্কন্ধ হইতে একখানি ময়লা বস্ত্রাবৃত একটি বেহালা ঝুলান, দক্ষিণ করে একগাছি তল্‌তা বাঁশের ছড়ি, পায়ে জুতা নাই, একখানি মলিন বস্ত্র পরিধান। কটিদেশ হইতে গলা পর্যন্ত অনাবৃত, মস্তকে চাদর একখানি পাগড়ি করিয়া বাঁধা, কোমরে একটি ক্ষুদ্র বোঁচ্‌কা। এই অবস্থায় পথিক যখন বিধুভূষণের নিকট গিয়া ছড়িগাছি রাখিয়া বসিল, তখন তাহার কলেবর উত্তম কালিতে লেখা একটি জীবিত ওয়ার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বিধুভূষণ অনন্যমনে নিজের অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, সুতরাং পথিক অগ্রসর হইয়া যে তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিয়াছে, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। কিন্তু হঠাৎ হুঁকার টান শুনিয়া সেই দিকে চাহিলেন। তাঁহার বোধ হইল, যেন পথিক বৃক্ষ হইতে সেই দণ্ডে নামিয়া আসিল। চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে ?"

বিধুভূষণ ভয় পাইয়াছেন বুঝিয়া পথিক উত্তর করিল, "আমি মানুষ, ভয় কি ? আমার মা যে বলেছিল, রাত্রে নদী পার হয়, দিনের বেলায় কাগের ডাকে মূর্চ্ছা যায়, তুমি যে তাই হ'লে। একা বিদেশে আসতে পার, আর মানুষ দেখে ভয় পাও ?"

বিধুভূষণ পথিকের কথা শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, "ঠিক কথা, কিন্তু আমি ত ভয় পাই নাই। তোমার নাম কি ?"

পথিক উত্তর করিল, "আমার নাম নীলকমল, বাড়ী রামনগর, কালাচাঁদ

ঘোষের ছেলে আমি। আমরা দেবনাথ বোসের প্রজা।"

নীলকমলের বেশী কথা কহা একটা রোগ ছিল। বিধুভূষণ তাহার কথা শুনিয়া তাহার বুদ্ধির দৌড় টের পাইলেন। আরও অধিক কথা শুনিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবনাথ বোস কে?"

নীলকমল বিস্ময়াত্মক স্বরে কহিল, "দেবনাথ বোস কে?" তাহার বিশ্বাস ছিল, দেবনাথের মতন ধনী আর দ্বিতীয় নাই।

বিধু। হাঁ, দেবনাথ কে? আমি ত জানি না।

নীল। দেবনাথেরা আগে রাজা ছিল। বর্গীর হ্যাংগামে রাজত্ব যায়, কিন্তু এখনও তাঁরা খুব বড় মানুষ। তুমি তাঁদের নাম শোন নি, এ আশ্চর্য কথা।

বিধু "হবে" বলিয়া চুপ করিলেন। নীলকমল অনেক ক্ষণ হুঁকা টানিয়া, হুঁকাটির মুখ বাম হস্ত দ্বারা পরিষ্কার করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বিধুভূষণের দিকে ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা আপনারা?"

বিধুভূষণ হাসিয়া কলিকাটি লইয়া কহিলেন, "আমরা ব্রাহ্মণ।"

বিধুভূষণ তামাক খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

নীলকমল উত্তর করিল, "আর কোথায়! পয়সার চেষ্টায়। দুঃখের কথা কি কবো? আমরা তিন ভাই, আমার দাদার নাম কেষ্টকমল, আর ছোট ভাইয়ের নাম রামকমল। তারা কিছুই করে না। সকলেই আমি যা আনবো, তাই খাবে। একা মানুষ, জাতব্যবসায়ে আর সংসার চালাতে না পেরে এখন বিদেশে বেরুয়েছি। দেখি, বিদেশে টাকা আছে কি না!"

নীলকমলের কথা শুনিয়া বিধুর পক্ষে হাস্য সম্বরণ করা অতি কষ্টকর হইল। কিন্তু নীলকমল দুঃখ করিয়া যাহা বলিতেছে, তাহাতে হাসা অনুচিত মনে করিয়া কহিলেন, "বিদেশে টাকা আছে কি না দেখতে চাও, কিন্তু দেখতে পাবে যে, তার প্রমাণ কি?"

নীলকমল দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বেহালাটি উঠাইয়া বিধুভূষণকে দেখাইয়া কহিল, "গুণ! গুণ না থাকলে বলি? ওস্তাদজীর আশীর্ব্বাদে আমার আর অন্নচিন্তা নাই। এখন বড়মানুষ হওয়াই বাকি?"

বিধু মনে করিলেন, হ'তেও পারে, নীলকমল একজন ভাল বেহালাদার, কিন্তু কথাবার্ত্তা শুনে ত তার কিছুই বোধ হয় না। একবার পরীক্ষা করা যাউক। পরে প্রকাশ্যে কহিলেন, "একবার বাজাও দেখি?"

নীলকমল অবিলম্বে বেহালাটি খুলিয়া দুই চারি বার তাহার কান মোড়া দিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল। মাথা এমনি দুলিতে লাগিল যে, বিধুর বোধ হইতে লাগিল, নীলকমলের মৃগী রোগ উপস্থিত হইল, চক্ষু ঘুরিতে লাগিল, এবং সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি গাইতে পার?"

নীলকমল "হাঁ" বলিয়া বেহালার গত ছাড়িয়া দিয়া গান ধরিল এবং বেহালার

সঙ্গে সঙ্গে নিজেও আরম্ভ করিল—

"পদ্মআঁখি আজ্ঞা দিলে পদ্মবনে আমি যাব,
আনিয়ে নীল পদ্ম সে নীল পদ্ম চরণপদ্মে দিব।"

গান শুনা দূরে থাকুক, নীলকমলের হাবভাব মুখভঙ্গী দেখিয়া বিধু আর হাসি রাখিতে পারিলেন না। নীলকমল তদ্দর্শনে রাগত হইয়া গীতবাদ্য বন্ধ করিয়া কহিল, "দাদাঠাকুর বলেছিল—'নীলকমল, বেণাবনে মুক্তা ছড়াইও না।' তোমরা এর কি বুঝবে? থাকতো যদি ওস্তাদজী, কি কালীনাথ দাদা, তবে তারা বুঝতে পারতো। ছেলে মানুষের মত হাসলে হয় না। গোবিন্দ অধিকারী আমাকে দশ টাকা মাইনে দিতে চেয়েছিল, আমি যাই নি। কত খোশামোদ, তবু না।"

প্রথম প্রথম নীলকমলের বেহালার হাত মন্দ ছিল না। গোবিন্দ অধিকারী মনে করিয়াছিল, ভাল শিক্ষা পাইলে নীলকমল ভাল হইতে পারে; এ জন্য পাঁচ টাকা বেতন দিয়া নিজের সঙ্গে রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। নীলকমল তদবধি মনে করিল, সে একজন তানসান হইয়াছে। আর কাহাকেও তৃণজ্ঞান করিত না। যে সকল বোল শিখিয়াছিল, তাহার মধ্যে নিজের টিপ্‌নি প্রবেশ করাইল, মাথা কাঁপান ধরিল, মুদ্রাদোষ সংগ্রহ করিল এবং অন্যান্য নানা কারণ প্রযুক্ত অল্প দিনের মধ্যেই একজন অসহনীয় বাদ্যকর হইয়া উঠিল। গোবিন্দ অধিকারী যে নীলকমলকে সঙ্গে রাখিতে চাহিয়াছিল, সেই নীলকমলের শনি হইল। নীলকমল তদবধি লেখাপড়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে লাগিল। "লেখা কি?" নীলকমল কহিত, "লেখা কলম দিয়া আকর (অক্ষর) বের করা, আর বাজনা কাঠের ভেতর থেকে কথা বের করা। লেখা ইচ্ছা কল্লে সকলেই শিখতে পারে, কিন্তু বাজনা শিখতে মা-সরস্বতীর বিশেষ করুণা চাই।" এই অবধি সে জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিল। পূর্বে সন্ধ্যার পর একটু একটু বাজাইত, গোবিন্দ অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াবধি সমস্ত দিন বেহালা ভিন্ন আর কিছুই নীলকমলের হাতে দেখা যাইত না। কৃষ্ণকমল পাড়ার লোকের গাভী দোহন করিত এবং প্রতি গরুতে দুই আনা বেতন পাইত। যে দিন বেতনগুলি আনিয়া বাটী রাখিত, নীলকমল অবিলম্বে চুরি করিয়া লইয়া একটি নূতন বেহালা কিনিত। উপায়ান্তর না দেখিয়া কৃষ্ণ নীলকমলকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। নীলকমল গমনকালে বলিয়া গেল, "তোরা মুড়ী মিশ্রীর সমান দর কল্লে। কিন্তু আমি যে কত বড় একটা লোক, তা তোরা টের পেলি নে, এই দুঃখ। ভাল, আমি চল্লাম, ফিরে এলে তোরা যদি আমার দুয়ারে ব'সে কাঁদিস, তবু এক মুটো অন্ন দেবো না।"

বিধুভূষণ নীলকমলকে সান্ত্বনা করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বিবাহ হয়েছে নীলকমল?"

নীলকমল অতি অহঙ্কার সত্ত্বেও মন্দ লোক ছিল না, এ জন্য একটু হাসিয়া উত্তর করিল, "না, একটা সম্বন্ধ স্থির ক'রে দিতে পার?"

বিধু। চেষ্টা না করলে কেমন করে বল্‌বো। কিন্তু আপাততঃ তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

নীল। কলিকাতায় গোবিন্দ অধিকারীর কাছে যাচ্ছি। সে চার পাঁচ বছর হ'ল, আমাকে দশ টাকা ক'রে মাইনে দিতে চেয়েছিল। তার পর আমি কত শিখিছি। দু-এক সময় ওস্তাদজীও আমার কাছে এখন লজ্জা পান। এখন বিশ টাকা না হয়, পনের টাকা ত পাবই। তার পাঁচ টাকা খাব আর দশ টাকা বাঁচাব। এক বৎসরের মধ্যেই বিয়ে করতে পারবো না ?

বিধুভূষণ নীলকমলের প্রফুল্লতা দর্শন করিয়া প্রথমতঃ আহ্লাদিত হইলেন। মনে করিলেন, পাগলের মনে সদাই সুখ বলে, তা বড় মিথ্যা নয়। এর অবস্থা আমার মতনই দেখছি, বেশীর মধ্যে আমি যথার্থই ভাল বাজাইতে পারি, এ নির্জলা মূর্খ, তবু কলিকাতায় গেলেই ১৫ টাকা বেতন পাইবে ইহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। হায় ! আমি যদি এর মতন চিন্তাশূন্য হইতে পারিতাম। কিন্তু আবার এই ভাবিয়া দুঃখিত হইলেন—নীলকমল দেখিতেছি কখনই বাটীর বাহির হয় নাই। নৈরাশ কাহাকে বলে জানে না। ইহার যে চাকরি হইবে, এ স্বপ্নের অগোচর। যখন জানিতে পারিবে যে, চাকরি হইল না, তখন আর এর দুঃখের সীমা থাকিবে না। ক্ষণকাল এই প্রকার চিন্তা করিয়া বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীলকমল, তুমি আর কখন বিদেশে গিয়েছিলে ?"

নীলকমল কহিল, "না।"

বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেমন ক'রে তবে একা কলিকাতায় যাবে, কে রাস্তা ব'লে দেবে ?"

নীল। রাস্তার লোকে রাস্তা ব'লে দেবে। কানের জল, জল দিলে বেরোয়।

বিধুভূষণ মনে করিলেন, আমি একাকী, ইহাকে সঙ্গে লইলে হয়, কিন্তু নিজের খরচের অপ্রতুল ইহাকে আবার খেতে দিতে হ'লে ত যাতে পাঁচ দিন চলবে, তা দু-দিনে শেষ হয়ে যাবে। কিয়ৎকাল ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীলকমল, তুমি যে কলিকাতায় যাবে, কিছু খরচপত্র এনেছ ?"

নীল। খরচপত্রের মধ্যে এই বেহালা। সকলেই ত আর তোমার মতন বাজনা শুনে হাসে না। রাস্তায় যদি এক জন গুণী লোক পাই ত এক-দণ্ডে পাঁচ দিনের জোগাড় ক'রে নিতে পারবো। যে পদ্মআঁখির গানটা শুনে তুমি হাসলে, কত লোক উই শুনে কেঁদেছে।

বিধু। আমি ত তোমার গানে হাসি নাই। তোমার মাথা-নাড়া দেখে হাসি এলো।

নীল। যদি তুমি গান বাজনা জান্‌তে, তবে অমন কথা বল্‌তে না। তালের সময় তাল না দিয়ে কি কেউ থাক্‌তে পারে ? গাইয়ে বাজিয়ে লোকের সঙ্গে দেখা হ'লে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো।

বিধু। তা জিজ্ঞাসা করা যাবে। কিন্তু আমি আর এক কথা ভাব্‌ছি।

আমিও কলিকাতায় যাচ্ছি। চল, দু-জনে একত্র হয়ে যাই।

নীল। তা হ'লে ত ভালই হয়, কিন্তু একটা বন্দোবস্ত আগে করা ভাল। আমি বাজিয়ে গেয়ে যেখানে যা পাব, তুমি তার ভাগ পাবে না।

বিধুভূষণ সহজেই সম্মত হইলেন। অতঃপর নীলকমল ঘুন ঘুন করিয়া 'পদ্মআঁখি আজ্ঞা দিলে' গাইতে গাইতে, আর বিধুভূষণ ভবিষ্যতের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে উভয়েই বৃক্ষমূল হইতে প্রস্থান করিলেন।

নীলকমল পদ্মআঁখির গানটা বড়ই ভাল বাসিত এবং এতই গাইত যে, যদি গানটি কোন জড় পদার্থ হইত, তবে পাষাণের মত কঠিন হইলেও ক্ষয় হইয়া যাইত।

দশম পরিচ্ছেদ

প্রবাসে প্রথম রাত্রি

সন্ধ্যাকালে নীলকমল ও বিধুভূষণ এক বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং তথায় রাত্রিকালে অবস্থিতি করিতে পারেন, এমন একটু স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যেখানে যান, সেইখানেই ঘর পূর্ণ দেখিতে পান। খালি আর নাই। অনুসন্ধান করিতে করিতে বাজারের একটু দূরে একখানি ঘরে আলো জ্বলিতেছে দেখিতে পাইলেন। ঘরখানির সম্মুখে বৃহৎ বৃহৎ গোটাকতক আম্রবৃক্ষ, এ জন্য সন্ধ্যার পর হঠাৎ সে ঘরখানি দেখিতে পাওয়া যায় না ও পথিকেরা বাজারের মধ্যে স্থান পাইলে আর তথায় গমন করে না। বিধু ও নীলকমল তথায় গমন করিয়া দেখিলেন যে, সেখানেও দু-এক জন পথিক আসিয়াছে। কিন্তু তথাপি আরও দু-এক জন থাকিতে পারে, এমত স্থান আছে।

মুদী ঘরে নাই। কিছু দূরে এক হাটে গিয়াছে, তাহার স্ত্রী দোকানের কার্য করিতেছে। বিধুভূষণ তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"বাছা, এখানে দু-জন লোকের থাক্‌বার জায়গা হবে?"

মুদির স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল, "কি লোক?"

বিধুভূষণ উত্তর করিলেন, "একটি ব্রাহ্মণ, আর একটি শূদ্র।"

মুদীর স্ত্রী কহিল. "দু-জন ব্রাহ্মণ হ'লে হ'তে পারতো। দোকানে আর দুটি ব্রাহ্মণ আছেন। এঁদের মধ্যে ত আর শূদ্র থাক্‌তে পারবে না। কিন্তু যদি তোমার লোকটি ঐ গাছতলায় থাকে, তা হ'লে এখানে জায়গা হ'তে পারে।"

বিধু নীলকমলের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কি বল নীলকমল?" নীলকমল কহিল, "ঐ ত বারাণ্ডায় জায়গা আছে, আমি ওখানে থাক্‌তে পারবো না?"

মুদীর স্ত্রী। ওখানে গরু থাক্‌বে।

নীল। গরুটা কেন গাছতলায় রাখ না?

মুদীর স্ত্রী। গরুটা গাছতলায় রেখে তোমাকে ঘরে জায়গা দেবো ? তুমি আমার গুরুঠাকুর এলে আর কি ? বিদেশে আস্‌তে শিখেছ, গাছতলায় শুতে শেখ নি ?

নীলকমল বড় অভিমানী ছিল, সুতরাং মুদীর স্ত্রীর কথা শুনিয়া সহজে তাহার রাগ হইল। বিধুকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "চল আমরা গাঁয়ের ভিতর কোনখানে থাকি এখানে থাকা হবে না।" বিধু পথশ্রান্তিতে কাতর ছিলেন, তিনি কহিলেন, "তুমি যাও, আমি এইখানে থাকি।"

নীলকমল আরও রাগত হইয়া কহিল, "থাক, তবে আজও থাক, কালও থাক। আমি এই বিদায়। আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।" এই বলিয়া নীলকমল প্রস্থান করিল, বিধু ঘরে উঠিয়া বসিলেন।

নীলকমল কিয়দ্দুর গিয়া থামিল। তাহার বিশ্বাস ছিল, একটু রাগ করিয়া গেলেই বিধুভূষণ তাহাকে ডাকিবেন। বিধুরও ডাকিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নীলকমলের চরিত্র তাঁহার পূর্ব্বে জানা ছিল, এ জন্য তিনি নিশ্চিত হইয়া বসিয়া ছিলেন যে, নীলকমল আপনিই ফিরিয়া আসিবে। বস্তুতঃ তাহাই ঘটিল। নীলকমল ক্ষণকাল এক স্থানে স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া ভাবিতে লাগিল, পুনর্ব্বার না ডাকিলে কি প্রকারে যাই। রাত্রি অন্ধকার, অন্য কোন ভয় না থাকিলেও যে কেহ সে রাস্তায় চলিতে পারিত, তাহা নিতান্ত অসম্ভব। গ্রামের লোকেরই সে রাস্তা দিয়া বিনা আলোকে চলা দুঃসাধ্য। নীলকমল ভাবিয়া চিন্তিয়া দু-এক পা করিয়া পুনর্ব্বার দোকানের উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। বিধুকে ডাকিয়া কহিল, "রাত্রিকালে তোমাকে একা ফেলে যাওয়া অন্যায়, তাই ভেবে আমি ফিরে এলাম। তুমি ঘরে থাক, করি কি, আমি গাছতলায় থাক্‌বো।" কিন্তু নীলকমলের মনে মনে এই রহিল যে, হয় উভয়েই গাছতলায় থাকিবেক, নচেৎ সমস্ত রাত্রি গান করিয়া কাটাইয়া দিবে, অর্থাৎ কাহাকেই ঘুমাইতে দিবে না।

বিধুভূষণের বস্ত্রাদি তাদৃশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল না, এ কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। যে দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, সেখানে তাঁহার পূর্ব্বে আর দুইটি ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল, তাহাও বলা হইয়াছে। সে দুইটি ব্রাহ্মণের বস্ত্রাদি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ; কথোপকথনে টের পাইলেন, তাহারা কলিকাতায় কলেজে অধ্যয়ন করে। শীতের বন্ধের পর পুনর্ব্বার কলিকাতায় যাইতেছে। মুদীর স্ত্রী কায়মনোবাক্যে তাহাদের পাক শাক ইত্যাদির তদ্বির করিয়া দিতেছে। বিধুর কথা বড় শোনে না। দু-বার তিন বার না চাহিলে একটু তামাক কিম্বা জল দেয় না। কোথা পাক করিবেন জিজ্ঞাসা করায় উত্তর করিল, "ঐ খোস্তা আছে, ঘরের ঐ কোণে একটা উনুন কাট, ঐ মাচার উপর হাঁড়ি আছে, একটা নেও, আর ঐ বারাণ্ডায় কাঠ আছে, এনে রাঁধা-বাড়া কর।" এই বলিয়া মুদীর স্ত্রী অপর দু-জন ব্রাহ্মণের জন্য হাঁড়ি, জল, কাঠ ইত্যাদি আনিয়া দিল।

মুদীর স্ত্রীর কথা শুনিয়া বিধুভূষণের সর্ব্বাঙ্গ রাগে জ্বলিয়া উঠিল। রাগতস্বরে কহিলেন, "আমি যদি সব করবো, তবে এখানে এসে আমার লাভ কি ?"

মুদীর স্ত্রী মিষ্টি মিষ্টি করিয়া কহিল, "এখানে কোন লাভ না হয়, যেখানে হয়, সেইখানেই যাও। আমি ত তোমার বাড়ী থেকে তোমাকে ডেকে আনতে যায় নি।"

বিধুভূষণ দেখিলেন, এ তাঁহার নিজের বাটী নহে। রাগ করিলে এখানে কেহই তাঁহার রাগ গ্রাহ্য করিবে না। মনের আগুন মনে রাখিয়া একটু কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া রসিকতাছলে কহিলেন, "অত চটলে চলবে কেন! তুমি চটলে এখন আমরা দাঁড়াই কোথা!"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই মুদীর স্ত্রী তাঁহার রসিকতায় বিরক্ত হইয়া উত্তর করিল, "আর তোমার পিরিতে কাজ নাই, খোন্তা নিয়ে উনুন কেটে রেঁধে খেতে হয় খাও, না হয় এই বেলা জায়গা দেখ।"

বিধুর আর বরদাস্ত হইল না। রাগত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "তুই ভেবেছিস, এই দোকান ছাড়া বুঝি আর দোকান নাই। চললাম তোর এখান থেকে।" এই বলিয়া ব্যস্ত হইয়া বাহির হইবেন, এমন সময় মুদী বাটী আসিল, এবং মাথার দোকান নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কিসের গোলমাল করছো ?" মুদীর স্ত্রী কহিল, "ঐ দেখ, কোথাকার এক খদ্দের এসেছে ; যেন নবাব আর কি, আপনার উনুন আপনি কেটে রেঁধে খেতে পারবে না।"

মুদী বিধুর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা আপনারা ?"

বিধু কহিলেন, "ব্রাহ্মণ।"

মুদী। ব্রাহ্মণ, প্রণাম। আচ্ছা, আমি উনুন কেটে দেব এখন। ব'সো ঠাকুর ব'সো।

বিধুভূষণ বসিলেন।

গোলমাল থামিলে নীলকমল বলিয়া উঠিল, "মুদিনীর আবার জাঁক দেখ। না দেয় জায়গা, না দেয় আসন, এখনি আমরা অন্য দোকানে যাব।" কিন্তু এ কথা পূর্ব্বে বলিতে ভরসা হয় নাই।

যে দুটি ব্রাহ্মণের জন্য মুদীর স্ত্রী এত ব্যস্তসমস্ত হইয়া উদ্যোগ করিয়া দিতেছিল, তাঁহারা অল্পবয়স্ক : ১৯।২০ বৎসরের বেশী নহে, উভয়েই ব্রাহ্ম। এই গোলযোগের সময় তাঁহারা উপাসনা করিতেছিলেন। অর্থাৎ একজন অতি মৃদু স্বরে ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছিলেন। তাঁহার মুদিত নেত্র হইতে অশ্রুধারা বহিতেছিল। আর একজন হেঁট মুণ্ডে একবার মুদিনীর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে—আর একবার নিজ সঙ্গীর দিকে সভয় নেত্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন।

ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানীরা কেঁদে কেঁদে চক্ষের জল দ্বারা সে

অগ্নিটুকু সত্বরই নির্ব্বাণ করিয়া ফেলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এই অগ্নি জ্বলিয়া উঠে; আড়াই বৎসর মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিয়া পরে চক্ষের জলে নিবিয়া যায়।

মুদীর প্রবেশ মাত্রেই যে ব্রাহ্মণটির চক্ষু বাতাসে বিলোড়িত দীপশিখার ন্যায় একবার এ দিক্ একবার ও দিক্ যাইতেছিল, তিনি একাগ্রচিত্তে উপাসনায় মনোনিবেশ করিলেন। মুদী তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এরা কারা?" তাহার সহধর্ম্মিণী উত্তর করিল, "এরা ব্রাহ্মণ, কলেজে পড়ে। এখন ওদের কিছু ব'লো না, ওরা পরমেশ্বরের নাম করছে।"

মুদী বিস্মিত ও রাগত হইয়া তাহার স্ত্রীকে কহিল, "ওঁদের আমার ঘরে কে জায়গা দিলে? ওরা ব্রাহ্মণ, তোরে কে বললে; দেখতে পাচ্ছিস নে, সব ধর্ম্মঘট করছে? ওদের কি জাত আছে?" পরে ব্রাহ্মদ্বয়ের প্রতি, "ওগো, আপনারা ব্রাহ্মণই হও, আর যাই হও, এখন ওটো। আমার ঘরে রান্নার জায়গা হবে না, আমি হিন্দু মানুষ, ধর্ম্মঘট টট্ কিছু বুঝি নে। ওটো ওটো।"

মুদীর কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণদ্বয়ের ধ্যান ভঙ্গ হইল। নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখেন, সম্মুখে পাঁচ হাত লম্বা এক প্রকাণ্ড মুদীর মূর্ত্তি রাগত হইয়া তাঁহাদিগকে উঠিয়া যাইতে কহিতেছে। অন্ধকার রাত, অজ্ঞাত স্থান! কোথায় যান?

উভয়েই সকরুণ স্বরে কহিলেন, "আমরা ধর্ম্মঘট করছি তোমাকে কে বললে? আমাদের কালেজের পড়া মুখস্ত পড়তেছিলাম।"

"পড়াই পড়, আর ধর্ম্মঘটই কর, আমার এখানে তোমাদের জায়গা হবে না।" যে ব্রাহ্মটি উপাসনার সময় একাগ্রচিত্তে এ দিকে ও দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন, তাঁহার মনে লইল, মুদীর রাগ যেন তাঁহারই উপর বেশী—কথা কহিবার সময় যেন তাঁহারই দিকে চাহিয়া কহিতেছে, এ জন্য তিনি নয়ন উত্তোলন করিলেন না। উভয়ের উঠিতে অনিচ্ছা দেখিয়া মুদী অগ্রে তাঁহারই হাত ধরিয়া কহিল, "আমি ভালস্বরে বলছি, এই বেলা ওটো, না ওটো যদি, তবে একটা গোলযোগ হবে।" এই বলিয়া মুদী ঘরের কোণের দিকে চাহিল। কোণে একগাছি স্থূলকলেবরা তালযষ্টি ছিল।

ব্রাহ্মদ্বয়ও সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং দ্বিতীয় কথাটি না কহিয়া গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন।

ঘর পরিষ্কার হইলে সহধর্ম্মিণীকে মুদী কহিল, "বড় ধুম, যেন বাড়ী কুটুম এসেছে, না? ওরা কে? তোর ভাই না কি যে, তুই দোকানের কাজ ফেলে দুটো ভাল খদ্দের তাড়িয়ে ইষ্টদেবতার মতন ওদের সেবা কচ্ছিস্?"

মুদীপত্নী চুপ করিয়া রহিল। বোধ হয় তাহার সহিত কথা কহিবার সময়ও মুদী গৃহের কোণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিল।

এইরূপে সমস্ত গোলমাল চুকিয়া গেলে মুদী তামাক খাইতে আরম্ভ করিল,

বিধু পাকশাকের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন ও নীলকমল ঘুন ঘুন করিয়া "পদ্মআঁখি আজ্ঞা দিলে" ধরিল। ব্রাহ্মদ্বয় আস্তে আস্তে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মদ্বয় চলিয়া গেলে নীলকমলেরও ঘরের মধ্যে স্থান হইল। বিধুভূষণ রন্ধন করিলেন। উভয়ে আহারাদি করিয়া শুইলেন।

বিধুভূষণ আর কখন বাটীর বাহির হন নাই। নূতন স্থান ও বাটীর ভাবনা প্রযুক্ত তাঁহার ঘুম হইল না। নীলকমল শয্যায় শয়ন করিবা মাত্রই নাসিকাধ্বনি করিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল। একে দোকান-ঘর, চারি দিকে খোলা, তাহাতে সম্মুখে কতকগুলা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ, আবার রাত্রিকাল, সমুদায় নিস্তব্ধ। গাছের পাতার একটু একটু শব্দ হইলেই যেন দশগুণ হইয়া বিধুর কানে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঘরের মধ্যে ইন্দুরগুলা কিচ্ কিচ্ করিয়া এ-কোণ ও-কোণ করিতে লাগিল। চামচিকাগুলা উড়িতে আরম্ভ করিল। বিধুর কিঞ্চিৎ ভয়ের সঞ্চার হইল—"নীলকমল" "নীলকমল" করিয়া ডাকিতে ডাকিতে নীলকমল কহিল, "তুমি যে আমাকে বিরক্তই কল্লে।"

বিধুভূষণ কহিলেন, "নীলকমল, একবার তামাক খাও। অত ঘুমুচ্ছ কেন? বিদেশে, বিশেষ রাস্তায় বেশী ঘুমান ভাল নয়।"

"বিদেশে রাস্তায় অত ঘুমান ভাল নয়। কেন, মন্দই বা কি? আমার কি আছে যে চোরে নিয়ে যাবে?"

বিধু কহিলেন, "তা নয় নীলকমল! আমিও বিদেশে এসেছি। কিন্তু তোমার একটা গুণ আছে, অনায়াসে দু-টাকা করতে পারবে, কিন্তু আমার ত কোন গুণ নাই। যদি তুমি বেহালাটা আমাকে শেখাও, তা হ'লে তোমার কাছে চিরকাল কেনা রব।"

নীলকমল বেহালা ও গানের নামে জল হইয়া যাইত। প্রফুল্লচিত্তে কহিল, "হাঁ শেখাব, তার ভাবনা কি? আজই কি আরম্ভ করবো।"

"শুভস্য শীঘ্রং।" বিধুভূষণ কহিলেন, "যা শেখা উচিত, তা এখন আরম্ভই ভাল।"

নীলকমল বেহালাটি লইয়া দুই-চারি বার তাহার কান মোড়া দিয়া আরম্ভ করিল। কহিল, "আমি যেমন বাজাই ও গাই, তুমি আগে নিপুণ হয়ে শোন; পরে তুমি শিখতে পারবে।" এই বলিয়া নীলকমল "পদ্মআঁখি" ইত্যাদি আরম্ভ করিল, বিধুভূষণও ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

হেম ও স্বর্ণলতা

বর্দ্ধমান জেলার বিপ্রদাস চক্রবর্ত্তী একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি অধিক ছিল না বটে, কিন্তু ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ সময়ে তিনি কমিসারিয়েটে কর্ম্ম করিতেন। এই কার্য্যই তাঁহার শ্রীবৃদ্ধির মূল। নূতন বড়মানুষ হইলে প্রায়ই কৃপণ হয়; কিন্তু বিপ্রদাসের সে দোষটি ছিল না। তাঁহার সদ্ব্যয় যথেষ্ট ছিল। দেবসেবায় ও অতিথিসেবায় তাঁহার অনেক টাকা ব্যয় হইত। বাটীতে কোন পার্ব্বণ ফাঁক যাইত না। দোল দুর্গোৎসব ইত্যাদিতে তাঁহার যৎপরোনাস্তি আস্থা ছিল। সংক্ষেপে তিনি একজন যথার্থ "সেকেলে" ধার্ম্মিক ছিলেন। অর্থাৎ অর্থ উপার্জ্জনের সময় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেন না। এ টাকা লওয়া উচিত নয়, এ টাকা লইলে ক্ষতি নাই, এরূপ কোন চিন্তা করিতেন না। টাকা পাইলেই গ্রহণ করিতেন। এবং ঐ অর্থ দেবসেবা ইত্যাদিতে ব্যয় করিতে পারিলেই সার্থক উপার্জ্জন জ্ঞান করিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর পরলোক হওয়া অবধি বিপ্রদাস কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বাটীতেই থাকিতেন। তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা, পুত্রটির নাম হেমচন্দ্র, কন্যাটির নাম স্বর্ণলতা। তাঁহার ন্যায় অপত্যবৎসল লোক সচরাচর দেখা যায় না।

পূজার সময় গ্রামস্থ যাহারা যাহারা বিদেশে থাকে, সকলেই বাটী আসিয়াছে।

হেম বাড়ী আসিয়াছে। মা নাই বলিয়া পাছে আদরের ত্রুটি হয়, এ জন্য বিপ্রদাস নিজে দু-বেলা আহারের সময় হেমের কাছে বসিয়া থাকেন। তাঁহার মাতাকে কহেন—বিপ্রদাসের মাতা অদ্যাপি জীবিত আছেন—"মা, আমি তোমার যেমন আদরের জিনিস, হেমও আমার কাছে তেমনি। যখন যা চায়, হেমকে তখনই তাই দিও।"

এক দিবস বিপ্রদাস স্বর্ণকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আজ আমার স্বর্ণ কোথায়? তাকে দেখ্‌ছি না কেন?"

স্বর্ণ পাশের ঘরে ছিল। পিতার মুখে তাহার নাম শুনিয়া দৌড়িয়া হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে আসিল। কহিল, "এই যে বাবা! আমরা মাঝের ঘরে ছিলাম।"

বিপ্র। এস, মা এস। আমার লক্ষ্মী মা এস। এ কি মা, সমস্ত হাতে মুখে কালি মেখেছ কোথা থেকে?

স্বর্ণ। আমি দাদার কাছে লিখ্‌তে শিখ্‌ছিলাম, দাদা আমাকে দেখিয়ে দিচ্ছিল।

বিপ্র। তুমি লিখ্‌তে শিখ্‌ছো। তোমার লেখায় দরকার কি?—এই বলিতে বলিতে হেমও তথায় আসিল।

হেম কহিল, "তাতে দোষ কি? এখন সকল মেয়েই লেখাপড়া করে। কলিকাতায় কত স্কুল হয়েছে, সেখানে কেবল মেয়েরাই পড়ে।"

বিপ্রদাস কহিলেন, "আচ্ছা বাপু, তোমার যা ইচ্ছে তাই কর। কিন্তু তুমি ক'দিনই বা বাড়ী থাকবে। তুমি কলিকাতায় গেলে তখন কে শেখাবে?"

হেম। স্বর্ণ তখন আপনিই শিখতে পারবে। এই তিন চার দিনের মধ্যেই ক খ লিখতে শিখেছে। আমি কলিকাতায় যাবার আগে ওর ফলা বানান শেষ হবে।

বিপ্র। বটে? আমার লক্ষ্মী যে মা-সরস্বতী হয়েছেন। (ক্রোড়স্থিত স্বর্ণের প্রতি) স্বর্ণ মা, তুমি আমার মা-লক্ষ্মী হবে, না মা-সরস্বতী হবে?

স্বর্ণ। আমি দু-ই হব বাবা।

বিপ্রদাস সস্নেহ নয়নে স্বর্ণলতার প্রতি ক্ষণেক একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। চক্ষু হইতে দুই এক বিন্দু প্রেম-অশ্রুপাত হইল। পরে শির চুম্বন করিয়া স্বর্ণলতাকে ভূমে নামাইয়া দিয়া কহিলেন, "আচ্ছা যাও, তোমার দাদার কাছে গিয়া লেখাপড়া শিখ।"

হেম স্বর্ণের হাত ধরিয়া লইয়া, যে গৃহে তাহাকে শিখাইতেছিলেন, সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। বিপ্রদাস বহির্দ্বারে আসিলেন।

পূজা সমাগত হইল। মহোৎসবে তিন দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। যতই কেন আমোদ হউক না, যতই কেন গোলযোগ হউক না, বিপ্রদাস এক মুহূর্ত্তের জন্যেও হেম ও স্বর্ণলতার নাম বিস্মৃত হন না। পূজার পর স্কুল খোলা হইলেই হেম পুনর্ব্বার কলিকাতায় গেলেন। স্বর্ণ যথার্থই অতি অল্প দিনের মধ্যে ফলা বানান শেষ করিল। হেম কহিয়া গেলেন, "স্বর্ণ, আমি কলিকাতায় গিয়াই তোমার জন্য একখানা বই পাঠাইয়া দিব। আর যদি তুমি আমাকে চিঠি লিখতে পার, তবে চৈত্র মাসে যখন বাড়ী আসবো, তোমার জন্যে দিব্বি একটি খোঁপার ফুল আনবো।"

স্বর্ণ সহাস্য বদনে কহিলেন, "এই কথা ত দাদা! যেন মনে থাকে।"

হেম। তা থাকবে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রমদা গৃহকার্য্যের সদুপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন;
শশিভূষণের সে জন্য ভাবনা নাই

বিধুভূষণকে পৃথক্ করিয়া দিয়া প্রমদা তিন চারি দিবস বিনা কলহে অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু যেমন অঙ্গারের মলিনত্ব শত শত বার ধৌত করিলেও যায় না, তেমনি স্বভাব কখন পরিবর্ত্তন হয় না। প্রমদা ঠাকরুণদিদির সহিত কলহ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঠাকরুণদিদির প্রতি নানাবিধ দোষারোপ করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরুণদিদি না কি তেল নুন চুরি করেন, ঠাকুরুণদিদি কালো, ঠাকুরুণদিদি অপরিষ্কার। প্রমদা এ সকল কথা কি ঠাকুরুণদিদির মুখের উপর বলিতেন? তা নয়। মুখের উপর বলিলেই ঠাকুরুণদিদি হাঁড়ি কুঁড়ি ফেলিয়া চলিয়া যাইবেন, প্রমদা তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। এ জন্য পাড়ার অন্যান্য লোকের সহিত এ সমস্ত আলাপ হইত এবং তাহারা অবিলম্বেই এ সমুদায় কথা ঠাকুরণ-দিদিকে কহিত। ঠাকুরুণদিদি এক দিন মুখ ভার করিলেন। পরদিন দুই একটি অসন্তোষের কথা কহিলেন। তৃতীয় দিবস প্রমদার সহিত সম্মুখ-যুদ্ধ করিবেন ঘোষণা করিয়া দিলেন। কেনই বা না করিবেন? তিনি ত সরলার ন্যায় পরাধীনা নন। পরদিবস বৈকালে মহা ঝগড়া উপস্থিত হইল। প্রমদাও চুপ করিবার লোক নন, ঠাকুরুণদিদিও নন। একজন অপরকে পরাস্ত করিবারও জো নাই। উভয়েই কলহবিদ্যাবিশারদ। ঠাকুরুণদিদি অনেক ক্ষণ ঝগড়ার পর দু-হাতের দুটি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রমদার মুখের কাছে লইয়া গিয়া কহিলেন, "আমি তোর দাসী, না তোর রাঁধুনী যে, যা মনে আসছে, তুই তাই বল্‌চিস, এই থাক্‌লো তোর বাড়ী-ঘর, আমি চল্লাম। তুই রেঁধে খাস্ আর না খাস্, তোরই ইচ্ছা, আমার কি—" এই বলিয়া ঠাকুরুণদিদি শশিভূষণের বাড়ী ত্যাগ করিলেন। প্রমদা কখন সমকক্ষ লোকের সহিত কলহ করেন নাই। সুতরাং এত দিন পরাস্তও হন নাই। আজ এই প্রথম সম্মুখ-যুদ্ধে পরাভূত হইলেন।

ঠাকুরুণদিদি চলিয়া গেলে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত প্রমদা একাকিনী গৃহে বসিয়া রোদন করিলেন। পরে চক্ষু মার্জ্জন করিয়া বাহিরে আসিলেন। আজকার বিবাদে অভিমান খাটিবেক না, এ জন্য নিজ হস্তেই গৃহের কাজকর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

শশিভূষণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাটী আসিলেন। সন্ধ্যাহ্নিক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরুণদিদি কোথায়?"

প্রমদা উত্তর করিলেন, "ঠাকুরুণদিদিকে তাড়িয়ে দিয়েছি।" ঠাকুরুণদিদি নিজেই চলিয়া গিয়াছেন বলিতে প্রমদার কোন মতেই ইচ্ছা হইল না, বস্তুতঃ তাহাই সত্য।

শশিভূষণ কহিলেন, "কেন, ঠাকুরুণদিদির অপরাধ?"

প্রমদা যাহা মনে আসিল, তাহাই বলিলেন। বিধুভূষণকে পৃথক্ করিয়া দিবার সময় ঠাকুরুণদিদি বড় ভাল মানুষ ছিলেন, কিন্তু দশ দিন না হইতে হইতেই ঠাকুরুণদিদির এতগুলি দোষ উপস্থিত, শুনিয়া শশিভূষণ কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তুমি কখন্ কারে স্বর্গে তোল, আর কখন্ কারে নরকে ফেল, টের পাওয়া ভার। এখন দেখতে পাচ্চি, না খেয়ে মরতে হবে। তোমার ব্যাম, তুমি পারবে না; আমারও রাঁধবার শক্তি নাই। এখন উপায়?"

প্রমদা কহিলেন, "সে জন্য তোমার ভাবনা কি? তোমার ত সময়ে আহার হ'লেই হয়!"

শ। আমার নিজের আহারের জন্য ভাবি না। ছেলেটা আর মেয়েটা আছে, তারা পাছে ঘরে চাল থাক্‌তে মারা যায়।

প্রমদা গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া উত্তর করিলেন, "পরকে দিয়ে কি কাজ চলে? কাল মাকে আনবো। আমি কষ্ট পাচ্চি শুনলে তিনি অবশ্যই আসবেন। তা হ'লেই তোমার ভাবনা চুকে গেল।"

প্রমদার কথা শুনিয়া শশিভূষণ যেন মুহূর্ত্তমধ্যে জড় পদার্থের ন্যায় হইলেন এবং কি বলিতেছেন, না টের পাইয়া কহিলেন, "কেনই বা বিধুকে পৃথক করিয়া দিলাম?" কারণ, প্রমদার মাকে আনা যে সহজ ব্যাপার নহে, শশিভূষণ ইতিপূর্ব্বেই তাহা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। প্রথমতঃ মা আসিবেন, পরে বৈকালে প্রমদার ভ্রাতা আসিবেন। তাঁহাকে কাজে কাজেই আসিতে হইবেক। তিনি বাটী থাকিলে তাঁহাকে কে রাঁধিয়া দিবে? পর-দিবস সূর্য্যদেব না উঠিতে উঠিতে প্রমদার মামা আসিবেন; তিনি একাকী নিৰ্জ্জন পুরীতে থাকিতে ভালবাসেন না। শশিভূষণ যেন নিমেষের মধ্যেই এ সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া কহিলেন, "কেনই বা বিধুকে পৃথক্ করিয়া দিলাম?"

প্রমদা কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "তুমি পৃথক্ করিয়া দিলে, তুমিই তার কারণ জান। আমি পৃথক্ ক'রে দিইনি, তার কারণও জানি নে।"

শশিভূষণ কিছু উত্তর করিলেন না। চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। প্রমদা বলিয়াছেন, মাকে আনিলে আর ভাবনা থাকিবেক না; সেই জন্যই বুঝি শশিভূষণ যত ভাবনা, অগ্রেই ভাবিয়া রাখিতেছিলেন।

প্রমদা শশিভূষণকে চিন্তায় মগ্ন দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "কেনই বা বিধুকে পৃথক করিয়া দিলাম? কেন দিয়াছিলে, তা তুমিই জান। আমার কি দোষ? আমি ত তখনই বলেছিলাম, আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। এখনও বল্‌ছি। দাও, আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। তোমরা একত্র হও। কত লোকে তাও ত হয়। একবার পৃথক্ হইলেই যে জন্মের মত পৃথক্ হয়, তাও ত নয়।"

প্রমদার কথা শুনিয়া শশিভূষণের চৈতন্য হইল। বুঝিতে পারিলেন, অপরাধ হইয়াছে। প্রকাশ্যে কহিলেন, "আমি ত আর কিছু বলি নি, কেবল—"

প্র। কেবল কি? আমি তোমার ও বাঁকা-চুরা কথা বুঝিতে পারি না। যা বলবার হয়, একেবারে ব'লে ফ্যালো। আমি ব'কে মরি শুদ্ধ তোমারই ভালর জন্য বৈ ত নয়। আমার কি? আমি এখানে থাকলেও তুম চারটি না দিয়ে আর থাকতে পারবে না, সেখানে গেলেও তারা আমাকে ফেলে খেতে পারবে না।

বোধ হয়, বাপের বাড়ীর কথা লইয়া পূর্ব্বে কি হইয়া গিয়াছিল, প্রমদার তাহা স্মরণ ছিল না। সে কথা মনে থাকিলে আর বাপের বাড়ীর নাম করিতেন না; কিন্তু শশিভূষণ তাহা বিস্মৃত হন নাই। এ জন্য তিনি আর সে বিষয় সম্বন্ধে কিছু কহিলেন না। ক্ষণকাল উভয়েই নীরবে থাকিয়া শশিভূষণ জিজ্ঞাসা

করিলেন, "বিপিন কোথায় গেল ? কামিনীই বা কোথায় ?"

প্রমদা উত্তর করিলেন, "বিপিন তার মামার বাড়ী গিয়াছে। কামিনী ঐ শুয়ে আছে।"

শ। শুয়ে আছে ? রাত্রে কিছু খাবে না ?

প্র। কি খাবে ? কে রাঁধবে ?

শ। আর কেউ না রাঁধে, আমিই রাঁধবো। সব গোছান গাছান আছে ত ?

প্র। গোছান গাছান আর কি ? ও-বেলার সবই আছে, চারটি ভাত হ'লেই হয়।

প্রমদা কিঞ্চিৎ পরে "উঃ, আজ আমার অসুখটা কিছু বেড়েছে" এই বলিয়া শয়ন করিলেন। শশিভূষণ রান্নাঘরে গিয়া তত্রত্য দারগুগিরি কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

দস্তুরমত প্রমদার ভাত-থালাটি ঘরে আসিল। বারম্বার ডাকাডাকির পর প্রমদা মুখ বাঁকা করিয়া গিয়া আহার করিতে বসিলেন। শশিভূষণ মনে করিতে লাগিলেন, ইহাতেও যদি মন না পাই, তবে আর কিসে পাব ? এই ভাবিয়া তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। প্রমদার আহার হইল। অসুখ বাড়িয়াছে বলিয়া যে এক দানা কম খাইলেন, তাহা নয়। রোজই যে পরিমাণে খাইতেন, অদ্যও তাই খাইলেন। আহারের পর আচমন করিলেন। কিন্তু এতাবৎ একটিও কথা কহিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে শশিভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিপিনকে ত ব'লে দিলেই হ'ত, সে একেবারে তোমার মাকে ডেকে আনতো।"

এই কথা কহিয়া প্রত্যুত্তর প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। কিন্তু প্রমদা চিত্রিত পুত্তলীর ন্যায় অবাক্ হইয়া থাকিলেন, ফলতঃ বলিবারও কোন কথা ছিল না। মাকে আনিবার জন্যই বিপিনকে পাঠান হইয়াছিল।

শশিভূষণ ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া দুই একটা হাই ছাড়িতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে নাসিকাশব্দ করিয়া নিদ্রিত হইলেন। প্রমদাও শয়ন করিলেন। নিদ্রায় রজনী অতিবাহিত হইল।

প্রমদা বলিয়াছিলেন, "আমি কষ্ট পাইতেছি শুনিলে মা অবশ্যই আসবেন।" কার্য্যতঃ প্রমদার মাতা সে পর্য্যন্তও শুনিতে অপেক্ষা করিতেন না। যে প্রকারে হউক, একটা খবর পাইলেই যেখানে থাকুন, অমনি পাখীর ন্যায় উড়িয়া আসিতেন। বিপিনের নিকট যখন শুনিলেন, প্রমদা ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, তিনি তখনই আসিতেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র তৎকালে বাটী না থাকায় সে দিবস আসা রহিত করিলেন। কিন্তু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "কত ক্ষণে রাত পোহাবে" এবং পুত্রের অনুপস্থিত থাকার জন্য সে দিবস যাওয়া না হওয়ায় মনে মনে তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এমন সময় গদাধর আসিয়া বাটী উপস্থিত হইলেন। প্রমদার ভ্রাতার নাম গদাধর।

গদাধর কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, অন্নাভাবে কৃশকলেবর। মস্তকটি ক্ষুদ্র, নাসিকা

পর্য্যন্ত কেশে আবৃত গলাটি লম্বা, পা দুখানি কুলোর মত, লেখাপড়া সম্বন্ধে মা-সরস্বতীর বরপুত্র বলিলে হয়। প্রমদার মা সে জন্য বড় দুঃখিত। যখন তখন কহিতেন, "যারা লেখাপড়া শেখাবে, তারা ডেকেও জিজ্ঞাসা করে না, তবে আর কেমন ক'রে গদাধরের বিদ্যা উপার্জ্জন হবে।" প্রমদার মাতার বিবেচনায় গদাধরকে লেখাপড়া শেখান প্রমদার একটি অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম।

আর একটি কথা বলিলেই গদাধরের রূপ গুণের সমুদায় পরিচয় দেওয়া হয় অর্থাৎ তিনি "ত"-বর্গ উচ্চারণ করিতে পারিতেন না এবং তৎপরিবর্ত্তে "ট"-বর্গ প্রয়োগ করিতেন।

সন্ধ্যার পর বাটী আসিয়া বিপিনকে দেখিয়া কহিলেন, "কি বিপিন, টুমি কি মনে ক'রে ? কখন্ এলে ?"

বিপিন উত্তর না দিতেই গদাধরের মাতা কহিলেন, "তুমি এমন সময় কোথায় গিয়াছিলে, গদাধরচন্দ্র ?" প্রমদা ও প্রমদার মা উভয়েই গদাধরচন্দ্র বলিয়া ডাকিতেন, কখনই তাহার অন্যথা হইত না। পাড়ার লোকে কিন্তু "গদা" ছাড়া আর কিছুই বলিত না। "তুমি কোথায় গিয়াছিলে গদাধরচন্দ্র ? দেখ দেখি, বিপিন এসেছে—কি খাবে, কি হবে, তার কোন উদ্যোগ করলে না, লোকে কি ব'লবে বল দেখি ?"

গদাধর উত্তর করিলেন, "আমি কোটায় গিয়েছিলাম, টাটে টোমার কাজ কি ? আমি কাজে ছিলাম। বিপিনের খাবার ভাবনা কি, আমরা যা খাই, বিপিনও টাই খাবে। এ টো বিপিনের পরের বাড়ী নয়। বিপিন বিপিন, টামাক খেয়েছ ?"

বিপিন। আমি তামাক খাই নে।

গদা। টুমি খাও না, আমরা টো খাই। মা, একটু তামাক সাজ।

গদাধরচন্দ্র আদরের ছেলে। নিজ হাতে কখন তামাক সাজিয়া খান নাই। তাঁর মাতা খাইতে দিতেন না; তামাকের পিপাসা হইলে তিনি নিজে সাজিয়া দিতেন। গদাধরের মা তামাক সাজিতে আরম্ভ করিলে গদাধর ইত্যবকাশে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিপিন, টবে কি মনে ক'রে এসেছ ?"

বিপিন। দিদিমাকে নিতে এসেছি।

গদাধর সহাস্য বদনে কহিলেন, "মা শুনলি, টুই যে সে ডিন বোলছিলি, প্রমডার ডয়া মায়া নেই, কখন ডেকেও পাঠায় না আর খরচপত্র ডেয় না। এই ড্যাক্, ডেকে টো পাঠিয়েছে।"

বিপিনের সম্মুখে গদাধর এরূপ বলায় গদাধরের মা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—"গদাধরচন্দ্র, তোমার কি এ জন্মেও বুদ্ধি হবে না ? আমি কবে ও কথা ব'লেছিলাম ?"

গদাধর। আমার বুড্ডি নেই, টোমার টো আছে, টা হলেই আমার হবে। কিণ্টু তোমার মনে ঠাকে না, এই একটা ডোষ। সে ডিন টুমি এক কটা বোল্লে, আজ বলো না।—এই সময়ে গদাধরের মা তামাক সাজিয়া গদাধরকে হুঁকা দিলেন,

গদাধরচন্দ্র হুঁকা পাইয়া তাহাতেই মনোনিবেশ করিলেন, উপস্থিত কথা ভুলিয়া গেলেন। ক্ষণকাল তামাক টানিয়া মাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মা, একটা ডায় বেঁচে গেলাম, ডিডিভ্ভের বাড়ী গেলে আর একটু টামাকের জন্যে টোমার খোসামোড কর্‌টে হবে না।"

গদাধরের মা। গদাধরচন্দ্র, তোমার কি বুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে?

গদা। টবু ভাল, টুমি বোল্লে আমার বুড্ডি লোপ পেয়েছে। টবে আমার এককালে বুড্ডি ছিল। এট ডিন টো আমার বুড্ডি নেই বোলে টুমি মোরছিলে।

গদাধরের মাতা কহিলেন "হ্যাঁ, তোমার খুব বুদ্ধি আছে, এখন দেখ দেখি, জেলেপাড়ার চাট্টি মাছ পাওয়া যায় কি না। বিপিন এসেছে, ওকে চারটি খাওয়াতে হবে ত।"

গদা। কেন, ডিডি যে ডাল পাঠায়ে ডিয়েছিল, টা নেই?

গদাধরের মা সক্রোধে গদাধরের মুখের দিকে তাকাইলেন অর্থাৎ সে সব কথা বলিতে বারণ করিলেন। কিন্তু গদাধর ভয় পাইবার লোক নন। তিনি কহিলেন, "অমন চোক গরম ক'রে কাকে ভয় ড্যাকাও? আমি বুঝি জানিনে। সে ডিন ডাল এসেছিল, সে কি মিট্‌ঠে কঠা? সেই ডাল রাঁডো, এখন আমি রাত্রে কোন-খানে মাছ আণ্টে যেতে পার্‌বো না।"

গদাধরের মা সক্রোধে ভ্রূকুটি করিয়া "গদাধরচন্দ্র—"

গদা। কেন, গডাঢরচণ্ডকে কেন, এই টো গডাঢরচণ্ড্র আছে। টোমার ভয়ে পালাবে না। গডাঢরচণ্ড্র পালাবার ছেলে নন, কিণ্টু যদি বিরক্ত কর, টবে সব কঠা ব'লে ডেবে।

গদাধরের মা অনুপায় দেখিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। গদাধর তামাক খাইতে খাইতে বিপিনের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। এবং সেই কথোপকথনে আহারের সময় পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইল। আহারান্তে গদাধর ও বিপিন শয়ন করিলেন। গদাধরের জননী ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র গোছাইতে লাগিলেন এবং পর-দিবস গমনের জন্য বস্ত্রাদি নির্ব্বাচন করিলেন। সমস্ত গোছান হইলে তিনিও নিদ্রিতা হইলেন।

পর-দিবস প্রত্যুষে শশিভূষণ শয্যা হইতে উঠিয়াছেন, এমন সময়ে "ডিডি ডিডি" রবে গদাধরচন্দ্র দেখা দিলেন। তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গদাধরচন্দ্রের মাতা, সর্ব্বশেষ বিপিন। একে একে তিন জন গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। গদাধরকে দেখিয়া শশিভূষণের মনোমধ্যে যে ভাবের উদয় হইল, তাহা বর্ণিত অপেক্ষা সহজে অনুভূত হইতে পারে। আপাদমস্তক পর্য্যন্ত তাঁহার কলেবর ঈষৎ কম্পিত হইল। বোধ হয়, লঘু-পতনক, "দ্বিতীয়কৃতান্তমিব" ব্যাধকে দেখিয়া যত অনিষ্টের আশঙ্কা না করিয়াছিল, শশিভূষণ সহধর্ম্মিণীর প্রিয়তম ভ্রাতাকে দেখিয়া তদপেক্ষা অধিক ভীত হইলেন।

প্রমদা ব্যস্তসমস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিয়া জননী ও ভ্রাতাকে সমাদরে বসাইয়া

বাটীর সমাচার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। গদাধরচন্দ্র ক্ষণকাল বসিয়া বাটীর চতুর্দ্দিক্‌ পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গদাধরচন্দ্র যে বাটীতে থাকেন, সেখানে কোন দ্রব্য গোপন করিয়া রাখিবার জো নাই। তাঁহার চোখ তাহাতে পড়িবেই পড়িবে; বিশেষ যদি খাবার জিনিস হয়।

শশিভূষণ মনে মনে যার-পর-নাই বিরক্ত হইয়া কাছারি চলিয়া গেলেন। প্রমদা "ষোড়শোপচারে" আহারের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। প্রমদার জননী পাকশাক করিয়া উচিত সময়ে আহার করিলেন। বাটীর অন্যান্য সকলেরও আহার হইয়া গেল।

শশিভূষণ এই অবধি আপনার বাটীতে আপনি পরাধীনের ন্যায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। গদাধরচন্দ্রের মাতা বাটীর এক মাত্র কর্ত্রীস্বরূপ হইলেন। গদাধরচন্দ্র স্কুলে বিদ্যাভ্যাসের কারণ ভর্ত্তি হইলেন। প্রমদা পরম সমাদরে সকলকে আহারাদি করাইতে লাগিলেন; কি জানি, ত্রুটি হইলে পাছে লোকে নিন্দা করে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সরলার বিরহ, শ্যামার বিক্রম

কোন সুবিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়াছেন, মৃত্যুকালে যে মহাবিরহ ঘটিবেক, তাহাই মনে হয় বলিয়া আমাদের সামান্য বিরহে কষ্ট বোধ হয়। এ কথা সংগত বটে। নচেৎ দুঃখের ত কোন কারণই নাই। জানিতে পারিতেছি, আমার ভাই বন্ধু আজ বাটী হইতে যাইতেছে, আবার প্রয়োজন সমাপ্ত করিয়াই প্রত্যাগত হইবেক। কিন্তু তথাপি যে মন প্রবোধ মানে না, তাহার কারণ, সেই মহাবিরহের ভয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। যখন কেহ আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া যায়, তখনই যে আমরা মৃত্যুচিন্তা করিয়া থাকি এমন নহে; কিন্তু তাহা না করিলেও বিরহ-বেদনার যে সেই মূল কারণ, তাহা নিশ্চয়। তুমি কাহাকে পাঁচ টাকা দান করিলে তোমার কোন কষ্ট বোধ হয় না; তোমার দশ টাকা হারাইয়া গেলেও তোমার বিশেষ দুঃখ হয় না, কিন্তু বাজারে যদি চারি পয়সার জিনিস কিনিতে তোমার নিকট হইতে ঠকাইয়া ছ-পয়সা লয়, তাহাতে তোমার মর্ম্মান্তিক কষ্ট বোধ হয়। কেন? কারণ, তোমার মনে হয়, তোমা অপেক্ষা দোকানী অধিক চতুর, অধিক বুদ্ধিমান। লোকে নিজের ন্যূনতা স্বীকার করিতে চায় না। ঠকিয়া আসিলে নিজের ন্যূনতার স্পষ্টাক্ষরে পরিচয় দেওয়া হয়, এবং সেই জন্যই এত মনঃকষ্ট হয়। কিন্তু ঠকিয়া আসিলে কি কেহ এরূপ তর্ক করিয়া থাকে? ইহা হইতেই জানা যাইতেছে যে, আমাদের অনেক সময় অনেক ভাবের উদয় হয়, যদিও তত্তৎ সময় সে ভাবের কারণ আমরা সম্যক্‌রূপে টের পাই না, অথবা অনুসন্ধান করিয়া দেখি না।

বিধুভূষণ বাটী হইতে চলিয়া গেলে সরলার যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইতে লাগিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "কেনই বা যাইতে দিলাম! বাটী থাকিয়া যদি দু-জনে একত্রে উপবাস করিতাম, তাহাও এ যন্ত্রণা অপেক্ষা সহস্রগুণে ভাল ছিল।" আবার ভাবেন, "আমি কি স্বার্থপর! আমার জন্য তিনি কষ্ট পাইবেন, ইহাও আমার বাঞ্ছনীয় মনে হইতেছে? বিশেষ তাঁহাকে যদি অনাহারে থাকিতে হইত, তাহাও আমি কখনই দেখিতে পারিতাম না।" কবে বিধুভূষণ কি মিষ্ট কথাটি কহিয়াছেন, কবে অন্যান্য দিন অপেক্ষা একটু বেশী ভালবাসার চিহ্ন দেখাইয়াছেন, সরলার মনে তাহাই উদিত হইতে লাগিল। বিধুভূষণ এক এক দিন রাগ করিতেন বলিয়া সরলাব কত কষ্ট হইত, তিনি কাহারও সহিত বিবাদ করিয়াছেন শুনিলে সরলার কত দুঃখ বোধ হইত, সে সমস্ত কথা এক্ষণে তাঁহার মনে হইল না। তাঁহার কবে কি ব্যামোহ হইয়াছিল, সরলার তাহাও স্মরণ হইতে লাগিল। বিদেশে যদি সেইরূপ পীড়া হয়, তাহা হইলে কে তাঁহার শুশ্রূষা করিবেক? এই সমস্ত ভাবিয়া সরলা ছাতে বসিয়া অবিরত অশ্রুপাত করিতেছেন।

বিধুভূষণকে বাটীর মধ্য হইতে বিদায় দিয়া সরলা ছাতে গিয়া বসিয়াছিলেন। যত দূর দৃষ্টি চলে, তত দূরে অনিমিষ নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলেন। বিধুভূষণও দু-এক পা যান, আর ফিরিয়া ফিরিয়া ছাতের দিকে দৃষ্টি করেন। ক্ষণকাল এইরূপে গমন করিয়া এক অশ্বত্থ বৃক্ষ তাঁহাদিগের দৃষ্টি অবরোধ করিল। বিধুভূষণ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চক্ষু মুছিয়া ফেলিলেন। সরলা ঐ ছাতেই বসিয়া রহিলেন। একবার ইচ্ছা করিলেন, "দৌড়িয়া গিয়া এখনও ফিরাইয়া আনি, কিন্তু কি সুখভোগ করিতে আনিব? না, আমি নিজে অনাহারে মরি, তাহাও ভাল, তবু তাঁহাকে কষ্ট দেওয়া হইবে না। দিদি, দাসী হইয়া থাকিলে যদি মুখ না করিয়া চারটি চারটি খেতে দিত, আমি তাহাও হইতে পারিতাম।" সরলা এইরূপ ভাবিতেছেন। শ্যামা গৃহকর্ম্ম সমস্ত সমাপন করিয়া পাকশাকের আয়োজন করিয়া দিয়া সরলাকে ডাকিতে গেল। বেলা এক প্রহর হইয়াছে, তথাপি সরলার হুঁশ নাই। শ্যামা নিকটে গিয়া কহিল, "বলি ও ছোটগিন্নী, আর কারুর কি সোয়ামী নেই? না আর কেউ কখন বিদেশে যায় নাই?"

শ্যামার ডাক শুনিয়া সরলার চৈতন্য হইল। ত্রস্ত হইয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া শ্যামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্যামা, কি বল্‌ছো?"

শ্যামা। কি বল্‌বো? আজ কি আর গৃহস্থদের রান্নাবাড়া হবে না? না, তোমার খিদে নেই ব'লে আমরা সকলেই উপোস কর্‌বো?

সরলা। শ্যামা, আমার যথার্থই খিদে নেই, তুমি গিয়ে রেঁধে খাও, আমি আজ আর কিছুই খাব না।

শ্যামা। আমি খেলে ত আর গোপালের পেট ভর্‌বে না, সে যে পাঠশাল থেকে আস্‌ছে, এসে কি খাবে?

সরলা। এত বেলা হয়েছে?

শ্যামা। বেলা হবে কেন, তোমার জন্যে সূর্য্যিদেব ব'সে আছে ?

সরলা সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, যথার্থই অধিক বেলা হইয়াছে, তখন ব্যস্তসমস্ত হইয়া ছাত হইতে নামিয়া রান্না চড়াইয়া দিলেন। পাকশাক হইল। গোপাল খাইল, সরলার ভাতের কাছে বসা মাত্র। শ্যামা আবার বাসন, ঘর মুক্ত করিল।

সে দিন গেল, তার পরদিনও গেল। সরলার বিরহানল ক্রমে ক্রমে কম পড়িয়া আসিতে লাগিল। একেবারে যে নিশ্বাণ হইয়া গেল, তা নয়। কিন্তু সে পাবকের শিখা আর রহিল না। সময় কি চমৎকার চিকিৎসক। শোক তাপ যদি চিরকালই সমান থাকিত, তাহা হইলে মানবজীবন কি দুঃসহ দুঃখভার হইয়া পড়িত !

বিধুভূষণ ও শশিভূষণের পৃথক্ হইবার দিনকতক পরেই গদাধরচন্দ্রের দল আসিয়া উপস্থিত হয়। বিধুভূষণ যত দিন বাটীতে ছিলেন, গদাধরচন্দ্র অথবা তাঁহার জননী সরলার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই, কিম্বা তাঁহার প্রতি কোন অত্যাচার করিতেও সাহস পান নাই। প্রমদা মাঝে মাঝে বাক্যবাণ বর্ষণ করিতেন বটে, কিন্তু সরলা তাহা শুনিয়াও শুনিতেন না। কিন্তু এক্ষণে তিন জন একত্রে সাবেক বাকি সুদ সমেত আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এক দিবস প্রমদা বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া শ্যামাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও শ্যামা, বলি তোমাদের বাবুজী মহাশয় কোথায় গেলেন, কাপড় ধার করতে, না টাকা ধার করতে ? আজকাল যে বড় গানবাজনার কথা শুনতে পাই নে ?"

শ্যামা কহিল, "যদি বেঁচে থাক, আর পরমেশ্বর তোমার চোক কান বজায় রাখেন, তা হ'লে শুনতে পাবে।"

প্রমদা শ্যামার কথায় ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন, "কি বল্লি ?"

শ্যামা কহিল, "আজ মাসের ক'দিন, তাই জিজ্ঞাসা কল্লেম।"

প্রমদা। দেখ্‌লে, দেখ্‌লে মাগীর আক্কেলটা ? থাক্‌তো যদি বাড়ী, তা হ'লে এখনি মুখখান জুতো দিয়ে সোজা ক'রে দিতাম।

সরলা কহিলেন, "শ্যামা ক্ষান্ত দে, শ্যামা ক্ষান্ত দে। ও'র মনে যা আসে, উনি তাই বলুন না, তোর ত গা ক্ষয়ে যাবে না।"

শ্যামা কহিল, "কেন ক্ষান্ত দেব ! উনি কোথাকার কে !" উচ্চৈঃস্বরে প্রমদাকে সম্বোধন করিয়া "কথায় কথায় জুতো মার্‌বে বলো। এস, মার না ? আমারও হাতে আছে।"

প্রমদা রাগে আর অধিক কথা কহিতে পারিলেন না। "থাক্ থাক্, আসুক আগে বাড়ী, তখন তোব কত প্রতাপ দেখাবো।"

শ্যামা। কত লোকে দেখাইয়াছে, এখন বাকি আছ তুমি। এস না, এখনি দেখাও না ? আর তার বাড়ী আস্‌বার দরকার কি ?

প্রমদা কথা না কহিয়া গৃহমধ্যে গিয়া বসিলেন। রাগে কর্ণের অগ্র পর্য্যন্ত রক্তিমাবর্ণ হইয়াছে, ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে। হস্ত পদ

সর্ব্বদা নাড়ার দরুন অলংকারের শব্দ হইতেছে। প্রমদার মাতা দেখিয়া শুনিয়া একবারে অবাক্ হইয়া রহিলেন। প্রমদার মাতা সম্মুখ-সমরে সাহায্য করিতেন। কিন্তু শ্যামার বিক্রম দেখিয়া তাঁহার ভরসা হইল না। তিনি এক্ষণে তনয়ার নিকটে বলিতে লাগিলেন—"মা, স্থির হও, স্থির হও। শিখান না থাকলে কি ছোটলোকের মুখে এ সব কথা বেরোয়, তলে তলে টিপ্‌নি আছে, তা ত তুমি টের পাও না। আজ বাড়ী এলে সব ব'লে দিও। দেখ তিনি কি বলেন। বাপুরে বাপু, আমার ত আর এ বাড়ী তিলার্দ্ধ থাকতে ইচ্ছা করে না। কবে আমাকেই কি ব'লে বসে?"

প্রমদার মাতার কথা শেষ না হইতে হইতেই গদাধরচন্দ্র কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রমদাকে রাগত দেখিয়া ও জননীর মুখে উল্লিখিত কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডিডি—কি হয়েছে?" ডিডি কথা কহিলেন না। গদাধর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডিডি, কি হয়েছে?"

প্রমদা উত্তর করিলেন, "যা যা, এখন ঐ দিকে যা, কোথাকার গণ্ডমুর্খটা, তোর যদি বুদ্ধি সাধ্যি থাকতো, তা হ'লে তোর অদৃষ্টে এত দুঃখ হবে কেন?"

গদাধরচন্দ্র অজ্ঞান! তার কপালে কি দুঃখ? তার বিশ্বাস, ক্রমেই তার সুখ বৃদ্ধি হচ্ছে। দিদির বাটী এসে পর্য্যন্ত ত আহার-আদি ভালই হচ্ছে, তবে আবার অসুখ কি? এই ভাবিয়া গদাধর ব্যাকুবের মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিতে লাগিলেন।

গদাধরের মা সমুদায় কহিলেন। গদাধর শুনিয়া কম্পমান হইয়া কহিলেন, "চল্লাম আমি, ডেখি ও মাগীর কট প্রটাপ!"

এই বলিয়া লাঠি হাতে করিয়া গদাধর সরলার ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন; "আয় বেটী আয়, ডেখি টোর কট জোর, আর কার প্রটাপে টুই লড়িস্!"

প্রমদা নিষেধ করিলেন না। গদাধরের মাও না। তাঁহারা ভাবিলেন, যদি দু ঘা এক ঘা দিতে পারে, ভালই।

সরলা গদাধরের আস্ফালন শুনিয়া দ্বার রুদ্ধ করিতে গেলেন, শ্যামা কোন মতেই দরজা বন্ধ করিতে দিল না। গৃহের কোণ হইতে তরকারি কোটা একখানা বঁটি হস্তে লইয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া কহিল, "কোথায় সে ন্যাজকাটা বামুন? আয় আজ তোর নাক কান না কেটে যদি আমি জল খাই, তবে আমার নাম শ্যামাই নয়!"

বঁটির চোকাল ধার দেখিয়া গদাধরের আর ভরসা হইল না। দূর হইতে কহিলেন, "টুই আমাকে কাট্‌বি, এই চল্লাম আমি ঠানায়? ডারগা বক্‌শী ডেকে আনি।"

শ্যামা। যা তুই যেখানে ইচ্ছা সেইখানে। গিয়ে যা করতে পারিস্ তা করিস্।

থানা সেই গ্রামেই। গদাধরের থানার এক কনষ্টেবলের সহিত আলাপ ছিল।

গদাধরের বিশ্বাস ছিল, তিনি গেলেই আর কেউ আসে না-আসে, সেই কনষ্টেবল ত আস্‌বেই, তা হ'লেই শ্যামা জব্দ হবে। দৌড়িয়া থানায় গেলেন। দেখিলেন—দারোগা কি বলিয়া দিতেছেন, আর তাঁহার আলাপী কনষ্টেবল তাই লিখিয়া লইতেছে। গদাধর গিয়া কহিলেন, "ডারগা মহাশয়, ডারগা মহাশয়, শ্যামা আমার নাক কান কাট্‌টে চায় ?"

দারোগা কহিল, "তুমিই বা কে, আর শ্যামাই বা কে ?"

গদাধর। আমি শশী বাবুর শালা।

দারোগা। তোমার বাপের নাম কি ?

গদাধর। টা বল্লে চিণ্টে পারবে না। শ্যামা ডাসী আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে আমার নাক কান কেটে ডিটে চায়।

দারোগা কনষ্টেবলের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "রমেশ, একে তুমি চেন ?"—কনষ্টেবলের নাম রমেশ।

রমেশ গদাধরের কুল, শীল, বিদ্যা, বুদ্ধির পরিচয় দিল। দারোগা শুনিয়া কহিলেন, "ভাল, তোমার মকদ্দমা কচ্ছি, এত বড় অন্যায়—তোমার নাক কান কাট্‌তে চায়।"

গদাধর। অন্যায় না, বড় অন্যায়। আপনি এর একটা সুবিচার করুন।

দারোগা কহিলেন, "আচ্ছা তা কর্‌ছি। কিন্তু তোমার নাক কান কেটেছে, না শুধু ব'লেছে কাট্‌বো।"

গদাধর হঠাৎ কানে হাত দিলেন। দারোগা কহিলেন, "হাঁ, আগে ভাল ক'রে দেখ; দাবি প্রমাণ করা চাই।"

গদাধর কহিলেন, "কাটে নাই, কিণ্টু ব'লেছে কাট্‌বো।"

দারোগা। একটা স্ত্রীলোক ব'লেছে তোমার নাক কান কাট্‌বে, তাই তুমি দৌড়ে থানায় এসেছ ? তোমার লজ্জা করে না ?

গদাধর। সে টেমনি ষ্ট্রীলোক বটে। সে টো ষ্ট্রীলোক নয়, সে ষ্ট্রীলোকের বাবা। যে বঁটি টুলেছিল, যডি ডেখ্‌টে, টবে বাপ বাপ্‌ বাপ্‌ ক'রে টুমিও পালাটে।

দারোগা। সত্তি না কি ? তবে ত তাকে জব্দ করা উচিত। তুমি এক কাজ কর। ফিরে যাও, গিয়ে ঝগড়া কর। তোমার কান কেটে দিক আগে, নৈলে ত মকদ্দমা হবে না ?

গদাধর। আগে যডি কান কেটে ডেবে, টবে আমি কি ল'য়ে নালিস কর্‌বো ?

দারোগা। কেন, এক কান নিয়ে ?

গদাধর বুঝিতে পারিল, দারোগা ঠাট্টা করিতেছেন। তখন রাগত হইয়া কহিল, "আচ্ছা, টুমি আমার মকড্ডমা না কর, আমি জেলায় যাব।"

দারোগা কহিলেন, "সেই ভাল। এ সব বড় মকদ্দমা এখানে হয় না।"

গদাধর উঠিয়া যাইতেছেন। দারোগা কনষ্টেবলকে কহিলেন, "একটু মজা কর্‌বো দেখ্‌বে?"

কনষ্টেবল কহিল, "কি মজা?"

দারোগা অন্য একজন কনষ্টেবলকে কহিলেন, "হরি সিং, এই লোকটিকে গারদে দাও ত। ও মিথ্যা এজেহার দিতে এসেছে।"

হরি সিং আজ্ঞা প্রাপ্ত মাত্র গদাধরের হস্ত ধারণ করিয়া গারদে লইয়া গেল। গদাধর রাগত হইয়া বলিলেন, "টোমরা টের পাও নাই আমি কে? ঠাক, টোমাডের মজা ড্যাকাবো; আমি শশী বাবুর শালা, টা টোমরা জান? আমাকে গারড়ে ডেওয়া সোজা কঠা নয়।"

কনষ্টেবল কহিল, "তুমি ঠাকুর যা কর্‌তে পার, ক'রো। আমার কি? আমি ত হুকুম মেনেছি। মোদ্দা তুমি আর বেশী কথা কইও না। দারোগা বাবু বললেন, বেশী কথা কইলে হাতকড়া লাগাতে হবে।"

শুনিয়া গদাধরের ভয় হইল, না জানি আবার হাতকড়া কি। তখন কনষ্টেবলের পায় পড়িতে লাগিল। "হরি সিং, টোমার পায় পড়ি, আমাকে ছেড়ে ডেও।"

হরি সিং কহিল, "আমার ছেড়ে দেবার কি ক্ষমতা?"

গদাধর। টবে একবার রমেশ বাবুকে ডেকে ডেও।

কনষ্টেবল ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "রমেশ বাবু আস্‌তে পারে না।"

গদাধর। "আমি রমেশ বাবুর এটো কল্লাম, আর রমেশ বাবু আমার সঙ্গে একবার ডেকা কর্‌লেন না।" গদাধর এই প্রকার ক্রমাগত কখন খোশামোদ, কখন রাগ প্রদর্শন করিয়া পরে সন্ধ্যাবেলা উচ্চৈঃস্বরে রোদন আরম্ভ করিল। তখন দারোগা গারদে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, তুমি আর মিথ্যা মকর্দ্দমা কর্‌বে?"

গদাধর। না।

"স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঝগড়া কর্‌বে?"

গদাধর। না।

"তিন হাত মেপে নাকখত দাও, তবে যেতে পাবে।'

গদাধর নাকে খত দিয়া প্রস্থান করিলেন।

গদাধরচন্দ্র থানায় গেলে ক্ষণকাল পরে শশিভূষণ বাটী আসিলেন। অন্যান্য দিন অপেক্ষা সে দিন সকালে কাছারি বন্ধ হইয়াছিল। বাটী আসিয়া প্রমদাকে রাগত দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রমদা আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বলিলেন, কেবল প্রথমতঃ তিনিই যে ঠাট্টা করিয়াছিলেন, সেইটুকু বাদ দিলেন। শশিভূষণ শুনিয়া প্রথমতঃ চটিয়া উঠিলেন। সুযোগ বুঝিয়া প্রমদার মাতাও আবার এই সময়ে দুই একটি টিপ্পনী করিলেন। কিন্তু শশিভূষণ রাগ করিয়া শ্যামার কি করিবেন? তাহাকে ধরিয়া মারিতেও পারিবেন না, কিম্বা এই কথা লইয়া মকর্দ্দমাও করিতে পারেন না। সাত পাঁচ ভাবিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

হিসাব পাস

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শশিভূষণের বুদ্ধি বিলক্ষণ প্রখর ছিল। সেই বুদ্ধিই শশিভূষণের উত্তরোত্তর উন্নতির মূল। প্রথমতঃ পাঁচ টাকা বেতনে প্রবেশ করেন, কিন্তু এক্ষণে পঁচিশ টাকা হইয়াছে। তাঁহার উপরে এক মাত্র দেওয়ানজী আছেন। পরম্পরায় শুনা যাইতেছে, দেওয়ানজীও বুঝি বেশী দিন আর না টেকেন। শশিভূষণের বুদ্ধি দর্শন করিয়া বাবু যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় শশিভূষণকে দেওয়ানী কার্য্যের ভার দিলে তাঁহার আর নিজে কিছু না দেখিলেও চলিবে। হিসেব কিতেব দেখা কি ঝঞ্ঝাটের কাজ? বাবু একবিন্দু বিশ্রাম পান না, আমোদ-প্রমোদ করা ত দূরে থাকুক; ভাবিয়া পান না—তাঁহার পিতা পিতামহ প্রভৃতি কি প্রকারে এ সমস্ত কার্য্য করিবার অবকাশ পাইতেন। বিশেষ তাঁহাদের সময়ে ত দুই তিনটি বৈ আমলা ছিল না। বাবু স্থির করিলেন, "সেকেলে" লোকে খুব পরিশ্রম করিতে পারিত, তাঁহাদের বুদ্ধি তাদৃশ সূক্ষ্ম ছিল না। যাদের বুদ্ধি অধিক, তাহারা অধিক কায়িক পরিশ্রম করিতে পারে না। পরমেশ্বরের নিয়মই এই।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, লোকে পরস্পরের ঐশ্বর্য্যেই হিংসা করে, বুদ্ধি বিদ্যার হিংসা করিতে দেখা যায় না। আমা অপেক্ষা এর জমি বেশী, ওর টাকা বেশী, অনেকেই বলে। কিন্তু কে কোথায় কাহাকে বলিতে শুনিয়াছে, "আমা অপেক্ষা অমুকের বুদ্ধি বেশী?" বুদ্ধি থাকিলে ধন হয়, জমি হয়, জমিদারী হয়, কিন্তু তথাপি অমুকের মতন আমার বুদ্ধি হউক—এ কথা কেহই বলে না।

বাবুর পিতা পিতামহেরা এক সন্ধ্যা আতপান্ন আহার করিয়া কৃশকায়ে যাহা করিতেন, বাবু তিন বেলা মৎস্য মাংস ও প্রয়োজন-মত বলকারক "আরক" সেবন করিয়াও তাহা করিতে পারেন না। তাঁহার বুদ্ধি কম? তা নয়। তবে কি না "সেকেলে" লোকের বরদাস্ত হইত। বাবুর তত দূর সহ্যগুণও নাই, আর তত দূর শারীরিক বলও নাই।

শশিভূষণের বুদ্ধি আছে, বল আছে, সহিষ্ণুতা আছে এবং মিষ্ট কথায় মনের তুষ্টি সম্পাদন করার শক্তিও আছে। তিনি ক্রমে ক্রমে উচ্চপদাভিষিক্ত হইবেন, তাহার বিচিত্র কি?

শশিভূষণের অধীনে এক্ষণে সাত আট জন আমলা। সকলেই বিশ্বাসী। শশিভূষণ সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসী। তিনি যাহা দেখিয়া দিবেন, তাহাতে "ভুলচুক" থাকিবার জো নাই। সমস্ত খরচ তাঁহারই হাতে।

শশিভূষণ হিসাবের কতকগুলি কাগজ হস্তে লইয়া বাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "বাবু, শিবমন্দির ও শিবপ্রতিষ্ঠার খরচের হিসাব প্রস্তুত হয়েছে দেখুন।"

বাবু (বন্ধুগণ-পরিবেষ্টিত)। তুমি ভাল ক'রে দেখেছ ? কোন ভুলচুক নাই ত ?

শশী। আমি ত কিছুই টের পেলাম না। আমার যত দূর বিদ্যা, তার মধ্যে এক পয়সাও তফাৎ দেখতে পাচ্ছি না। আপনি না দেখলে ভুলচুক আছে কি না, কি প্রকারে বলবো।

বাবু মহা সন্তুষ্ট! শশিভূষণের অপেক্ষা এ সব কর্ম্ম বেশী বোঝেন। শশিভূষণ তাহা নিজেই স্বীকার করেন। কহিলেন, "তবে আর আমি কি দেখবো, তুমি দেখেছ, তা হ'লেই হ'ল।"

শশিভূষণ তাঁহার অধীনস্থ একজন কর্ম্মচারীর সমভিব্যাহারে হিসাব পাস করিতে গিয়াছিলেন। বাবুর কথা শুনিয়া পরস্পর একবার চোখাচোখি করিলেন। তাঁবেদার কর্ম্মচারী ঈষৎ হাস্য করিলেন। কিন্তু সে হাসি শশিভূষণ টের পাইলেন, আর কাহারও টের পাইবার জো নাই ; শশিভূষণ ঈষৎ চক্ষু গরম করিলেন, যেন সে স্থানে, সে সময়ে সে হাসিটুকুও হাসা ভাল হয় নাই। তাঁবেদার মৃত্তিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন।

বাবুর একজন বন্ধু ইংরাজীতে কহিলেন, "কাজ হইয়া গেল, এক্ষণে ইহাদিগকে বিদায় করিবার আপত্তি কি ?"

বাবু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "আর কোন কাজ উপস্থিত আছে ?"

শশী। আজ্ঞা না। আপাততঃ ত কিছু দেখ্‌ছি না। হস্তস্থিত কাগজগুলোকে একবার নাড়িয়া "এটায় মোট কত খরচ হ'ল, একবার দেখলে ভাল হ'ত না।"

বাবু শশিভূষণের কাগজ নাড়া দেখিয়া ভাবিলেন, একবার আরম্ভ করিলে ত সহজে শেষ হয়, তাহার সম্ভব নাই। বিশেষ ছিপি খোলা বোতলটা তক্তাপোশের নীচে রহিয়াছে। তাহা হইতে কত উড়ে যাইতেছে। গেলাসে যেটুকু ঢালা আছে, সে ত একেবারেই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। প্রকাশে কহিলেন, "কত হয়েছে বল।"

শশী। চব্বিশ হাজারের ইষ্টিমিট ছিল, কিন্তু একত্রিশ হাজার তিন শত তের টাকা খরচ হয়েছে।

কথাগুলি কহিয়া শশিভূষণের ওষ্ঠাধর যেন ঈষৎ কম্পিত হইল।

বাবুও যেন একটু আশ্চর্য্য হইলেন। কিন্তু বয়স্যগণের মধ্যে এই ক'টি টাকার জন্য সমুদায় হিসাব দেখা কিছু অপমানের কথা বিবেচনা করিয়া কিছু বলিলেন না। এক জন বয়স্য ইংরাজীতে কহিলেন, "ইষ্টিমেটের চাইতে প্রকৃত খরচ ত চিরকাল বেশী হয়ে থাকে।" বাবু কতক অভিমানের ভয়ে, কতক বন্ধুর কথায় শশিভূষণের হস্ত হইতে কাগজগুলি লইয়া ইংরাজীতে নাম সই করিয়া দিলেন। হিসাব পাস হইল।

হিসাব স্বাক্ষরিত হইলে শশিভূষণ কাগজগুলি লইয়া কাছারি আসিলেন।

এ দিকে তক্তাপোশের নিম্ন হইতে গেলাস ও বোতল উপরে উঠিলেন। বাবুরা আমোদে আসক্ত হইলেন। শশিভূষণ অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের সহিত বাটীতে পোঁছিয়া লাভ বণ্টন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

শশিভুষণ পুরাতন বাড়ীটা কি করিবেন ?

প্রমদার মাতা ও ভ্রাতার আগমন এবং শশিভূষণের দেওয়ান হওয়া অবধি শশিভূষণের বাটীতে থাকিবার অত্যন্ত অসুবিধা হইল। বাটীতে স্থান অল্প। বৈঠকখানা অর্দ্ধেক হইতে হইতেই বন্ধ রহিয়াছে। শশিভূষণ ভাবিলেন, আর অল্প খরচ করিলেই বৈঠকখানাটি প্রস্তুত হয়। অতএব তাহাই করা উচিত। কিন্তু প্রমদা এ পরামর্শে অনুমোদন করিলেন না। ঘরটি প্রস্তুত হইলে বিধুভূষণকে কালে তাহার অংশ দিতে হইবেক, ইহা অপেক্ষা অন্যায় কথা আর কি হইতে পারে ? শশিভূষণের প্রমদার কথা লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য হইল না। সুতরাং অন্য একটি স্থান ক্রয় করিয়া শশিভূষণকে বৈঠকখানা প্রস্তুত করিতে বাধ্য হইতে হইল। কিন্তু স্থান ক্রয় করিবার সময় এই এক প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল—"কাহার নামে কেনা যায় ?" শশিভূষণের নিজ নামে ত হইতেই পারে না। কারণ, তাহা হইলে পাছে বিধুভূষণ মকদ্দমা করিয়া তাহার অংশ লয়। সেই কারণ প্রযুক্ত প্রমদার নামেও হইল না। পরিশেষে সাত পাঁচ ভাবিয়া গদাধরচন্দ্রের নামে স্থান খরিদ করা হইল। গদাধরের ইহাতে আহ্লাদের সীমা রহিল না।

প্রথমতঃ বৈঠকখানাই প্রস্তুত করিবার কথা, কিন্তু ক্রমে ক্রমে একটি সুন্দর বাটী হইল। শশিভূষণ সপরিবারে সেই নূতন বাটীতে উঠিয়া গেলেন। সরলা, গোপাল ও শ্যামা সেই পুরাতন বাটীতে রহিলেন। এখন পুরাতন বাটীতে যে অংশ আছে, তাহা কি করিবেন, শশিভূষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। পল্লীগ্রামে বাটী ভাড়া হইবার সম্ভব নাই। শূন্য ফেলিয়া রাখিলেও ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়। শশিভূষণ প্রমদাকে ডাকিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রমদা একটু মিষ্ট হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আগে তুমি কি মনে করেছ বলো, তার পর আমার মনের কথা ব'ল্‌বো।"

শশী। না, আগে তুমি বলো।

প্রমদা এবার একটু মন কেড়ে লওয়া-গোছের হাসি হাসিয়া শশিভূষণের নিকট গিয়া বসিলেন এবং সেইরূপ হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "তুমি না বল্‌লে আমি বল্‌বো না।"

শশী। আমি মনে করেছি, ও-বাড়ীটা সমুদায়ই বিধুকে দিব।—এই সময়ে প্রমদার মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন, মুখচন্দ্রিমা মেঘাচ্ছন্ন, অমনি পুনরায় কহিলেন, "এই মনে করেছি, কিন্তু তোমাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে কি আমি কোন

কাজ করতে পারি ? এখন তোমার বিবেচনায় কি হয় বলো।”

প্রমদা। আমার বিবেচনা নিয়ে তুমি কি করবে। তোমার বাড়ী, তোমার যা খুশী তাই করো।

শশীভূষণ কথার ভাব বুঝিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন। ব্যস্তসমস্ত হইয়া কহিলেন, “আচ্ছা, আজ এ কথা এই পর্য্যন্তই থাক, আর এক দিন হবে। দু-দিন থাক্‌লে বাড়ীটে আর পচে যাবে না।”

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

নীলকমল কর্ত্তৃক অদৃষ্টের ফলাফল বর্ণনা

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে, আমরা বিধুভূষণ ও নীলকমলকে এক মুদীর দোকানে রাখিয়া অন্যান্য বিষয় বর্ণনা করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহারা সে রাত্রি সেই মুদীর দোকানেই ছিলেন, তাহাও জানেন। পরদিবস প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া মুদীর দোকান হইতে পুনরায় কলিকাতার পথে চলিলেন। ক্ষণকাল গমন করিয়া উভয়ে এক বৃক্ষমূলে শ্রান্তি দূর করিবার মানসে উপবেশন করিলেন। পূর্ব্বদিবস নীলকমল ক্রমাগতই গান করিয়াছিল। অদ্য নীলকমলের মুখে কথা নাই। যে সর্ব্বদা বকে, তাহাকে চিন্তাকুল দেখিলে তাহার সমভিব্যাহারী লোকের মনে এক প্রকার কষ্ট অনুভূত হয়। বোধ হয় তাহা সকলেই জানেন। বিধুভূষণের মনেও কষ্ট হইতেছিল। কিন্তু কথা কহিতে গেলেই পাছে নীলকমল গান ধরে, এই ভয়ে এত ক্ষণ কথা কন নাই ; বৃক্ষমূলে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, “নীলকমল কি ভাব্‌ছ ?”

নীলকমল কথা কহিল না।

বিধু ক্ষণকাল চুপ করিয়া পরে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘নীলকমল কি ভাব্‌ছ ?”

নীলকমল কথার জবাব না দিয়া একটু পরে জিজ্ঞাসা করিল, “দাদাঠাকুর, (নীলকমল এই অবধি বিধুভূষণকে দাদাঠাকুর বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল) যে সাহেবেরা খ্রীষ্টান করেন, তারা যা বলে, সব কি সত্যি ?”

বিধুভূষণ কহিলেন, “কি বলে তা না শুনলে কেমন ক'রে বলবো ?”

“এই যে তারা বলে, খ্রীষ্টান হ'লে মেম দেবে, তা কি যথার্থই দেয় ?”

বিধু হাসিয়া উত্তর করিলেন, “কেন ? যদি দেয়, তা হ'লে তুমি খ্রীষ্টান হবে না কি ?”

নীলকমল কহিল, “হ'তে ত ইচ্ছা করে, কিন্তু জাত যাবে যে ? আচ্ছা, বেহ্মজ্ঞানী হ'লে কি তারা বিয়ে দিয়ে দেয় ?”

বিধু কহিলেন, “তা ত আমি বল্‌তে পারি নে।”

নীল। বেহ্মজ্ঞানী হ'লে জাত যায় না, তাই আমার ইচ্ছা করে বেহ্মজ্ঞানী হই। কিন্তু যদি পাদরি সাহেবেরা মেম দেয়, তা হ'লে খ্রীষ্টানই হই। বাঙ্গালি বে করার চাইতে মেম বে করা ভাল। কেমন দাদাঠাকুর, ভাল নয় ?

বিধু। সে যার যেমন ইচ্ছা। তুমি যে মেম বে করবে, তাকে খেতে দেবে কি, আর পরাবেই বা কি ?

নীল। সেই ত ভাবনা। আমি তাই ভাবছিলাম। যাই, বিদেশে ত যাচ্ছি, কিছু না কিছু অদৃষ্টে জুটে যাবেই।

বিধু। তার আর সন্দেহ কি ?

উভয়ে পুনরায় বৃক্ষমূল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া রাস্তায় চলিতে লাগিলেন। নীলকমল তথাপি পূর্ব্বদিবসের ন্যায় কথা কহে না। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পরে কহিল, "দাদাঠাকুর, যার যা কপালে থাকে, কেউ খণ্ডন করতে পারে না। আমি তার এক গল্প জানি। আমারও যদি কপালে লেখা থাকে মেমের সঙ্গে বে হবে, তা হবেই হবে।"

বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গল্প বলো দেখি ?"

নীলকমল নিম্নলিখিত গল্পটি বর্ণনা করিল।

এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিত। তাহার স্ত্রী ও পুত্র ছিল। এক দিবস রাত্রে ব্রাহ্মণ সপরিবারে শয়ন করিয়া আছে, এমন সময়ে ঘরের আড়কাটা হইতে একগাছি রজ্জু ঝুলিতেছে দেখিতে পাইল। ব্রাহ্মণ পাশ ফিরিয়া নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু নিদ্রা হইল না, পরে হঠাৎ সেই রজ্জুগাছ তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। এবার পূর্ব্বাপেক্ষা একটু লম্বা বোধ হইল। ব্রাহ্মণ ভাবিল, ইঁদুরে দড়িগাছা ফেলিয়া দিতেছে। ক্ষণকাল মধ্যে দড়িগাছ একটি সাপের ন্যায় হইল। ব্রাহ্মণ স্ত্রীকে ডাকিবে, কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই সাপ নামিয়া তাহার স্ত্রীকে ও পুত্রকে দংশন করিল। ব্রাহ্মণ দেখিয়া ভীত ও বিস্মিত হইল। তাহার স্ত্রী ও পুত্র অবিলম্বেই প্রাণত্যাগ করিল। সাপটিও গৃহদ্বারে একটি রন্ধ্র দিয়া বাহির হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ সাপের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ভোর হইলে সাপ ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিয়া এক কৃষকের প্রাণবধ করিল; এবং একটু পরে এক বৃষ হইয়া একটি বালককে নষ্ট করিল। ব্রাহ্মণ এখনও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আছে। ক্ষণকাল পরে সেই বৃষ একটি বৃদ্ধ মানুষের আকার ধারণ করিল। তখন ব্রাহ্মণ তাহার পদতলে পতিত হইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। বৃদ্ধ প্রথমতঃ পরিচয় দিতে অস্বীকার করিল; কিন্তু ব্রাহ্মণের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া কহিল, "আমি কর্ম্মসূত্র। অর্থাৎ যাহার যেরূপে মৃত্যু হইবে অদৃষ্টে লেখা থাকে, আমি সেইরূপে তাহার প্রাণ সংহার করি।" ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কিসে মরিব বলিয়া দিন।" বৃদ্ধ কহিল, "পাগল ! সে কথা বলিতে নাই।" কিন্তু ব্রাহ্মণ কোন মতেই তাহার পা ছাড়িবে না, অগত্যা বৃদ্ধ কহিল, "তোমাকে গঙ্গায় কুমীরে মারিবে।"

ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া পুনরায় আর বাটী না গিয়া পূর্ব্বমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিল ; অর্থাৎ যে-দেশে গঙ্গা নাই। দিনকতক গমনের পর এক রাজার রাজ্য ত্যাগ করিয়া আর এক রাজার রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিল। তথায় এক বাটীতে বাসা করিয়া রহিল।

ব্রাহ্মণ যে রাজ্যে গমন করিল, তথাকার রাজার সন্তানাদি হয় নাই। ব্রাহ্মণ শুনিয়া রাজার নিকটে গিয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ, আমি এক স্বস্ত্যয়ন জানি, করিলে আপনার সন্তান হইবে।" রাজা তচ্ছ্রবণে ব্রাহ্মণকে স্বস্ত্যয়ন করিতে অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণ স্বস্ত্যয়ন করিলে মহারাজের এক বৎসরের মধ্যে একটি পুত্র জন্মিল।

রাজা ব্রাহ্মণকে নিজ বাটী রাখিলেন। এবং রাজপুত্র বড় হইলে ব্রাহ্মণকে তদীয় শিক্ষাকার্য্যে নিয়োগ করিলেন। রাজপুত্র ক্রমে ক্রমে সমস্ত অধ্যয়ন করিয়া দেশ ভ্রমণে যাইবেন। রাজা ব্রাহ্মণকে সমভিব্যাহারে যাইতে কহিলেন। ব্রাহ্মণ কহিল, "আমি সর্ব্বস্থানে যাইতে পারিব, গঙ্গাতীরে যাইব না।" রাজা কারণ জিজ্ঞাসা করায় ব্রাহ্মণ আত্মবৃত্তান্ত সমুদায় পরিচয় দিল। রাজা হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, তোমাকে গঙ্গাতীরে যাইতে হইবেক না।" রাজপুত্র ব্রাহ্মণের সমভিব্যাহারে নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া গঙ্গাতীরে যাইবার মানস প্রকাশ করিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার সহিত যাইতে অস্বীকার করিল। কিন্তু রাজপুত্র কহিলেন, "আপনাকে ত আর রাস্তা হইতে কুমীরে লইয়া যাইবে না? তবে যাইতে ভয় কি?" ব্রাহ্মণ অগত্যা সম্মত হইল।

যোগের সময় রাজপুত্র গঙ্গাস্নানে যাইবেন, এ জন্য ব্রাহ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কহিলেন, "আপনি তীরে থাকিয়া মন্ত্র পড়াইবেন, তাহাতে ভয় কি?" ব্রাহ্মণকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজকুমারের সহিত গমন করিতে হইল। গঙ্গাতীরে সহস্র সহস্র লোক স্নান করিতেছে দেখিয়া তাঁহার সাহস হইল। রাজপুত্র স্নান করিবার জন্য জলে নামিলেন ; ব্রাহ্মণ তীরে থাকিয়া মন্ত্র পড়াইতে লাগিল। কিন্তু লোকের কোলাহলে রাজপুত্র শুনিতে না পাইয়া কহিলেন, "আমার লোকে চতুষ্পার্শ্বে ঘিরিয়া দাঁড়াইবে, আপনি মধ্য-স্থলে থাকিয়া মন্ত্র পড়ান।" বলিবা মাত্র রাজপুত্রের লোকে তাঁহাকে বেষ্টন করিল এবং ব্রাহ্মণও সেই বেষ্টনের মধ্যে গিয়া মন্ত্র পড়াইতে লাগিল। মন্ত্র সমাপন হইলে রাজপুত্র ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "মহাশয়, আমি সেই কর্ম্মসূত্র।" এই বলিতে বলিতে কুম্ভীরের রূপ ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণকে লইয়া সলম্ফে গভীর জলে চলিয়া গেল।

বিধুভূষণ নীলকমলের গল্প শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন, এবং কিঞ্চিৎ চিন্তাকুলও হইলেন। ক্ষণকাল পরে উভয়ে এক রাস্তার ধারে দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

নীলকমল দোকানে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দোকানী ভাই,

এখানে দু-জন ব্রহ্মজ্ঞানী এসেছিল ?"

বিধু কহিলেন, "কেন, সে কথায় তোমার কাজ কি ?"

নীল। যদি এসে থাকে, তবে ঐ রাস্তায় যে কথাটা বলেছিলাম, তার মীমাংসা ক'রে যেতাম।

মুদী কহিল, "না বাপু, ব্রহ্মজ্ঞানী-ট্যানি কেউ এখানে আসে নি।" নীলকমল মুদীর কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুন্ন হইল। তার মনে বিশ্বাস ছিল যে, দোকানে আসিয়া পূর্ব্বরাত্রের ব্রাহ্মদ্বয়ের সহিত দেখা হইবেক।

অতঃপর উভয়েই সেই দোকানে স্নানাহার করিলেন। এবং পথশ্রান্তিতে অত্যন্ত কাতর থাকায় সে রাত্রিও সেই স্থানে যাপন করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সহরের সুখ

পরদিবস প্রাতে আবার উভয়েই চলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা যতই কলিকাতার সন্নিহিত হইতে লাগিলেন, নীলকমলের ততই আহ্লাদ হইতে লাগিল। কিন্তু কলিকাতা কেমন স্থান, নীলকমল তাহার কিছুই জানে না; এ জন্য বিধুকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ দাদাঠাকুর, কলিকাতা কেমন জায়গা ?"

বিধু। কেমন জায়গা জিজ্ঞাসা কল্লে এখন আমি কি বল্‌বো ? কত বড় তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছো, না কেমন জল হাওয়া, এর আমি কোন্‌টার জবাব দেবো ?

নীল! আমি সব জিজ্ঞাসা কর্‌ছি। কলিকাতায় কি আমাদের দেশের মত মাটি ?

বিধু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমাদের দেশের মতন, না কি আর এক রকম মাটি ?"

নীল। আচ্ছা, কলিকাতা যে বড় সহর বলে—তা সহরটা কি আমাকে বল দেখি।

বিধু। সহর এই যে, মস্ত বাজার, অসংখ্য দোকান, অসংখ্য লোকজন।

নীল। আচ্ছা, আমাদের হাটে যত লোক হয়, তত লোক ?

বিধু। কোথায় তোমাদের হাট ? কলিকাতায় যত লোক, এত লোক এ দেশে আর কোন জায়গায়ই নাই।

নীল। আচ্ছা, সেখানে ক-দিন অন্তর হাট হয় ?

বিধু। হাট কি ? সেখানে কি হাট আছে ? রোজই যে-জিনিস ইচ্ছা হয়, তাই কিনতে পাওয়া যায়। কত শত দোকান আছে! রোজ কত শত জায়গায় বাজার বসে।

নীল। আচ্ছা, রোজ বাজার বসে, আর এত দোকান আছে, রোজ খদ্দের হয় কোথা থেকে ? আমাদের হাট ত মস্ত হাট, কিন্তু তা ত রোজ হয় না। আর এক

দিন জিনিস কিন্‌লে আর তিন দিন কিন্‌তে হয় না।

বিধুভূষণ কহিলেন, "কোথা থেকে খদ্দের হয়, একটু পরে দেখ্‌তে পাবে। আমি আর এখন বক্‌তে পারি না।"

উভয়ে ক্ষণকাল মৌনভাবে চলিয়া নীলকমল জিজ্ঞাসা করিল, "এখন বলো দাদাঠাকুর, কোথা থেকে খদ্দের হয় ?"

বিধু কিঞ্চিৎ রাগত হইয়া কহিলেন, "বল্লাম এখনকার সময় নয়, তবু জিজ্ঞাসা কর্‌বে ? অমন কর ত আমি কিছুই বল্‌বো না।"

আবার অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া গেল। কলিকাতার যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই লোকের সমারোহ বেশী দেখিয়া নীলকমল জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা দাদাঠাকুর, এত লোক কোথায় যাচ্ছে ? বোধ হয় কোন জায়গায় যাত্রা হচ্ছে।"

বিধু। হাঁ, যাত্রা হচ্ছে না তোমার মাথা হচ্ছে। দেখ্‌তে পাচ্ছ না, প্রায় কলিকাতায় পেঁছিলাম। এখানেও লোক হবে না ত কোথায় হবে ?

নীল। এত লোক কি সকলেই কলিকাতায় যাচ্ছে ?

বিধু। হাঁ।

নীলকমল আবার খানিক চুপ করিয়া থাকিল। শ্যামবাজারের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। একখানা ঘোড়ার গাড়ী আসিতেছে দেখিয়া নীলকমল বলিয়া উঠিলেন, "দাদাঠাকুর, হ্যাদে দেখ, এ আবার একটা কি ?"

বিধুভূষণ হাসিয়া কহিলেন, "নীলকমল, তুমি কখন গাড়ী দেখ নি ?"

নীল। দেখ্‌বো না কেন ? রহিম ঘরামীর গাড়ী দেখেছি, আর আর কত লোকের গাড়ী দেখেছি।

বিধু। সে ত গরুর গাড়ী। কখন ঘোড়ার গাড়ীর নাম শোন নি ?

নীল। এরি নাম ঘোড়ার গাড়ী ?

বিধুভূষণ উত্তর করিলেন, "হাঁ। কেন, তুমি কি কৃষ্ণনগর যাও নাই ? সেখানে কত ঘোড়ার গাড়ী আছে।"

নীলকমল কহিল, "আমি ভাবতাম, ঘোড়গাড়ী আর গরুর গাড়ী এক রকম, এতে গরু যোড়ে, ওতে ঘোড়া যোড়ে। এ দেখি একখান পাল্‌কির মতন. তা কেমন ক'রে টের পাব ?"

এই বলিতে বলিতে উভয়ে শ্যামবাজারের পুল পার হইল। নীলকমল পুল পার হইয়া দেখে, কতকগুলি গাড়ী যাচ্ছে। অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া কহিল, "দাদাঠাকুর, হ্যাদে ডান দিকে দেখ, কত ঘোড়াগাড়ী। বাপ্‌ রে ?"

নীলকমলের চোখ আর রাস্তার দিকে নাই ; ক্রমাগত এ-দিক্‌ ও-দিক্‌ দেখিতেছে, এমন সময় একখানা গাড়ী আসিয়া তাহার গায়ে পড়িবার জো হইল। গাড়োয়ান "হট্‌ যাও" বলিয়া হাতের চাবুক দ্বারা নীলকমলকে প্রহার করিল। নীলকমল হঠাৎ সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল, গাড়ী তাহার উপর চড়িবার

উপক্রম করিতেছে। অমনি 'বাবা রে, বলিয়া রাস্তার ডান দিকে চলিয়া গেল।

বিধুভূষণ কহিলেন, "নীলকমল, এ তোমার গাঁ নয়, তোমার গাঁয়ের হাটও নয়, এখানে রাস্তা দেখে না চল্লে মারা পড়বে। এখনি গিয়াছিলে আর কি ?"

নীল। দাদাঠাকুর, এখন অবধি আমি তোমার গা ধরে চলবো।—এই বলিয়া বিধুভূষণের হস্ত ধারণ করিলে বিধু কহিলেন, "আমাকে ধরলে লাভের মধ্যে এই যে, তুমিও মারা যাবে, আমিও মারা যাব। তা না ক'রে তুমি আমার পিচু পিচু এস, আর মাঝে মাঝে চারি দিকে চেয়ে দেখ। পাগলের মত এক জিনিসের দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থেকো না।"

বিধুভূষণ যদিও কখন কলিকাতায় আসেন নাই, কিন্তু কৃষ্ণনগরে সর্ব্বদা তাঁহার যাতায়াত ছিল এবং তিনি নীলকমলের মত ব্যাকুব নন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে কলিকাতা তত নূতন বোধ হইল না। নীলকমলকে ডাকিয়া কহিলেন, "নীলকমল, কলিকাতার মধ্যে থাকা ত বড় কষ্ট, চল আমরা কালীঘাট যাই, গঙ্গাস্নান করা হবে, কালীদর্শন হবে, আর সেখানে একটু এর চাইতে কম গোল-যোগ শুনিছি।"

নীলকমলের কলিকাতা দেখিবার জন্যে যত স্পৃহা ছিল, দেখিয়া তাদৃশ ভক্তির উদ্রেক হইল না। চাবুকের আঘাতটা এখনও জ্বলিতেছে, সুতরাং কালীঘাটে কম গোলযোগ শুনিয়াই সেখানে যাইতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা দাদাঠাকুর, এখানে লোক কি সুখে থাকে ? চারি দিক্ থেকে যে গন্ধ বেরুয়েচে, আর রাস্তায় বেরুলে হয় ত চাবুক খেতে হয়, নয় গাড়ী চাপা পড়তে হয়।"

বিধুভূষণ হাসিয়া কহিল, "কলিকাতায় থাকবার ঐ সুখ।"

"আমি এমন সুখ চাই নে। চল, এখন কালীঘাটে যাই। কিন্তু সেখানে গিয়ে পেঁছিতে পারলে হয়। ঘোড়গাড়ীর যে হাঙ্গামা ?"

বিধু। কালীঘাটে ত যাব, কিন্তু রাস্তা চিনি নে ত, শুনেছি—কালীঘাট এর দক্ষিণ, চল দক্ষিণ মুখে যাই।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সুহৃদ্ভেদ

কালীঘাটে যাইবেন কৃতসংকল্প হইয়া বিধুভূষণ ও নীলকমল দক্ষিণ মুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন। ভবানীপুরের বাজারে আসিয়া বিধুভূষণ বলিলেন, "নীলকমল, এই ত কালীঘাট বোধ হচ্ছে। কাহাকে জিজ্ঞাসা করো দেখি, কালীবাড়ী কোথায় ?"

নীলকমল রাস্তার একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিল, "কালীবাড়ী কোথায় ?" যাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সে একজন ঢাকাই চালওয়ালা মহাজন। পূর্ব্বদেশে

কখনও কথার সোজা জবাব দেয় না। একটা প্রশ্ন করিলে তৎপরিবর্ত্তে পাঁচটা জিজ্ঞাসা করাই সে দেশের নিয়ম। নীলকমলের কথা শুনিয়া মহাজন জিজ্ঞাসা করিল, "আসচো কোয়ান্থে হে ?"

নীলকমল কহিল, "কেষ্টনগর থেকে।"

মহাজন। আর কহন কি কলকাতায় আস নাই ?

নীলকমল। তা হ'লে আর তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো কেন ?

মহাজন। যাবা কোয়ানে ?

বিধুভূষণের বিরক্তি ধরিয়া উঠিল। রৌদ্রে চলিয়া চলিয়া মাথা ধরিয়াছে। ক্ষুধায় গা ঘুরিতেছে। ঢাকাই মহাজনের কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমরা যাব চুলোয়।"

মহাজন বিধুভূষণের কথা শুনিবা মাত্র চটিয়া উঠিয়া কহিল, "এ যে বারি বর মানুষ দেহি, যেন রাজা রাজবল্লভের নাতি। যা তোরা দেহে নে গে কালীবারী, আমি তো বলমু না।"

বিধুভূষণ। না বল্লে ত ব'য়েই গেল। চল নীলকমল, আমরা খুঁজে নিতে পারবো।

আবার খানিক দূর গিয়া বিধুভূষণ মনে করিলেন, রাস্তার লোকের উপর বিরক্ত হইয়া নিজে কষ্ট পাওয়া অতি নির্ব্বোধের কাজ। এমন সময়ে একজন ব্রাহ্মণ, গলায় একখানা গামছা, কপালে সিন্দুরের ফোঁটা, হাতে একছড়া ফুলের মালা, তাঁহাদের দিকে আসিতেছে। বিধুভূষণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, কালীঘাটে কোন্ দিক্ দিয়ে যাব ?"

জিজ্ঞাসা করিবা মাত্র ব্রাহ্মণ চির-পরিচিতের ন্যায় বিধুভূষণের হস্ত ধরিয়া কহিল, "তার জন্যে ভাবনা কি ? আমার সঙ্গে এস, আমি সেইখানে যাচ্ছি।" নীলকমল ও বিধুভূষণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

ব্রাহ্মণটি মা-কালীর পাণ্ডা। সে যে-শিকারে বাহির হইয়াছিল, তাহাই পাইয়াছে। রাস্তায় নানাবিধ মিষ্টালাপ করিয়া বিধুকে ও নীলকমলকে কালীঘাটে লইয়া গেল।

বিধুভূষণ ও নীলকমল প্রায় অপরাহ্নে কালীঘাটে গিয়া পৌঁছিলেন। পৌঁছিয়া গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন। নীলকমলের গঙ্গা দর্শন করিয়া অভক্তি হইল। বিধুভূষণকে কহিল, "দাদাঠাকুর, এই কালীঘাটের গঙ্গা ? এরই এত নাম ? এর চেয়ে আমাদের হাঁসখালির নদী ঢের ভাল, সেখানে কাদাও কম।" বিধুভূষণ বলিলেন, "এই গঙ্গায় এত লোক উদ্ধার হ'ল, আর তুমি আর আমি কি হ'তে পারবো না ?" এইরূপ গল্পে স্নান সমাপন করিয়া উভয়ে কালীর মন্দিরে গেলেন। পাণ্ডাজী সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। পথ প্রদর্শন করাইয়া লইয়া যাইতেছেন। মন্দির দেখিয়াও নীলকমলের বড় ভক্তি হইল না, কিন্তু কালী দর্শন করিয়া একেবারে অভক্তির পরাকাষ্ঠা হইল। "দাদাঠাকুর, দূরে থেকে সব

জিনিসের বড় বড় কথা শুনা যায়। তুমি বল্লে বিশ্বাস করবে না, কিন্তু যে দিব্বি বলো আমি করতে পারি, এর চেয়ে আমাদের গাঁয়ে রামা কুমোর ভাল ঠাকুর গড়তে পারে।" বিধুভূষণ কহিলেন, "আচ্ছা, পারে ভালই, এখন যা করতে এসেছ ক'রে যাও।"

উভয়ের কালী দর্শন করা হইল। মন্দিরের দ্বারে একজন কালীর পরিচারক ছিল। বিধু ও নীলকমল প্রণাম করিয়া উঠিবা মাত্রেই সে দর্শনী ও প্রণামী পয়সা চাহিল। বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত দিতে হবে ?"

পরিচারক কহিল, "তাহার নিয়ম নাই, কিন্তু আট আনার কম নয়, অধিক যত দিতে পার, ততই তোমাদেরই ভাল।"

বিধুভূষণ কোমরস্থিত থলি হইতে চারি আনা দিলেন। নীলকমল না দিয়া চলিয়া আসিতেছে। পরিচারক জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি দিলে না ?"

নীলকমল কহিল, "আমি বাবুর চাকর, আমি আর কি দেবো ?"

উভয়ে মন্দির হইতে বাহিরে আসিলে পাণ্ডা হস্ত প্রসারণ করিয়া কহিল, "আমাকে কি দেবে দাও।"

বিধুভূষণ কহিলেন, "তোমাকে আর কি দেবো ? একবার ত দিয়ে এলাম।"

পাণ্ডা কহিল, "ও ত প্রণামী দিলে। তুমি প্রণামী কেন লাক্ টাকা দাও না। তাতে ত আমার কোন লাভ নাই। আমি যে তোমাদের সঙ্গে ক'রে এনে কালী দর্শন করালাম, তার বকশিশ কই ? আর ফুল দিলাম, সিন্দূর দিলাম, এর দক্ষিণা কৈ ?"

বিধুভূষণ ট্যাঁকে থেকে আর চারি আনা পাণ্ডাকে দিয়া যাইতেছেন, কিন্তু কালীঘাটের লোকে যদি একবার টের পায়—কাহারও কাছে পয়সা আছে, তাহা হইলে তাহাকে সহজে ছাড়ে না। বিধুভূষণের হাতে পয়সা আছে দেখিয়া অন্ততঃ পঁচিশ জন স্ত্রী পুরুষে আসিয়া মালা হাতে করিয়া তাঁহাকে ও নীলকমলকে ঘিরিয়া ফেলিল। আর যাইবার উপায় নাই। সম্মুখে যাইতে গেলে পশ্চাৎ দিক্ হইতে কাপড় ধরিয়া টানে, পশ্চাতে আসিতে গেলে সম্মুখে টানে ; যে দিকে যান, অপর দিক্ হইতে তিন চারি জন টানাটানি করে। আর এত আশীর্ব্বাদ ও গোলমাল করিতে লাগিল যে, সেখানে যে না গিয়াছে, সে কখন তাহা অনুমান করিতেও সমর্থ হয় না, বলিলেও বিশ্বাস করে না। বিধুভূষণ বিরক্ত হইয়া কোমর হইতে পয়সা সকলকে কিছু কিছু দিতে গেলেন। কিন্তু দুঃখ ও আশ্চর্য্যের বিষয়, কোমরে থলি নাই। উচ্চৈঃস্বরে নীলকমলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীলকমল, আমার থলি কি হ'ল ?"

নীলকমল কহিল, "আমি আপনার মাথা বাঁচাতে পারি নে, তা তোমার থলি কোথায় কেমন ক'রে বলবো।"

বস্তুতঃ নীলকমলের মাথা বাঁচান দায় হইয়া উঠিয়াছিল। যে যে-দিক্ হইতে পারিতেছে, তার কপালে সিন্দূর দিতেছে। সকলেরই যে কপালে পড়িতেছে, তা

নয়। কেউ গালে দিতেছে, কেউ কানে, কেউ নাকে, একজন খানিক তার চক্ষুর মধ্যে দিল। মালা এতই দিয়াছে যে, নীলকমলের একপ্রকার বোঝা হইয়া উঠিল। নীলকমল ক্রমাগতই উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে, "ওগো, আমার কাছে কিছু নেই, আমাকে কেন মিথ্যা কষ্ট দাও।"

অতি কষ্টে বিধু ও নীলকমল গোলের মধ্য হইতে বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, একজন খোট্টাকে তাঁহাদেরই মতন আক্রমণ করিয়াছে। নীলকমল আর তথায় এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইল না। "দাদাঠাকুর, ওই আবার আস্‌ছে, আমি চল্লাম। আর কোন্ শালা এখানে থাক্‌বে"—এই বলিয়া দৌড়িয়া পলাইল। বিধুভূষণ আস্তে আস্তে আসিতেছেন। দৌড়িয়া পলায়ন কলিকাতায় সহজ ব্যাপার নহে। নীলকমলের পিছু পিছু অমনি ধর ধর বলিয়া লোক দৌড়াইতে লাগিল। নীলকমল যতই যায়, লোকের সংখ্যা ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। খানিক দৌড়াইয়া নীলকমল আর পারিল না। তিন দিন রাস্তায় চলিয়াছে, বিশেষ সে দিন কিছুই আহার করে নাই ; একটা মোড় ঘুরিবার সময় নীলকমল পড়িয়া গেল। অমনি সকলে আসিয়া নীলকমলের চতুষ্পার্শ্বে দাঁড়াইল, কিন্তু কি জন্যে তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইয়া আসিয়াছে, কেহই জানে না। লোকে আসন্নকালে যেমন সংসারের, দয়া মায়া পরিত্যাগ করে, নীলকমল সেই-রূপচিত্ত হইয়া কহিল, "দাও দাও, কত মালা আছে আর কত সিন্দুর আছে দাও। একটা চোক গিয়েছে, নয় বাকি যেটা আছে, সেটাও যাবে।" নীলকমলের কথায় লোকে মনে করিল এটা পাগল, তাই ভাবিয়া একটু পরে সকলে হাসিয়া চলিয়া গেল। নীলকমলের বেদনায় চক্ষে জল পড়িল, একটু রাস্তার ধারে বসিয়া থাকিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া বিধুভূষণের নিকট আসিতে লাগিল। কিন্তু নীলকমল আর পথ চিনিতে পারিল না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রায় সন্ধ্যা হইল, তথাপি মন্দির খুঁজিয়া পাইল না। ক্ষুধায় শরীরে আর সামর্থ্য নাই। ইটের রাস্তায় পড়িয়া গিয়া শরীরে স্থানে স্থানে চর্ম্ম উঠিয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় নীলকমল এক বাটীর দরজায় বসিল। একাকী বিদেশে কোথায় যাইবে, কাহার বাড়ীতে থাকিবে ভাবিয়া নীলকমল কাঁদিতে লাগিল।

যে বাটীর দ্বারে বসিয়া নীলকমল রোদন করিতেছিল, সন্ধ্যার সময় সে বাটীর বাবু কাছারি হইতে বাটী আসিয়া নীলকমলকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?"

নীলকমল কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিল, "আমি নীলকমল।"

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে বসে কাঁদছো কেন ?"

নীলকমল কহিল, "আমি হারায়ে গিয়েছি।"

বাবু। সে কি রে ? তুই হারিয়ে গিয়েছিস কেমন ক'রে ?

নীলকমল আদ্যোপান্ত সমুদায় বর্ণনা করিল। শুনিয়া বাবুর অত্যন্ত দুঃখ হইল। বাটীর মধ্যে গিয়া কাপড় ছাড়িয়া তিনি নীলকমলকে জলখাবার দিলেন।

আহার করিয়া নীলকমলের শরীর প্রায় পূর্ব্ববৎ হইল। তখন নীলকমল মনে করিল, এই সময় একবার গুণের পরিচয়টা দেওয়া যাউক। এই ভাবিয়া বাবুকে কহিল, "আমি যাত্রার দলে থাকবো ব'লে এসেছি, ভাল বেহালা বাজাতে পারি।"

বাবু কহিলেন, "একবার বাজাও দেখি।"

নীলকমল বেহালাটি বাহির করিয়া দেখিল, চার পাঁচ জায়গায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নীলকমলের সর্ব্বস্বধন বেহালাটি। সেটির এমন দুর্দ্দশা দেখিয়া নীলকমলের চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি?"

নীলকমল কথা না কহিয়া বেহালাটি বাবুর সম্মুখে রাখিল। তদ্দর্শনে বাবুর অত্যন্ত দুঃখ হইল। বাবু কহিলেন, "তুমি কেঁদো না, আমি তোমাকে একটা বেহালা কিনে দিব।"

নীলকমল কহিল, "দেবেন বটে, কিন্তু এমনটি আর হবে না।"

বাবু কহিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে দোকানে যেও। দোকান থেকে তোমার যেটি পছন্দ হয়, সেটি নিও।"

নীলকমল আশ্বস্ত হইল এবং চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিল। পরে রাত্রে আহারাদি করিয়া সেই বাটীতে শয়ন করিয়া রহিল।

বিধুভূষণের যথাসর্ব্বস্ব এক থলির মধ্যে—সেই থলি চুরি হওয়ায় তাঁহার যে পর্য্যন্ত দুঃখ হইল, তাহা অনির্ব্বচনীয়। নীলকমলকে সকলে তাড়াইয়া লইয়া গেল, তাহা দর্শন করিয়া তিনি আরও বিস্ময়ান্বিত হইলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, একাকী এখানে আসিয়া কি কুকর্ম্মই করা হইয়াছে। পথশ্রান্তিতে, মনোদুঃখে ও জঠরানল প্রজ্বলিত হওয়ায় বিধুভূষণের চক্ষু হইতে দর দর করিয়া অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল। মনোদুঃখে একাকী গঙ্গাতীরে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন; এমন সময়ে তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত পাণ্ডার সহিত সাক্ষাৎ হইল। পাণ্ডাজী পুনর্ব্বার শিকারে বহির্গত হইয়াছে। বিধুভূষণ পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় গেলে তিনি চারিটি অন্ন পান। পাণ্ডা কহিল, "সে জন্য ভয় কি? তুমি আমার সঙ্গে এস, আমি তোমাকে প্রসাদ দেবো এখন।" বিধুভূষণ পাণ্ডার সমভিব্যাহারে আসিয়া কালীর ভোগ হইয়া গেলে প্রসাদ পাইলেন। এবং সন্ধ্যার পর নাটমন্দিরের এক কোণে শয়ন করিয়া রজনী অতিবাহিত করিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া গঙ্গাস্নান করিলেন, পরে নাটমন্দিরের এক কোণে বসিয়া রহিলেন। অবাক্—তিনিও কাহারও সহিত কথা কহেন না, অন্য কেহও তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে আইসে না। যখন বড় সমারোহ হইল, একটু এ-দিক্ ও-দিক্ চলিয়া বেড়াইলেন। ভোগ হইয়া গেলে প্রসাদ পাইলেন এবং পূর্ব্বদিবসের মত নিদ্রায় রজনী যাপন করিলেন। এইরূপে বিধুভূষণ কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বিপ্রদাসের উইল

হেম স্বর্ণলতার লেখাপড়া সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই যথার্থ ঘটিল। কাহারও কাছে সাহায্য না লইয়া স্বর্ণলতা অতি সত্বরেই পুস্তকাদি পাঠ করিতে শিখিলেন এবং হেমকে প্রতিশ্রুত পত্রখানি লিখিলেন। পত্র পাঠ করিয়া হেমের যার-পর-নাই আহ্লাদ হইল। বাটী আসিবার সময় তিনি একটি খোঁপার ফুল খরিদ করিয়া আনিলেন এবং বাটীতে প্রবেশ করিবা মাত্রেই স্বর্ণকে ডাকিয়া কহিলেন, "স্বর্ণ, এই তোমার পত্রের জবাব এনেছি।" স্বর্ণ হেমের স্বর শুনিয়া দৌড়িয়া গৃহমধ্য হইতে আসিয়া হেমের হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন। হেম ফুলটি স্বর্ণের হাতে দিয়া কহিলেন, "স্বর্ণ, এই নেও তোমার ফুল। দেখ, আমি যা বলেছিলাম, তাই করেছি কি না?" স্বর্ণ হেমের হস্ত হইতে হাসিতে হাসিতে ফুলটি লইয়া আপনার খোঁপায় পরিলেন।

হেম যখন বাটী আসিয়া পোঁছিলেন, তখন বিপ্রদাস অনুপস্থিত ছিলেন; কিন্তু ক্ষণকাল পরেই প্রত্যাগত হইলেন। হেম বাটী আসিতেছে শুনিয়া তিনি প্রায় কোন স্থানে যাইতেন না। গেলেও অধিক দেরি করিতেন না। বাহির হইতে হেমের স্বর শুনিয়া তিনি হর্ষোৎফুল্লনেত্রে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। স্বর্ণ পিতাকে দেখিতে পাইয়া হস্ত প্রসারণপূর্বক তাঁহার কাছে গেল। বিপ্রদাস অমনি স্বর্ণকে কোলে লইলেন; স্বর্ণ কহিল, "এই দেখ বাবা, দাদা আমার জন্যে ফুল এনেছে।"

বিপ্রদাস গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া এ-পর্যন্ত কথা কহিতে পারেন নাই। স্বর্ণের ফুল দেখিয়াও কিছু বলিলেন না। কিন্তু তাঁহার নেত্রযুগলে দুইটি মুক্তাফল দেখা দিল। বিপ্রদাস প্রেম-অশ্রুপাত করিলেন। তদ্দর্শনে স্বর্ণের চক্ষে সেইরূপ মুক্তাফল ফলিল। হেম মাটির দিকে মাথা নামাইলেন। যে-গৃহে মধ্যে মধ্যে এরূপ মুক্তাফল ফলে না, সে গৃহের গৃহস্থেরা যথার্থ দীন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

বিপ্রদাস ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া হেমকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। অতঃপর স্নানের বেলা হইলে সকলে স্নানাহার করিলেন।

স্বর্ণলতা পূর্ববৎ হেমের নিকট পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার দিন দিন উন্নতি দেখিয়া হেম বিস্মিত হইলেন। মাঝে মাঝে বিপ্রদাস খাটে শয়ন করিয়া থাকেন এবং স্বর্ণ ও হেম নীচে বসিয়া কি পাঠ করে শ্রবণ করেন। সে সময় বিপ্রদাসের চক্ষে জল ধরে না।

দেখিতে দেখিতে হেমের ছুটি ফুরাইয়া গেল। ছুটি চিরকালই দেখিতে দেখিতে যায়। হেম পুনরায় বাটী হইতে কলিকাতায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। বিপ্রদাস এক দিবস কহিলেন, "হেম! এবার আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

হেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ?"

বিপ্রদাস উত্তর করিলেন, "আমার ক্রমে ক্রমে বয়স বাড়ছে ছাড়া ত কম্‌ছে না ? এই বেলা একটু লেখাপড়া কিছু ক'রে যাই। তা না ক'রে যদি মরি, তা হ'লে যা কিছু আছে, কবে কে তোমাদের কাছ থেকে ফাঁকি দিয়ে নেবে।"

হেম বিপ্রদাসের কলিকাতায় যাইবার কথা শুনিয়া হর্ষিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু কি জন্যে যাইবেন শুনিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার মুখ ম্লান হইল। বিপ্রদাস হেমের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "উইল করবো, তাতে ভয় কি ? লোকে কি উইল করলেই মরে।"

হেমের চক্ষু দিয়া দর দর অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। বিপ্রদাস হেমের চক্ষু মুছাইয়া কহিলেন, "ছি, কান্‌তে নাই। কত লোকে ছেলেবেলাই উইল করে। একবার উইল ক'রে আবার কত বার বদলায়।"

হেম ক্রন্দন সম্বরণ করিলেন। নির্দ্ধারিত দিবসে তাঁহার কলিকাতায় যাইবার জন্য যাত্রা করিলেন।

বিপ্রদাসের যে গ্রামে বাটী, সে গ্রামে বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ হাইকোর্টের উকিল। বিপ্রদাস হেমের বাসায় দুই এক দিবস অবস্থিতি করিয়া ভবানীপুর বিনয়বাবুর বাসায় উপস্থিত হইলেন।

বিনয়বাবু বিপ্রদাসকে দেখিয়া যত্ন ও ভক্তি করিয়া বসাইলেন। অন্যান্য গল্পের পর বিনয়বাবু বিপ্রদাসের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিপ্রদাস কহিলেন, "বাপু, আমরা ত বুড়ো হয়ে পড়লাম, এখন কবে মরি তার ঠিক নাই। তাই ভাবলাম, এই বেলা একটা উইল না ক'রে গেলে পাছে পরে ফাঁকি দিয়ে নেয়।"

বিনয়বাবু উত্তর করিলেন, "সে ভালই বিবেচনা করেছেন। উইলের ভাবনা কি ? যখন বল্‌বেন ক'রে দেবো ; কিন্তু আপনি কা'কে কি দিবেন মনে করেছেন ?"

বিপ্র। যা কিছু আছে, মনে করেছি—সমান ভাগে স্বর্ণকে আর হেমকে দিয়ে যাব। ওর আর চুল চিরে ভাগ করায় কাজ কি ?

বিনয়বাবু কহিলেন, "তা হ'লে হেমের প্রতি অন্যায় হয়। মনে করুন, স্বর্ণের বিবাহ হ'লে ত হেম তার বিষয়ের অংশ নিতে যাবে না ?"

বিপ্র। বিনয়বাবু, যা ব'ল্‌ছ সত্য বটে, কিন্তু মেয়েটি যে সৎপাত্রে পড়বে, তার নিশ্চয় কি ? বিশেষ হেম ব্যাটাছেলে ; বেঁচে থাক্‌লে কত বিষয় কর্‌তে পারবে। আমার বাপ ত আমাকে কিছু দিয়ে যান নাই।

বিনয়। সর্ব্বসমেত কত টাকা রেখে যাচ্ছেন ?

"সেকেলে" লোক সর্ব্ব বিষয়ে খোলা বটে, কিন্তু সঞ্চিত বিষয় কত, কাহাকে বলে না। বিপ্রদাস একটু হাসিয়া কহিলেন, "আমার যৎকিঞ্চিৎ আছে। তা তুমি যেখানে উইল করবে, তোমার কাছে আর গোপন করলে কি হবে ? উইল লেখার দিন টের পাবে।"

বিপ্রদাস এই বলিয়া সে দিবস বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। দিনকতক পরে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্পে উইল লেখা হইল। বিপ্রদাসের ত্রিশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ ছিল। হেমকে তাহার পনের হাজার দিলেন ও স্বর্ণকে পনের হাজার দিলেন। হেম প্রাপ্তবয়স্ক হইলে ও স্বর্ণলতার বিবাহ হইলে উইলের সর্ত্ত আমলে আসিবে।

বিংশ পরিচ্ছেদ

গদাধর ও শ্যামা

গদাধর থানায় কি হইয়াছিল, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই বটে, কিন্তু মনে মনে কিরূপে শ্যামা ও সরলাকে জব্দ করিবেন, এই চিন্তাই সর্ব্বদা করিতে লাগিলেন। প্রমদাও তাহাই প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার স্বামী বাটী আসিয়া শ্যামার বিধিমত লাঞ্ছনা করিবেন, কিন্তু যখন দেখিলেন, তিনি কিছু করিলেন না, তখন মনে করিলেন, আর কাহাকে কিছু না বলিয়া নিজেই শ্যামাকে শাসন করিবেন। কিন্তু শ্যামাকে কিছু বলিতে কাহারও সাহস হয় না।

এক দিবস রাত্রিতে আহারাদি করিয়া শ্যামা ও সরলা শুইয়া আছেন, ঘরের দরজা খোলা রহিয়াছে। প্রমদা নিঃশব্দপদসঞ্চারে পুরাতন বাটীতে গিয়া সরলার শয়নঘরের দ্বারে দাঁড়াইলেন। শুনিলেন, সরলা ও শ্যামা উভয়ে কথোপকথন করিতেছে। সরলা কহিলেন, "শ্যামা, প্রায় তিন মাস হইল, তবু একখান পত্রও পাওয়া গেল না। তিনি কোথায় গেলেন ? কি হ'ল, তার কিছুই টের পেলেম না। আমার ভাবনায় শরীর শুখিয়ে যাচ্ছে।"

শ্যামা উত্তর করিল, "তার ভাবনা কি ? এই পত্র এলো। মনে কর, তিনি একে বিদেশে গিয়েছেন, সেখানে দেখে শুনে নিতেই কত দিন গিয়েছে, একটু স্থির হয়ে না ব'স্‌লে ত আর কেউ পত্র-টত্র লিখ্‌তে পারে না।"

সরলা। তা সত্য বটে, কিন্তু তিন মাসও ত অল্প সময় নয় ?

শ্যামা। তিনি যে তিন মাস এক জায়গায় আছেন, তারই বা ঠিক কি ? যাত্রার দল ত কখন এক জায়গায় ব'সে থাকে না। হয় ত আজ এখানে কাল ওখানে ফিরে বেড়াচ্ছেন, তাই পত্র লিখিবার কোন সুবিধা পান নাই।

সরলা। আমাদের খরচপত্রও বুঝি প্রায় শেষ হয়ে এলো, এর পর কি হবে, আমি তাই ভাবছি।

শ্যামা। তার ভয় কি ? এখনও যা আছে, তাতে ছয় মাস অনায়াসে চল্‌বে।

সরলা। শ্যামা, তুমি যে ঐ ভাঙ্গা সিন্দুকে টাকা রাখ, এ কিন্তু ভাল না। কবে কে টের পেয়ে এক দিন সব নিয়ে যাবে।

শ্যামা। কেই বা টের পাবে যে, সিন্দুক ভাঙ্গা। যদি তুমি চুরি কর, তা

হ'লে যাবে, আর আমি চুরি করলে যাবে। এ ছাড়া আর চুরি করতে আসবে কে।

প্রমদা এত দূর পর্য্যন্ত শুনিয়া দ্বারের নিকট হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার বড়ই আহ্লাদ হইল। এক বার মনে করিলেন, সেই রাত্রেই টাকাগুলি চুরি করিবেন। কিন্তু নিজে গেলে পাছে ধরা পড়েন, এই ভাবিয়া রাত্রে চুপ করিয়া রহিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে শশিভূষণ কাছারি চলিয়া গেলে গদাধর ও জননীকে ডাকিয়া পরামর্শ করিলেন। গদাধরচন্দ্র আহ্লাদে আটখান হইয়া কহিল, "ডিডি, টোমার আর কিছু কোরটে হবে না। আমি একলাই পারবো, কিন্টু ডুয়ার খোলা পেলে হয়।"

গদাধরের মাতা কহিলেন, "সে জন্যে ভয় নাই। আমি আজ পাঁচ দিন দেখছি, ওরা দোর খুলে রাখে। কিন্তু গদাধরচন্দ্র সাবধান, শ্যামা যদি জেগে থাকে, তবে তুমি এমন কাজে যেও না।"

গদাধর উত্তর করিল, "ভয় কি মা। আমি গায়ে টেল মেখে যাব, যডিও ঢরে টরে, এক টান মেরে পালাবো।"

প্রমদা দ্বারে দাঁড়াইয়া ছিলেন, দূরে শ্যামাকে আসিতে দেখিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "গদাধর চুপ্ চুপ্।" গদাধর চুপ করিল। পরে প্রমদা উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "গদাধরচন্দ্র, আজ না তুমি বাড়ী যেতে চেয়েছিলে, যাও না কেন?"

গদাধরও উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "এখন টো রোড্র হয়ে উঠলো, ওবেলা যাব।" সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ অগ্রে গদাধর কাপড়-চোপড় পরিয়া বাটী যাইবার জন্য বাহির হইলেন। কিন্তু রাত্রি ১০ টা ১১ টার সময় পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। প্রমদা দরজা খুলিয়া রাখিয়াছিলেন, সুতরাং গদাধর নিঃশব্দেই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গ্রীষ্মকাল, সরলা ও শ্যামা দরজা খুলিয়া শুইয়া আছেন, দু-জনের মধ্যে শুইয়া গোপাল নিদ্রা যাইতেছে, শব্দটি মাত্র শুনা যাইতেছে না। গদাধর সুযোগ বুঝিয়া সরলার গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক টাকাগুলি লইয়া সেই রাত্রেই বাটী চলিয়া গেলেন। পরদিন ৭টার সময় গদাধর ফিরিয়া আসিলেন। রাস্তায় আসিবার সময় মনে মনে নানাবিধ চিন্তা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কোন গোলযোগের কথা শুনিতে পাইলেন না। পাড়াগাঁয় সহরের মত প্রত্যহ টাকার প্রয়োজন হয় না। সরলার কোন খরচপত্রের আবশ্যক হয় নাই। শ্যামাও সে দিবস সিন্দুক খোলে নাই, সুতরাং সে দিবস কোন গোল-যোগও হইল না।

পরদিবস আহার করিয়া গোপাল পাঠশালায় যাইবার সময় কহিল, "মা, আজ মাইনে দিতে হবে, গুরুমহাশয় কালিই নিয়ে যেতে বলেছিলেন, তা আমার মনে ছিল না। আজ না দিলে হবে না।" সরলার তখন অবসর ছিল না। শ্যামাকে ডাকিয়া কহিলেন, "শ্যামা, গোপালের পাঠশালের মাইনে দাও।"

শ্যামা সিন্দুক খুলিয়া যে স্থলে টাকা থাকে খুঁজিয়া পাইল না; মনে করিল,

সরলা টাকা স্থানান্তরে রাখিয়া ঠাট্টা করিতেছেন। এ জন্য সরলাকে কহিল,

"খুড়ী-মা, আমার সঙ্গে চালাকি ?"

সরলা কহিলেন, "সে কি শ্যামা ?"

শ্যামা। ইঃ—উনি কিছু জানেন না আর কি ?

সরলা কহিল, "শ্যামা, যথার্থই আমি কিছু জানি নে।"

শ্যামা সরলার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিল, সরলা যাহা বলিয়াছেন, যথার্থ। তখন কহিল, "তুমি ত টাকা কোন জায়গায় রাখ নাই।"

সরলা কহিলেন, "আমি ত দু-তিন দিন হ'ল সিন্দুকের কাছেও যাই নি।"

শ্যামা কহিল, "তবে যথার্থই টাকা চোরে নিয়েছে।" উভয়ে ব্যস্তসমস্ত হইয়া সিন্দুকের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। টাকা কোথাও নাই। সরলার মুখ শুখাইয়া গেল। কপালে ঘর্ম্ম বহিতে লাগিল। কাতর স্বরে কহিলেন, "শ্যামা উপায় ?"

শ্যামা কহিল, "আর কিছু না, ঐ বিট্‌লে বামুন নিয়েছে। এ গদার কর্ম্ম। এত দিন না, তত দিন না, হঠাৎ ও পরশু বাড়ী গেল কেন ? ও-ই টাকা চুরি ক'রে নিয়ে রেখে আস্‌তে গিয়েছিল। এখন আমার মনে হ'ল, ওরা সে দিন সকলে ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে পরামর্শ কর্‌ছিল, আমি ওদের বাড়ীর দিকে গেলাম, তখন চেঁচিয়ে কথা কইতে আরম্ভ করলে। চল্লাম আমি থানায়, ও কেমন বামুন আমি দেখ্‌বো।"

এই বলিয়া শ্যামা গৃহমধ্য হইতে বাহির হইল। প্রমদা, গদাধর ও গদাধরের জননী এ দু-দিবস ক্রমাগত চৌকি দিতেছিলেন কখন টের পায়। আপাততঃ সরলার গৃহে উচ্চ কথা শুনিয়া পরস্পর তিন জনে হাসিতে লাগিলেন।

শ্যামা বাহির হইয়া কহিল, "আমি টের পেয়েছি, কে টাকা চুরি করেছে ? এ সব গদাধরের কর্ম্ম। সে দিন বাড়ী গেল, যেন কেউ টের পেলে না আর কি ? এখন আমি বল্‌ছি, ভাল চাও ত টাকাগুলি দাও, না দিলে আমি থানায় খবর দেবো। আমি কাউকে ছেড়ে কথা কবো না। ধাড়ি বাচ্ছা সকলেরই নাম ক'রে দেবো।"

গদাধর বাহির হইয়া কহিল, "কি টুই বক্‌বক্‌ কর্‌ছিস ? কে টোর টাকা নিয়েছে ? ফের যডি টুই চোর্‌ বলিস্‌, টবে আমিই টোকে ঠানায় নিয়ে যাব।"

শ্যামা। তোর আর আমাকে থানায় নিয়ে যেতে হবে না। সে দিন গিয়েছিলি না থানায় ? কি কল্লি গিয়ে ?

গদাধর মনে করিল, শ্যামা তাহার বিদ্যা টের পাইয়াছে, পাছে বেশী কথা কহিলে সমুদায় প্রকাশ করিয়া দেয়, এই ভয়ে ঝগড়া ত্যাগ করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। শ্যামা বলিতে লাগিল, "এই আমি চল্লাম। আমি কাহারো উপরোধ করবো না। ঘরে পুলিস এনে খানাতল্লাসি ক'রে তবে ছাড়্‌ব।" শ্যামা

এইরূপ বলিয়া বাটীর বাহির হইতেছে, এমন সময় শশিভূষণ কাছারি হইতে বাটী আসিলেন। পুলিস খানাতল্লাসির কথা শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ আবার কি হয়েছে ?"

শ্যামা কহিল, "গদাধর আমাদের টাকা চুরি করেছে, যদি ভাল চায় এখনই দিক্, নইলে আমি চল্লাম, এই পুলিস ডেকে আনি গিয়ে।"

শশিভূষণ কহিলেন, "শ্যামা আমার সঙ্গে এস—আমি অনুসন্ধান ক'রে দেখি, পরে তুমি থানায় যেও।" শ্যামা শশিভূষণের কথায় ফিরিয়া আসিল।

শশী কাপড়-চোপড় ছাড়িলেন। শ্যামা গদাধরের বাটী যাওয়া ও তাহার পূর্ব্বে তাহাদিগের পরামর্শ ও পরে টাকা হারানর বিবরণ সমুদায় বর্ণনা করিল। শশিভূষণ শুনিয়া ভাল মন্দ কিছুই না বলিয়া শ্যামাকে কহিলেন, "শ্যামা, এখন এই টাকাটি দিয়া গোপালকে পাঠশালায় পাঠিয়ে দাও। আমি আহারাদি ক'রে ইহার বিচার করবো।"

শ্যামা তাই করিল।

শশিভূষণ আহারাদি করিয়া সমুদায় পুনরায় প্রমদার নিকট শুনিলেন। শুনিয়া তাঁহার অত্যন্ত সন্দেহ হইল। প্রমদাকে কিছু না বলিয়া পুনরায় কাছারি যাইবার সময় শ্যামাকে ডাকিয়া কহিয়া গেলেন, "শ্যামা, কে টাকা নিয়েছে ঠিক হ'ল না। কিন্তু পুলিস আনিয়া গোলের প্রয়োজন কি, তোমার যত টাকা গিয়েছে, আমিই দেবো!"

কাছারি হইতে আসিয়া শশিভূষণ শ্যামাকে পুনরায় ডাকিয়া টাকাগুলি গণিয়া দিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

গোপালের দুই মা

শশিভূষণের বাটীর কিঞ্চিৎ দূরে রামচন্দ্র ঘোষের বাটীতে পাঠশালায় গোপাল লিখিতে যায়। রামচন্দ্র ঘোষের চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা বসে। পাঠশালায় ষাট সত্তর জন বালকে লেখে। বালকেরা সকলে সারি সারি বসিয়া আছে। তন্মধ্যে গুরুমহাশয় হুঁকা-কলিকা-বেত্র-পরিবেষ্টিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে চণ্ডীমণ্ডপের মেজের উপর বেত্রাঘাতপূর্ব্বক "প'ড়ে লেখ্ প'ড়ে লেখ্" বলিয়া সিংহনাদ করিতেছেন।

বালকেরা যাহার যত দূর গলা, উচ্চৈঃস্বরে পড়িয়া লিখিতেছে। কেহ কেহ পঞ্চমে তুলিয়া "ক লেখ খ লেখ" করিতেছে, কেহ কেহ উচ্চৈঃস্বরে "রামকৃষ্ণ পরামাণিক" "জন্মেজয় মিত্র" ইত্যাদি যুক্তাক্ষরে নাম লিখিতেছে। অসংযুক্ত বর্ণের নাম গুরুমহাশয়ের গ্রাহ্য হয় না। কলার পাতায় কেহ হেঁকে হেঁকে "সেবক শ্রীউত্তমচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ" পাঠ লিখিতেছে। কাগজলেখক ছাত্রেরা যেন মস্ত মস্ত

জমিদার মহাজন হইয়া পড়িয়াছে। অর্থের প্রতি দৃক্‌পাতই নাই। যেমন তেমন বাঙ্গালা কাগজে মহামহিম পাঠ লিখিয়া দু-লাখ পাঁচ-লাখ টাকাই কর্জ্জ দিতেছে। কেহ গ্রামকে গ্রামই পত্তনি পাট্টা ইজারা দিতেছে। টাকার সুদ, কি জমির নিরিক লইয়া কোনই গোলযোগ হইতেছে না। এতেও গবর্ণমেণ্ট জমিদারদিগকে নিন্দা করেন।

নিধিরাম পাততাড়ি কক্ষে করিয়া 'ডান হাতে দোয়াত ঝুলাইয়া পাঠশালায় দেখা দিল। গুরুমহাশয় নিধিরামের দেরি হইয়াছে বলিয়া তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। নিধিরাম উপস্থিত হইবা মাত্রেই গুরুমহাশয় সমাদরে নিধিরামকে ডাকিলেন—"নিধে, এ দিকে আয় ত।" হুকুম পাস করিয়াই গুরুমহাশয় বেত্র আস্ফালন করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে নিধিরামের ওষ্ঠ, তালু শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইল। কিন্তু গুরু-মহাশয়ের হুকুম লঙ্ঘন করিবার জো নাই। নিধিরাম আস্তে ব্যস্তে এজলাসের নিকটে অগ্রসর হইল।

গুরুমহাশয় দক্ষিণ হস্তে বেত্রাস্ফালন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন রে নিধে, আজ তোর দেরি হ'ল ?"

নিধিরামের চক্ষের তারাদ্বয় মস্তকে উঠিয়াছে। যেন নিধিরামের অন্তিম কাল উপস্থিত। ঢোক গিলিয়া নিধিরাম উত্তর করিল, "সকাল বেলা তামাক ছিল না, তাই তামাক মেখে আনতে দেরি হয়ে গিয়েছে।"

এক কথাতেই গুরুমহাশয়ের রাগ কমিয়া গেল। কলিকাটি নিধিরামের হাতে দিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, সাজ তোর এক কলিকা তামাক। যদি ভাল হয়, তবে কিছু বল্‌বো না, মন্দ হ'লে তোর হাড় এক জায়গায়, মাস এক জায়গায় কর্‌বো।"

নিধিরাম বাঁচিয়া গেল। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পাততাড়ি ফেলিয়া কলিকা-হস্তে তামাক সাজিতে গেল।

আড়ালে আসিয়া নিধিরাম তামাক সাজিল এবং নিজে দুই এক টান দিয়া গুরুমহাশয়ের কাছে লইয়া গেল। নিধিরাম হালি তামাকে দীক্ষিত, সুতরাং যে ইচ্ছা, সেই তামাক তার কাছে ভাল লাগে। তাহার মুখে ভাল লাগিলে, গুরুমহাশয়ের মুখে ভাল লাগিবে, এই ভাবিয়া হৃষ্টচিত্তে গুরুমহাশয়কে কলিকাটি দিয়া নিজের জায়গায় বসিতে যাইতেছে।

গুরুমহাশয় দুই চারি টান টানিয়াই নিধেকে ডাকিলেন। আজি নিধের অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ। নিধে মনে করিতে লাগিল, "হায়, আমি সকাল বেলা উঠে কা'র মুখ দেখেছিলাম ? অদৃষ্টে যে কি আছে বলা যায় না।"

কিন্তু ভাবিলে আর কি হইবে ? এক পা দু-পা করিয়া কম্পিত কলেবরে নিধিরামকে হুজুরে হাজির হইতে হইল।

গুরুমহাশয় কহিলেন, "তবে রে পাজি, তুই কি এই তামাক আমার জন্য এনেছিস্‌ ?"

নিধি। আমার দোষ কি গুরুমহাশয়! বাবা কাল হাট থেকে যে তামাক এনেছেন, আমি তাই এনেছি।

"তোর বাবা কেমন তামাক আনে আমি দেখাচ্ছি," বল্‌তে না বল্‌তে অমনি গুরুমহাশয় সপাং সপাং ক'রে নিধিরামের পৃষ্ঠে ঘা-কতক বসাইয়া দিলেন।

গুরুমহাশয় নিধিকে প্রহার করিয়া, বীরভাব ধারণ করিলেন। উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "দোলের পার্ব্বণী যার যার বাকি আছে দাও।"

পাঁজিতে যত পার্ব্বণ আছে, গুরুমহাশয় তার প্রতি পার্ব্বণে পয়সা আদায় করেন। যদি বাপ মা না দিতে চান, গুরুমহাশয় বালকদিগকে চুরি করিয়া আনিতে শিখাইয়া দেন। ছেলেরা যদি সুবিধামতে বাহিরে পয়সা না পায়, তবে বাড়ীর কোন জিনিসপত্র চুরি করিয়া বেচিয়া গুরুমহাশয়কে পয়সা দেয়। গুরুমহাশয়কে সন্তুষ্ট করা আর দেবতা সন্তুষ্ট করা, বালকদের কাছে উভয়ই তুল্য।

দোলের পার্ব্বণী পয়সা যাহারা যাহারা আনিয়াছিল, গুরুমহাশয়কে দিল। গোপাল দিতে পারিল না।

গুরুমহাশয় গোপালকে ডাকিয়া কহিলেন, "গোপাল, তোমার পয়সা কোথায়?"

গোপাল সকাতরে উত্তর করিল, "গুরুমহাশয়, আমি কাল দেবো।" প্রহারের ভয়ে গোপাল বলিল, কাল দেবো, কিন্তু কোথায় পাইবে তাহার ঠিক নাই। গুরুমহাশয় বলিলেন, "তুমি আজ তিন দিন দেবো ব'লে দিতে পার্‌লে না; কাল যদি না পাই, তবে তোমাকে নিধের মতন কর্‌বো।"

গোপাল দাঁড়াইয়া কহিল, "কালি আমি অবশ্যই আনবো।"

পাঠশালার ছুটি হইলে গোপাল বাটী যাইবার সময় ভুবন নামে আর একটি বালককে বলিল, "ভুবন, আমাকে যদি একটা পয়সা ধার দাও, তা হ'লে আমি বাঁচি, তা নইলে কাল আর আমার পিঠের চামড়া থাকবে না।"

ভুবন কহিল, "তোমার মায়ের কাছ থেকে এনে দাও না কেন?"

গোপাল। মায়ের কাছে পয়সা নেই, থাক্‌লে কি আমি তোমার কাছে ধার চাই?

ভুবন। তবে তোমার জলখাবার পয়সা থেকে দাও না কেন?

গোপাল। আমি জল খাবার পয়সা পাই নে। তা যদি পেতাম, তা হ'লে আমি তোমার কাছে ধার চাইতাম না।

ভুবন। তুমি জলখাবার পয়সা পাওনা, তবে জল খাও কি? আজ বাড়ী গিয়ে কি খাবে?

গোপাল। তা ত আমি বল্‌তে পারি নে। যদি কিছু থাকে, তবে মা দেবে। যদি না থাকে, তবে খাবো না।

ভুবন। তুমি বাড়ী গিয়ে খাবার চাও না?

গোপাল। না।

ভুবন। কেন ?

গোপাল। যদি চাই, আর যদি ঘরে না থাকে, তবে মা বড় কাঁদে। মা'র কান্না দেখলে আমি থাকতে পারি না। আমারও বড় কান্না পায়। এই জন্য আমি কিছু চাই নে। এক দিন আমি আর বিপিন একত্তর বাড়ী গেলাম, বিপিন খাবার খেতে লাগলো, মা আমাকে কিছু দিতে পারলেন না ব'লে কত কাঁদতে লাগ্‌লেন। সে অবধি আমি একত্তর বাড়ী যাই নে। যখন বুঝি, বিপিন বাড়ী গিয়া খাবার-টাবার খেয়ে খেলা করছে, আমি তখন বাড়ী গিয়াই বিপিনের সংগে খেলা করি। যদি ঘরে কিছু থাকে, মা ডেকে দেন। যদি না থাকে, তা হ'লে আর কিছু খেতে পাই নে—এই কথা বলিতে বলিতে গোপালের চক্ষু হইতে অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল।

গোপালের অশ্রুপাত দর্শন করিয়া ভুবনের সরল চিত্ত দ্রব হইয়া গেল। ভুবন জিজ্ঞাসা করিল, "বিপিন যাহা খেতে পায়, তার কিছু তোমাকে দেয় না ?

গোপাল কহিল, "বিপিনের দেবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু জেঠাই-মা দিতে দেন না। বিপিনকে খাবার দিলে তিনি নিজে সুমুখে ব'সে থাকেন, পাছে বিপিন আমাকে দেয়।"

ভুবন। "চল, তুমি আমাদের বাড়ী চল। আমার যে খাবার আছে, দু-জনে ভাগ ক'রে খাব এখন ; আর তোমাকে মা'র কাছ থেকে একটা পয়সা চেয়ে দেবো।"

গোপাল। তোমার মা'র কাছে চাইলে দেবে না, তুমি যদি দাও, তবে চল যাই।

ভুবন। আচ্ছা চল যাই, আমিই দেবো এখন।

উভয়ে অত্যন্ত বিমর্ষচিত্তে বাটী গেল। বাটী গিয়া গোপাল বাহিরে বসিল। ভুবন মায়ের কাছে গিয়ে গোপালের কাছে যাহা শুনিয়াছিল, আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল। তিনি শুনিয়া গোপালকে ডাকিয়া আনিতে কহিলেন। ভুবন মাতার আজ্ঞা পাইবা মাত্র দৌড়িয়া দ্বারে আসিয়া গোপালকে লইয়া গেল।

ভুবনের মাতা গোপালের ম্লান মুখ ও ছল ছল নেত্র দেখিয়া যার-পর-নাই দুঃখিত হইলেন। দুটি হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপাল, তোমরা দু-জনে একত্তর হয়ে পাঠশালা থেকে এলে, তা তুমি বাইরে বসেছিলে কেন ?"

গোপাল কিছু উত্তর করিল না।

তখন ভুবনের মাতা উভয়কে খাবার দিলেন। এবং দুটি ছোট ছোট গেলাসে জল দিলেন। গোপাল ও ভুবন খাবার খাইয়া জল খাইতেছে। গোপাল এক গেলাস জল খাইয়া শূন্য গেলাসটি হাতে ধরিয়া কহিল, "আমাকে আর একটু জল দিন।"

ভুবনের মাতা হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "কা'র কাছে জল চাচ্ছ।"

গোপাল একটু লজ্জিত হইয়া হেঁট মুখে কহিল, "আপনার কাছে।" ভুবনের মাতা কহিলেন, "আমি কে, তা না বল্লে জল দেবো না।" গোপাল আরও লজ্জিত হইল এবং আরক্তিম মুখ হেঁট করিয়া রহিল। ভুবনের মা পূর্ব্বের মতন অল্প হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "আমাকে যদি বলো, 'মা, একটু জল দাও,' তা হ'লে দেবো, নইলে দেবো না।"

গোপাল গাঢ়স্বরে কহিল, "মা, একটু জল দাও।"

ভুবনের মা গোপালকে অবিলম্ব কোলে লইলেন এবং শিরশ্চুম্বন করিয়া আর এক গেলাস জল দিলেন।

গোপাল ক্ষণকাল চক্ষের জলে কিছুই দেখিতে পাইল না। ভুবনের মায়ের স্কন্ধে নিজ মস্তক রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিল। ভুবনের মাতার চক্ষু হইতে ঝর ঝর জল গোপালের বাহুমূলে পড়িতে লাগিল।

গদাধর, তোমারও মা আছে! প্রমদা, তোমারও সন্তান আছে!

অনেক ক্ষণ কোলে রাখিয়া ভুবনের মাতা গোপালকে নামাইয়া দিয়া পূর্ব্ববৎ গোপালের হাত ধরিয়া কহিলেন, "গোপাল, আগে বলো যে, তুমি পাঠশালা থেকে বাড়ী যাইবার সময় রোজ এখানে আস্‌বে, তা নইলে তোমাকে যেতে দেবো না।"

গোপাল কহিল, "আমি রোজই আস্‌বো।"

ভুবনের মাতা তখন গোপালের হাতে একটি টাকা দিয়া কহিলেন, "যাও, এখন দু-জনে গিয়ে খেলা করো। বাড়ী যাবার সময় আমাকে না ব'লে যেও না।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

নীলকমল যাত্রার দলে

নীলকমল কালীঘাটে বাবুর বাড়ী খায় দায় থাকে, কাজ কর্ম্ম করে। বাবু একটি ভাল বেহালা খরিদ করিয়া দিয়াছেন। সকলে কুঠি কাছারি চলিয়া গেলে সেইটি বাজায়। তাহাকে দেখিয়া যদি কেহ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিত, "এটি কে," বাবুর উত্তর করিবার অগ্রে নীলকমল কহিত, "আমি একজন কালওয়াৎ; বাবুকে গান-বাজনা শোনাই, আর বাবুর বাড়ীতে বাসা করিয়া থাকি।" বস্তুতঃ নীলকমলের দ্বারা বাবুর একটি চাকরের কাজ চলিত। এ জন্য বাবু নীলকমলের কথায় একটু হাসিয়া ক্ষান্ত হইতেন, আর কিছু বলিতেন না।

রাস্তা দিয়া ফিরিওয়ালারা যখনই হাঁকিয়া যাইত, নীলকমল তখনই তাহাদিগকে ডাকিত। নিকটে আসিলে নীলকমল জিজ্ঞাসা করিত, "আজ কোন জায়গায় কারুর যাত্রা হবে বল্‌তে পার?" যে ফিরিওয়ালা একবার নীলকমলের ডাকে আসিয়াছে, সে আর দ্বিতীয় বার আসিত না। নীলকমলও আর কাহারও কাছে জিজ্ঞাসা করিত না। তার বিশ্বাস ছিল, ফিরিওয়ালারা সকল বাটীতে যায়, সুতরাং সব জায়গার খবর জানে।

ক্রমে এক মাস দু-মাস যায়, নীলকমল আর যাত্রার খবর পায় না। নীলকমলের রাত্রে ঘুম হয় না। দিনে দু-দণ্ড স্থির হইয়া এক স্থানে বসে না। কিন্তু কোন-খানে গিয়া অনুসন্ধান করিতেও ভরসা হয় না। ঘরের বাহিরে গেলেই হারাইয়া যাইবে, এই চিন্তা নিয়তই নীলকমলের অন্তঃকরণে জাগরূক। অথচ কোথায় যাত্রা হইবে, কেমন করিয়া সেখানে যাইবে, তাহার উপায়ও না করিলে নয়।

নীলকমল এক দিবস প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া তামাক খাইতেছে, এবং কোথায় যাত্রা হইবে, এই চিন্তা করিতেছে, এমন সময় বাবু বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন, "নীলকমল, নীলকমল!"

নীলকমল অনন্যমনা হইয়া ভাবনা করিতেছিল, সুতরাং বাবুর ডাক তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। বাবু নিকটে আসিয়া ডাকিলেন। নীলকমল ফিরিয়া বাবুকে দেখিতে পাইল; বাবুর পোষাকী ধুতি চাদর ও ছড়ি হাতে দেখিয়া নীলকমল জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কোথায় যাবেন? আমারে ডাক্‌ছেন না কি?"

বাবু কহিলেন, "হাঁ। চল, যাত্রা শুনে আসি। তুমি না কি যাত্রা শুনবার জন্যে বড় ব্যস্ত হয়েছ?

নীলকমল উত্তর করিল, "আজ্ঞা হাঁ। আমারে যদি নিয়ে যান, তবে বড়ই ভাল হয়।"

বাবু কহিলেন, "সেই জন্যেই ত তোমাকে ডাক্‌ছি। শীঘ্র চল, আবার বাড়ী ফিরে এসে কাছারি যেতে হবে।"

নীলকমলের আর দেরি নাই। অবিলম্বে হুকাটি রাখিয়া স্কন্ধে চাদর ফেলিয়া বাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটীর বাহির হইল। বাবু কালীঘাটের কালীবাড়ীর রাস্তা ধরিলেন। নীলকমল তদ্দর্শনে জিজ্ঞাসা করিল, "যাত্রা হচ্ছে কোথায়?"

বাবু। কালীবাড়ীর কাছে।

নীল। কালীবাড়ীর বড় কাছে?

বাবু। হাঁ।

নীলকমল বাবুর উত্তর শুনিয়া কহিল, "তবে আপনি যান—আমার যাওয়া হবে না।"

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন যাওয়া হবে না?"

নীল। যার পাথরের চোক থাকে, সে যেন কালীবাড়ী দু-বার যায়। আমার মাংসের চোক, আমি আর সেখানে যাবো না।

বাবু। কেন বল দেখি?

নীলকমল কহিল, "মহাশয়, আমি যখন প্রথম দিন এলাম, তখন এক হাটের লোক ধর্ ধর্ ক'রে পিছু পিছু এসে এক খানার কাছে আমাকে পেড়ে ফেল্লে। কেবল সিন্দুর দেবার জন্যে। আমি আর সেখানে যাই নে। আমার চোক্‌টি যাবার জো হয়েছিল। আর খানিক থাকলেই যেত।"

বাবু হাসিয়া কহিলেন, "আমার সঙ্গে এস, তোমার ভয় নাই।"

নীল। অমন দাদাঠাকুরও বলেছিলেন, কিন্তু বিপদের সময় ত ঠ্যাকাতে পারলেন না। তখন যে রামা মাঝির মতন হাল ছেড়ে ব'সে রলো। হ'ত যদি আমার দেশ, তা হ'লে এক বাঁকের বাড়িতে মাথা ভেঙ্গে দিতাম।

বাবু। তোমার দাদাঠাকুরও ত তোমার মতন সহুরে লোক, তা তোমাকে বাঁচাবে কি ? তুমি আমার সঙ্গে এস, কোন ভয় নাই।

নীল। দাদাঠাকুর সহুরে লোক মন্দ কি! সে কেষ্টনগরে থাক্‌তেই কত গাড়ী দেখেছিল।

বাবু। গাড়ী দেখলেই সহুরে হ'ল ? এখন তুমি যেতে হয় ত চল। না যাও বলো, আমি যাই।

নীলকমলের যাবার খুব ইচ্ছা, অথচ কালীবাড়ীর কাছে, ভয়ে সহজে স্বীকার হয় না। ক্ষণকাল এক স্থলে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিয়া কহিল, "কোন ভয় নেই ত, এই বেলা ঠিক ক'রে বলো।"

বাবু উত্তর করিলেন, "আর কত বার বল্‌বো।"

নীলকমল বাবুর কথায় ভর করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। যাত্রার স্থলে গিয়া নীলকমল এক বার ঝাড় লণ্ঠনের দিকে চায়, এক বার যাত্রাওয়ালাদের দিকে চায়, মাঝে মাঝে উপস্থিত লোকজনের দিকে চায়। এবং যা দেখে, তাহারই সম্বন্ধে বাবুকে প্রশ্ন করিতে লাগিল। বাবু ক্ষণকাল পরে বিরক্ত হইয়া গেলেন। বেলাও বেশী হইতে লাগিল, কাছারি যাইতে হইবেক, এ জন্য বাবু নীলকমলকে কহিলেন, "চল তবে এখন যাই।"

নীলকমল কহিল, "আমি যেখানে এক বার এসেছি, যাত্রা শেষ না হ'লে আর যাব না।"

বাবু নীলকমলের কথা শুনিয়া প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন নীলকমল, পথ চিন্‌তে পারবে ত ?"

নীলকমল উত্তর করিল, "না চিনি, এত লোক আছে, জিজ্ঞাসা করলেও ব'লে দেবে না ?"

"কি জিজ্ঞাসা করবে বলো দেখি ?"

"কেন, বাবুর কথা।"

"কোন্ বাবু ?"

"যে বাবু কাছারি কাজ করে।"

বাবু হাসিয়া কহিলেন, "তা হ'লেই তুমি আমার বাড়ী পঁহুছাবে আর কি ?"

নীলকমল কহিল, "কেন ? হাসলে যে ? আর কি কেউ কাছারি কর্ম্ম করে না কি। এখানে ক'টা কাছারি। আমাদের গাঁয় ত একটা বৈ নেই।"

বাবু কহিলেন, "তার হিসাব ত এখন দিতে পারি নে। মোদ্দা যদি আমার বাড়ী যেতে চাও, তবে রামেশ্বর বাবুর বাড়ী কোথায়, ব'লে জিজ্ঞাসা ক'রো।"

নীলকমল রামেশ্বর বাবু রামেশ্বর বাবু মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিল। রামেশ্বর বাবুর নাম মুখস্থ করিয়া নীলকমলের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, কা'র যাত্রা হইতেছে, এটি নিশ্চয় করা। নিকটস্থ একজন লোককে দু-বার জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু উত্তর না পাইয়া তার গা টিপিল। টিপুটি বড় সহজ টিপ নয়। টিপ খাইয়া সেই লোকটি "উঃ, কে রে" বলিয়া নীলকমলের মুখের দিকে চাহিল।

নীলকমল তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কা'র যাত্রা হচ্ছে ?" সে কহিল, "তা কি লোকের গা না-টিপে জিজ্ঞাসা করলে হয় না ?"

নীলকমল কহিল, "এত চটো কেন ভাই ! যদি তোমার ব্যথা লেগে থাকে, তুমি আমাকে নয় একটা টিপ দাও।"

"গোল মৎ কারো গোল মৎ করো" একজন খোট্টা দাঁড়াইয়া কহিল।

নীলকমলের আর কাহারও কাছে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয় না। এমন সময় দু-জন লোক গান শুনিয়া উঠিয়া যাইতেছে। নীলকমলের নিকটবর্ত্তী হইয়া একজন অপর জনকে কহিল, "আর গোবিন্দ অধিকারীর সে কাল নাই।" নীলকমল যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। তখন ভাবিতে লাগিল, "গোবিন্দ অধিকারীর সঙ্গে ত আমার আলাপ আছে। একবার চোকচোকি হ'লে হয়। তা হ'লেই আমাকে ডাক্‌বে, আর আমি আসরে গিয়ে ব'সবো। এ ব্যাটার গায়ে হাত দিয়ে ডেকেছি ব'লে চটে গেল, আসরে গিয়ে ব'সলে ব্যাটা টের পাবে—আমি একজন যে-সে নই।" এইরূপ চিন্তা করিয়া নীলকমল এক বার ডান দিকে চেয়ে থাকে, এক বার বাঁ দিকে বেঁকে চেয়ে থাকে, কিন্তু চোকচোকি আর হয় না। অগ্রে যাইবারও আর জো নাই। নীলকমল এক স্থানে দাঁড়াইয়া ক্ষণেক এ দিক্, ক্ষণেক ও দিক বেঁকিতেছে, এমন সময় যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সকলে বাহিরে যাইতে লাগিল, গোল অনেক চুকিয়া গেল। নীলকমলের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, নীলকমল আসরে গিয়া বসিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

আশা মরীচিকা

বিধুভূষণ কিয়ৎকাল কালীঘাটে থাকিয়া তিনিও যাত্রার দলের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু যেখানে যান, সেইখানেই শুনেন, হয় ত তাহাদের বাদ্যকরের দরকার নাই, অথবা ভাল বাদ্যকরের বেতন দিবার ক্ষমতা নাই। কালীঘাটে যদিও আহারের ভাবনা নাই বটে, কিন্তু বিধুভূষণের বস্ত্রাদি এরূপ মলিন হইয়া গেল যে, তাঁহার আর কোন স্থানে যাইবার জো রহিল না। তাঁহার পাণ্ডা-বন্ধু তাঁহাকে তাহার নিজের ব্যবসা গ্রহণ করিতে উপদেশ দিল। কিন্তু বিধুভূষণ নূতন লোক, সকল স্থান ভাল করিয়া চিনেন না। অধিকন্তু কালীঘাটে থাকিয়া মিথ্যা কথা বলা ও প্রবঞ্চনা করা অপেক্ষা অধিক পাপ আর

নাই, এই সমস্ত ভাবিয়া পাণ্ডার উপদেশ গ্রহণ করিলেন না।

এক দিবস একাকী বসিয়া বিধুভূষণ নিজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতেছেন। "পূর্ব্বেই বা কি ছিলাম, এখনই বা কি হইয়াছি। শরীরে সামর্থ্য মাত্র নাই। যেখানে বসিয়া থাকি, সেইখানেই থাকিতে ইচ্ছা করে, মনে উৎসাহের চিহ্নও নাই, বস্ত্রাদি দেখিলে আর ব্রাহ্মণ কেহই কহিবে না, বাড়ীর খবর পাইলাম না, পত্র লেখি—তাহারও জবাব পাই না, পথে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল, সেই বা কোথায়? আমার অদৃষ্টেই বুঝি এমনি যে, যাহার সহিত আমার সংস্পর্শ হইবে, তাহার আর সুখ হইবে না। আহা, সরলার যদি অন্য কাহারও সহিত বিবাহ হইত, তাহা হইলে আর কোন সুখ হউক বা না হউক, অনাহারে থাকিতে হইত না।" সরলার কথা মনে হইয়া বিধুভূষণের চক্ষু হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রুপাত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে শশিভূষণ ও প্রমদার কথা মনে হইয়া তাঁহার চেহারার আর এক প্রকার ভাবান্তর হইল। চক্ষু লাল হইল। মুখভঙ্গি ভীষণাকার হইল, এবং দক্ষিণ হস্ত দৃঢ় মুষ্টিবন্ধ হইল। পুনরায় গদাধরচন্দ্র ও তদীয় জননীর কথা মনে হইয়া মুখে ঈষৎ হাস্য উপস্থিত হইল।

মুখমণ্ডল হৃদয়ের দর্পণস্বরূপ। অন্তঃকরণে যখন যে ভাবের উদয় হয়, মুখে অবিলম্বে তাহা প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। অন্তঃকরণে দুঃখ উপস্থিত হইলে মুখ ম্লান হয়: সুখ উপস্থিত হইলে মুখ প্রফুল্ল হয়। অন্তঃকরণে রাগের কারণ সঞ্চার হইলে চক্ষু আরক্তবর্ণ হয়, ওষ্ঠাধর কাঁপিতে থাকে ও দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত হয়। ফলতঃ চিত্ত যখন যে রসে অভিষিক্ত থাকে, মুখমণ্ডলে তখনই তাহার প্রতিবিম্ব পতিত হয়। সুতরাং মনুষ্যের মুখ জীবদ্দশায় নিয়তই বিকৃত ভাবে থাকে। স্বাভাবিক কাহার কেমন মুখ, তাহা মৃত্যুর পরে ব্যতীত জানা যায় না।

অতি অল্প ক্ষণের মধ্যেই বিধুভূষণের মুখে দুঃখ, রাগ ও কৌতুকের চিহ্ন দর্শন করিয়া তাঁহার পাণ্ডা-বন্ধু কহিল, "কি হে পাগল হইবার উদ্যোগ কর্‌তেছ না কি?"

বিধুভূষণ চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, সুতরাং পাণ্ডা-বন্ধু নিকটে আসিয়াছে, তাহা টের পান নাই। এ জন্য তাহার কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "হাঁ, কি বল্‌ছো?"

পাণ্ডা। এমন কিছু না, পাঁচালি শুনবে? আমাদের দেশের এক দল পাঁচালিওয়ালা এসেছে। চল, আজ পাঁচালি হবে, শুনে আসি।

বিধুভূষণ সর্ব্বক্ষণই প্রস্তুত। বলিবা মাত্রই তাহার সঙ্গে চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া পাণ্ডা কহিল, "তুমি যে বলেছিলে, কোন যাত্রার দলে চাকরি করবে। এই ত উপস্থিত আছে, করো না কেন?"

বিধুভূষণ আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ কৈ?"

পাণ্ডা কহিল, "যেখানে আমরা পাঁচালী শুনতে যাচ্ছি, সেইখানেই আছে। আমার সঙ্গে দলের অধিকারীর দেখা হয়েছিল। তার বাড়ী আমাদের গ্রামে।

তাদের যে এক জন বাদ্যকর আছে, সে ত একে ভাল বাজাইতে পারে না, আবার তার উপর মদ খায়। নূতন দল, এক সময়ে এক জন ভাল লোক না রাখলে নাম হবে না। এই জন্য আমাকে বলেছিল, 'যদি তোমার কোন আলাপী লোক থাকে, সঙ্গে করে নিয়ে এস। কিন্তু এক বন্দোবস্ত করতে হবে। তারা এখন মাইনে দিতে পারবে না। যা পায়, তার বখরা দিতে প্রস্তুত আছে।"

বিধুভূষণের মন—এখন হ'লেই হয়, বখরাই দিক, আর মাইনেই দিক। এই কথা সাঙ্গ না হইতে হইতে তাহারা পাঁচালির দলে গিয়ে উপস্থিত হইল। আর দুই ঘণ্টা বাদ পাঁচালি আরম্ভ হইবেক। পাণ্ডা দলের কর্ত্তাকে কহিল, "এই তোমার লোক এনেছি।"

বিধুভূষণের বেশভূষা দেখিয়া দলের কর্ত্তার কিছু অভক্তি হইল, কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া বিধুকে কহিল, "আপনি একবার বাজান দেখি ?" এই বলিয়া এক জোড়া তবলা তাঁহার কাছে দিল। বিধুভূষণ বাজাইলেন। পাঁচালিওয়ালা বড় ধূর্ত্ত। মনে মনে পছন্দ হইয়াছে, কিন্তু প্রকাশে বলিলে পাছে বেশী দর হইয়া যায়, এ জন্য মুখ বাঁকাইয়া কহিল, "হাঁ, চলতে পারে।" পরে পাণ্ডার দিকে মুখ ফিরাইয়া—"বন্দোবস্তের কথা বলেছ ?"

পাণ্ডা কহিল—"হাঁ।"

অধিকারী। তাতেই স্বীকার ?

পাণ্ডা। তাতেই।

অধিকারী। তবে কবে থেকে মিশবেন ?

বিধু। যবে থেকে বলেন।

অধিকারী। তবে আজ।

বিধু। আচ্ছা তাই।

বিধুভূষণের পাঁচালির দলে যাওয়া অবধি যেন দলের অদৃষ্ট ফিরিয়া গেল। অল্প দিবসের মধ্যেই দলের নাম প্রকাশ হইয়া পড়িল, এবং দেশ-বিদেশ হইতে বায়নাপত্র আসিতে লাগিল। "টাকা হইলে লোকের চেহারা ফেরে" সকলেই বলিয়া থাকে, বস্তুত সে কথা যথার্থ, বিধুর এক্ষণে বিলক্ষণ আয় হইল। তাঁহার মলিন বসন দূর হইল, মুখভঙ্গী ভাল হইয়া আসিল, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় চিন্তাশূন্য আর হইল না। পৃথিবীতে অতি অল্প লোকেই ক্রমে ক্রমে প্রাচীন হয়। অধিকাংশই হঠাৎ বিজ্ঞ হইয়া বসে, এমন সর্ব্বদাই দেখা গিয়া থাকে। আজি দিব্য যুবা পুরুষ, অনবরত আমোদ প্রমোদ করিতেছে, কোন ভাবনা চিন্তা নাই, দুঃখ ক্লেশ কাহাকে বলে জানে না, দেখিলে বোধ হয় যেন চিরকালই তার এই ভাবেই কাটিয়া যাইবে ; এমন সময়ে তাহার পিতা কিম্বা মাতা কিম্বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাল হইল। আর সে প্রফুল্ল মুখে হাসি নাই, সে ক্রীড়া কৌতুকে আসক্তি নাই। একেবারে সমুদয়ই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এক রাত্রিতে বৃদ্ধ হইয়াছে। বিধুভূষণ পৃথক্ হইবার দিন অবধিই বিজ্ঞ হইয়াছেন।

টাকা হাতে পাইবা মাত্রেই বিধুভূষণ সরলাকে পত্র লিখিলেন এবং কিছু খরচ পাঠাইয়া দিলেন। লেখাপড়ায় তাদৃশ পারদর্শিতা না থাকা প্রযুক্ত একখানা পত্র লিখিতে কত কাগজই নষ্ট করিলেন। এক বার অক্ষর মনোমত হইল না, সেখান ফেলিয়া দিলেন। আর এক বার কথা ভাল লাগিল না, সেখানও ফেলিয়া দিলেন। এক বার খানিক কালি পড়িয়া গেল, সেখানিও নষ্ট হইল। শেষের খানি ভাল হইল। প্রফুল্লচিত্তে আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। সরলা পাইয়া যে কত আহ্লাদিত হইবে, সেই ভাবিয়া বিধুর আর আহ্লাদের সীমা নাই। চক্ষু হইতে দুটি মুক্তাফল বর্ষণ হইল। বিধু আহ্লাদে অশ্রুপাত না করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না।

চিঠিখানি ডাকঘরে রেজিস্টারি করিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

ঐ ডাকঘরে চিঠির জবাব আসিবে। বিধুভূষণের নিকট ডাকঘর তীর্থস্থান হইয়া উঠিল। রোজই এক এক একবার যান। "কিন্তু সরলা ত লিখিতে জানে না?" বিধুর ভাবনা হইল, "কে চিঠি লিখিয়া দিবে? গোপাল এত দিন চিঠি লিখিতে শিখিয়াছে, গোপাল লিখিবে।"

প্রত্যহই ভাবিয়া যান, আজ চিঠি আসিবে, কিন্তু আইসে না।

আশা! ধন্য তোমার ছলনা, ধন্য তোমার কুহকিনী শক্তি! তুমি কি না করিতে পার? তোমার ন্যায় আর কে প্রবোধ দিতে পারে? তুমি মুমূর্ষুকে বলবান্ করিতে পার, অন্ধকে দর্শন করাইতে পার, পঙ্গু দ্বারা গিরি লঙ্ঘন করাইতে পার, তুমি অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পার। কিন্তু তোমার ন্যায় বিশ্বাসঘাতিনীও আর কেহ নাই। তোমার রূপ দেখিয়াই লোকে ভুলিয়া যায়। তোমার চরিত্র কেহ অনুসন্ধান করে না। যাহাকে তুমি বারম্বার প্রবঞ্চনা করিয়াছ, সেও তোমার মায়াজাল হইতে মুক্ত হইতে পারে না।

বিধুভূষণও ডাকঘরে যাইতে ক্ষান্ত হন না, কিন্তু চিঠিও আইসে না। প্রত্যহই আশা করিয়া যান, প্রত্যহই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসেন। এক দিবস পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "আপনার চিঠি পৌঁছিয়াছে, রসিদ আসিয়াছে।"

বিধুভূষণ আগ্রহ-সহকারে কহিলেন, "কৈ? কৈ? দেখি।" পোষ্টমাষ্টার পুস্তক খুলিয়া দেখাইয়া দিলেন। লেখা রহিয়াছে, "গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

বিধু হর্ষোৎফুল্লনেত্রে অনেক ক্ষণ একদৃষ্টে নামটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে পোষ্টমাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এ কাগজখানা আমাকে দিতে পারেন?"

পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "এখানা আমার রসিদ। এখানা হস্তান্তর করিবার হুকুম নাই।"

বিধুভূষণ সতৃষ্ণনয়নে আরও ক্ষণকাল নামটি নিরীক্ষণ করিয়া আর্দ্র চক্ষু বস্ত্রদ্বারা মার্জ্জনা করিয়া ডাকঘর হইতে চলিয়া আসিলেন।

বিধুভূষণের মন অদ্য ইতিপূর্ব্বের কয়েক দিবস অপেক্ষা অনেক ভাল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

নীলকমল ও বিধুভূষণের পুনর্ম্মিলন

হুগলী জেলার অন্তর্গত দেবীপুরে বারইয়ারি পূজায় যাত্রা, পাঁচালি, কবি ইত্যাদি বায়না হইয়াছে। বৈকাল হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত পাঁচালি হইয়া গেল। সকলেই পাঁচালি শুনিয়া প্রশংসা করিল। কিন্তু তাহার গানে যত মোহিত না হইল, বাজনা শুনিয়া তদপেক্ষা অধিক প্রীতি লাভ করিল।

এ দলে বিধুভূষণ বাদ্যকর।

শেষরাত্রে যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। সকলেই যাত্রা শুনিতে বসিয়াছে। বিধুভূষণের দলের সকলে প্রাতঃকালে গান শুনিতে গেল। বিধুভূষণও সেই সঙ্গে গেলেন। তাঁহারাও উপস্থিত হইলেন, আর সঙের বাজনা বাজিয়া উঠিল এবং যাত্রার দল হইতে একটি কচি, কৃশকায়, ছিটের ইজের-চাপকান-পরা রাম উঠিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল, "বাছা হনুমান্—বাছা হনুমান্।" দুই চারি বার ডাকিয়া চুপ করিল। পুনরায় "বাছা হনুমান্—বাছা হনুমান্।" রামটি এমনি কৃশ ও দুর্ব্বল যে, এক এক বার বাছা হনুমান্ বলিয়া ডাকিতে তাহার আপাদমস্তক পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছে, গলায় শির উঠিতেছে এবং মুখ কালির বর্ণ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু তথাপি হনুমানের দয়া হয় না। হনুমান্ এসেও আসে না। রামের এ দিকে চক্ষু ভাঙ্গিয়া আসিতেছে। লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, এঁরা ম'রে আসরে প'ড়ে ঘুম দিচ্ছেন। রাম বেচারার হিংসা হচ্ছে। মরিতে পারিলেই একটু ঘুমাইয়া বাঁচে। কিন্তু হনুমান্ না এলে ত যুদ্ধ আরম্ভ হইতে পারে না? হনুমান্ও আইসে না। দল হইতে একজন তানপুরা ফেলিয়া দৌড়িয়া হনুমান্কে আনিতে গেল।

পাঠকবর্গ, চলুন দেখি সাজঘরে হনুমান্ কি করিতেছে।

নীলকমল গোবিন্দ অধিকারীর দলে গিয়াছিল, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু নীলকমলের বিদ্যা বুদ্ধি দেখিয়া, গোবিন্দ অধিকারী তাহাকে নিজে না রাখিয়া, আর এক রামযাত্রার দলে সুপারিশ করিয়া দিয়াছিল। নীলকমল চারি টাকা বেতন পায়, আর তামাক সাজে, মন্দিরে বাজায়, দু-এক বার বা বেহালারও কান মোড়া দেয়। কি করে? বিদেশে চাকরি মেলে না। যা পেয়েছে, তাই করিতেছে। কিন্তু এত দিন তাহাকে কেহ সঙ সাজিতে বলে নাই। আজ আর অন্য লোক নাই, সুতরাং অধিকারী নীলকমলকে হনুমান্ সাজিতে বলিয়াছে। নীলকমল ইহাতে অত্যন্ত রাগত হইয়াছে। চক্ষু লাল করিয়া কহিল, "আমার সঙ্গে এমন কোন বন্দোবস্ত ছিল না যে, আমি সঙ সাজবো। আর যদিও সাজি, তবে রাজা সাজবো কিম্বা আর কিছু সাজবো, আমি হনুমান্ সাজতে পারবো না।"

অধিকারী কহিল, "এতে দোষ কি? যাত্রার দলে সঙ ত সকলেই সেজে থাকে। আর যদি সঙ সাজতেই হয়, তবে হনুমান্ই বা কি, আর রাজাই বা কি?"

নীলকমল। না, আমি হনুমান্ হয়ে মুখে চূণ কালি দিয়ে কলা খেতে খেতে অত লোকের মধ্যে যেতে পারবো না। আমাকে এতে চাই রাখো বা না রাখো।

অধিকারী মহাবিপদে পড়িল। এ দিকে "বাছা হনুমান্, বাছা হনুমান্" করিয়া রামের স্বরভঙ্গ হইবার জো হইয়াছে। এজন্য অধিকারী কহিল, "তোমাকে এখন অবধি ৫ টাকা করিয়া বেতন দেওয়া যাইবেক, যদি হনুমান্ সাজো।"

নীলকমল সম্মত হইল, কিন্তু তথাপি লজ্জায় আসরে আসিতে পারিতেছে না। দু-এক জন লোক গিয়া হনুমানরূপী নীলকমলকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিল।

রাম কহিল, "কি বাছা হনুমান্, এত ক্ষণে এলে ?"

নীলকমল "হাঁ প্রভু, এলাম" বলিয়া উত্তর করিবে, এমন সময়ে বিধুভূষণকে দেখিতে পাইল। রাস্তায় সর্প দেখিলে পথিক যেমন চমকিয়া উঠে, নীলকমল তেমনি চমকিয়া উঠিল। নীলকমল ভাবিল যে, বিধুভূষণ সকলই টের পাইয়াছেন, গোবিন্দ অধিকারীর দলে মিশিতে পারে নাই, তাহাও জানিতে পারিয়াছেন, এখন যে কি অবস্থায় কি বেতনে আছে, সকলই অবগত হইয়াছেন।

নীলকমল এই সমস্ত মুহূর্ত্তমধ্যে ভাবিয়া, রামের কথায় আর জবাব না দিয়া, সভাস্থ লোকের নিকট জোড়হাতে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "মহাশয়, আমাকে জোর ক'রে হনুমান্ সাজায়েছে।"

হনুমানের কথা শুনিয়া সভাস্থ সমুদায় লোক হাসিয়া উঠিল। নীলকমল পূর্ব্ববৎ উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "আপনারা আমার কথায় কি বিশ্বেস করলে না। আমি দিব্বি ক'রে বল্‌তে পারি, আমি হনুমান্ না, আমার নাম নীলকমল, বাড়ী রামনগর, আমাকে জোর ক'রে হনুমান্ সাজায়েছে।"

সভাস্থ লোক আরও বেশী হাসিয়া উঠিল। নীলকমল লজ্জিত হইয়া বসিল।

রাম ডাকিলেন, "বাছা হনুমান্ !"

নীল। কে তোর হনুমান্ ? আমাকে অমন হনুমান্ হনুমান্ করলে তোর ভাল হবে না।

রাম। (অধিকারীর পরামর্শে) হনুমান্, এ যুদ্ধ বিপদ্ হইতে রক্ষা কর।

নীল। ফের তুই হনুমান্ হনুমান্ করছিস্ ? তোর যুদ্ধ হ'ল না হ'ল, তাতে আমার কি ?

অনেক খোশামোদের পর নীলকমল যুদ্ধে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিল। কিন্তু সে সাহায্য নাম মাত্র। রাম ধনুকে বাণ যেই ধরিল, আর অমনি পঞ্চত্ব পাইল। একটু পরে গান ভাঙ্গিয়া গেল। নীলকমল মুখোশ ফেলিয়া দিয়া অধোবদনে বসিয়া

আছে। বিধুভূষণ নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীলকমল, কোথা থেকে এখানে জুট্‌লে ?"

নীল। আরে যাও ঠাকুর, তোমার কথায় কাজ নাই। ওরাই নয় হেসে উঠলো, আমাকে চিনতে পারে না। কিন্তু তুমি কেমন ক'রে হাস্‌লে ? তুমি ত আমাকে চিনতে, তুমি কেন দুটো কথা ব'লে দিলে না।

বিধুভূষণ কহিলেন, "নীলকমল, আমি ত—তুমি নীলকমল নও ভেবে হাসি নি। তোমার কথায় হাসি এলো।"

নীল। আমার কথায় হাসি এলো কেন ? আমি কি পাগল ?

বিধু। আমি ত বল্‌ছি না যে, তুমি পাগল।

নীল। আমি আর এ দলে থাকবো না।

বিধুভূষণ কহিলেন, "নীলকমল, তুমি আমাদের সঙ্গে চল। আমাদের পাঁচালির দল, সেখানে সঙ সাজা নেই, সেই বেশ হবে ! তুমি এখানে কত বেতন পাও ?"

নীলকমল ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "৬ টাকা।" নীলকমল দু-টাকা বেশী করিয়া বলিল। এ রোগ অনেকেরই আছে, খালি নীলকমলের নয়।

বিধুভূষণ এক্ষণে দলের প্রধান হইয়াছেন বলিলে হয়। এ জন্য তিনি কহিলেন, "তবে তোমার কাপড়-চোপড় নিয়ে এস। আর যা পাওনা থাকে, তাও নিয়ে এস। আমরা তোমাকে ৬ টাকা মাইনে দেবো।" এই বলিয়া বিধুভূষণ চলিয়া গেলেন।

নীলকমল মনে করিল, "যদি আর দু-টাকা বেশী ক'রে বলিতাম, তাহা হলেও ত পেতাম। আহা হা ! আমি বোকামি করেছি।"

নীলকমল মনস্তাপে বাসায় ফিরিয়া গেল। দলের কর্ত্তার নিকট কহিল, "আমার মাইনে হিসাব ক'রে দাও. আমি আর তোমার সঙ্গে থাকবো না।"

দলের কর্ত্তাও নীলকমলের উপর বড় চটিয়া ছিল। সুতরাং মাহিয়ানা হিসাব করিয়া দিতে আর কোন আপত্তি করিল না। নীলকমল মাহিয়ানা ও বেহালাটি লইয়া পাঁচালির দলে আসিল।

নীলকমল পাঁচালির দলে আসিয়া বিধুভূষণকে ডাকিয়া কহিল, "দাদাঠাকুর, আমি চল্লাম।"

বিধুভূষণ কহিলেন, "কোথায় ?"

নীলকমল। যে দিকে পা চলে।

বিধুভূষণ। তার মানে কি নীলকমল ?

নীলকমল মুখ আঁধার করিয়া উত্তর করিল, "আর আমার এ জীবনে কাজ কি ? দেশে থাকতে পারলাম না। বিদেশে এলাম, এখানেও সুখ হ'ল না। এখন চল্লাম—যে-দেশে আলাপী লোকের মুখ দেখ্‌তে না পাই, সেই দেশে যাই।"

বিধু। কেন, কেন, এই ত তুমি বল্লে—আমাদের দলে থাক্‌বে। আমি সকলকে ব'লে ঠিকঠাক্ করলাম। এখন আবার এমন কথা বল্‌ছো কেন ?

নীল। এখানে যদি থাকি, তোমরা আমাকে নিয়ে কত হাসিঠাট্টা করবে; আমার তা বরদাস্ত হবে না। হয় ত আমায় হনুমান্ ছাড়া আর কিছু বলবেই না। রাস্তায় আসতে কতকগুলা ছেলে আমার পাছে লেগে গেল। সদু মিস্ত্রী যেমন বলতো—"কাগের পাছে ফিঙেগ লাগে," তেমনি সকলেই আমাকে হনুমান্ হনুমান্ ব'লে ডাকে। আমি ত আসছিলাম তোমাদের দলে থাকবার জন্য, কিন্তু এমন করলে ত আর থাকা হবে না।

বিধুভূষণ কহিলেন, "নীলকমল, এখানে তোমাকে হনুমান্ ব'লে কেউ ডাকবে না।" এই কথা বলিবার সময় বিধুভূষণের মুখে একটু ঈষৎ হাসি দেখা দিল।

নীলকমল তাহাতেই রাগত হইয়া কহিল, "ঐ ঠাকুর তুমিই বলছো, তার আর অন্যে কি ছাড়বে ?"

বিধুভূষণ কহিলেন, "কৈ, আমি ত তোমাকে তা ব'লে ডাকি নাই।"

নীলকমল কহিল, "তবে দিব্বি ক'রে বলো, আর ও-কথা মুখে আনবে না।"

বিধুভূষণ। আচ্ছা, দিব্বি ক'রেই বল্লাম। এখন হ'ল ত।

নীল। হ'ল বটে, কিন্তু তুমি যেন না বল্লে, আর সকলে ছাড়বে কেন ? তারা ত "বেঁধে মারে সয় বড়" তা ত বুঝবে না। আমার যে কত দুঃখ হয়, তারা ত টের পাবে না। দাদাঠাকুর, আমি যদি এ জানতাম, তা হ'লে কি আমি কখন রামযাত্রার দলে যেতাম ?

বিধুভূষণ কহিলেন, "আচ্ছা, তুমি এইখানে ব'সো, আমি গিয়া সকলকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে আসি, তার পর তোমাকে নিয়ে যাব।" বিধুভূষণ এই বলিয়া ঘরের মধ্যে গেলেন। নীলকমল বিধুভূষণের কথায় অনেক আশ্বাসিত হইয়া অপেক্ষাকৃত প্রফুল্লচিত্ত হইল। এবং ঘুন্ ঘুন্ করিয়া "পদ্মআঁখি আজ্ঞা দিলে, পদ্মবনে আমি যাব" ইত্যাদি গাইতে লাগিল।

নীলকমল তিন চারি ফেরতা "পদ্মআঁখি" গাইল। এমন সময় বিধুভূষণ ফিরিয়া আসিলেন।

নীলকমল ঘুন্ ঘুন্ না ছাড়িয়া ইসারার দ্বারায় জিজ্ঞাসা করিল, খবর কি ?

বিধুভূষণ অনেক দিবসের পর পদ্মআঁখির গান শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া নীলকমলের দিকে অগ্রসর হইলেন। বিধুর হাসি দেখিয়া নীলকমলের চেহারা গরম হইল। বিধু কহিলেন, "নীলকমল, এবার আমার দোষ নাই, তুমি যদি নিজেই হনুমান্ স্বীকার করো, তবে আর লোকের অপরাধ কি ?"

নীলকমল কহিল, "কৈ আমি স্বীকার করলাম ?"

বিধুভূষণ কহিলেন, "ঐ গানই ত সকল দোষের মূল। ও গানটার মানে জান?"

নীলকমল কহিল, "আমি জানি না-জানি তোমার কি, তোমার কাছে যখন জিজ্ঞাসা করবো, তখন ব'লে দিও।"

বিধুভূষণ কহিলেন, "নীলকমল, রাগ ক'রো না। রামচন্দ্র যখন রাবণ বধ করবার জন্য দুর্গোৎসব করেন, তখন নীলপদ্ম কে আনবে, এই কথা ওঠায় হনুমান্ স্বীকার হ'ল, তাই ঐ গানটা হয়েছে। 'পদ্মআঁখি আজ্ঞা দিলে পদ্মবনে আমি যাবো, আনিয়া নীল পদ্ম সে নীল পদ্ম চরণপদ্মে দিব'।"

নীলকমল বিস্মিত হইয়া কহিল, "বটে।"

বিধুভূষণ কহিলেন, "আমি ত ঠিক ক'রে এলাম, তোমাকে কেউ কিছু বল্‌বে না। কিন্তু তোমাকে একটা কথা ব'লে দি, তুমি আর কখন পদ্মআঁখির গান গেও না। ওটা শুন্‌লেই লোকের মনে হবে।"

নীলকমল কহিল, "আচ্ছা, আজ অবধি ত্যাগ করলাম।"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

"শ্যামা কার কি করেছে?"

বিধুভূষণের বাটী হইতে যাত্রা করিয়া বিদেশে গমন অবধি চারি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।

যতই দিন যায়, সরলা ততই উৎকণ্ঠিতা হন। এক মাস, দু-মাস, তিন মাস, এই প্রকারে চারি বৎসর অতিবাহিত হইল, তথাপি বিধুভূষণের কোন পত্রাদি পান না। সরলা—এমন দেবতা নাই, যাঁহার উপাসনা করেন নাই, এমন উচ্চ স্থান নাই, যেখানে মাথা খোঁড়েন নাই। ভাবনায় সরলার শরীর শীর্ণ হইয়া গেল। সরলা এক স্থানে বসিলে আর উঠেন না, কেহ পূর্ব্বে কথা না কহিলে কাহারও সহিত কথা কন না। তাঁহার অন্নে রুচি নাই, রাত্রিতে নিদ্রা নাই। শীতকালে শরীরের ঘর্ম্মে শয্যা ভিজিয়া যায়। তাঁহার শরীর যতই শীর্ণ হইতে লাগিল, মুখের শ্রী ততই বাড়িতে লাগিল। বৈকাল হইলে চক্ষু ঈষৎ রক্তবর্ণ হয় ও মুখ আরও টল্‌টলে দেখায়, সরলার শরীরে যক্ষ্মার সূত্রপাত হইয়াছে।

এত কাল পর্য্যন্ত শ্যামার যে টাকা ছিল, তাহাতেই এক রকমে চলিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে সে বল ফুরাইয়া আসিল। সরলার ভাবনারও বৃদ্ধি হইল। পতি বিদেশে, তাঁহার কোন খবর নাই, ঘরে অন্ন নাই। সরলার পীড়াও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এমন ক্ষীণ হইলেন যে, বসিলে আর সহজে উঠিতে পারেন না। শ্যামা তখন উভয়ের মাতা স্বরূপ হইল। প্রাতঃকালে উঠিয়া গোপাল ও সরলা উভয়ের সেবা-শুশ্রূষা করিয়া পাড়ায় বাহির হয়। কোন বাড়ীতে কাজকর্ম্ম করিয়া দিয়া আপনার আহারের জন্যে যাহা পায়, আনিয়া গোপালকে ও সরলাকে খাওয়ায়; পরে নিজে আর এক বাড়ী হইতে খাইয়া আইসে; ঘরে আর এমন জিনিসপত্র

কিছুই নাই যে, বিক্রয় করিলে দু-দিন চলিতে পারে। শ্যামা এক্ষণে পরিবারের জীবন স্বরূপ।

শশিভূষণ সপরিবারে এক্ষণে নূতন বাটীতে গিয়াছেন। গোপাল কোন স্থানে গেলে সরলাকে একাকিনী বাটীর মধ্যে থাকিতে হইত। প্রথম প্রথম একাকিনী থাকিতে সরলা কোন ভয় পাইতেন না, কিন্তু যত কৃশ হইতে লাগিলেন, সরলার ততই ভয় হইতে লাগিল। কে যেন কোথা হইতে আইসে। সরলা টের পান; কিন্তু আর কেহ টের পান না। শয্যায় শুইয়া মধ্যে মধ্যে চমকিয়া উঠেন। গোপালের এক্ষণে জ্ঞান বুদ্ধি হইয়াছে। দুঃখে পড়িলে অল্প বয়সেই বুদ্ধি পরিপক্ক হয়। গোপাল চুপ করিয়া সরলার শিয়রে বসিয়া থাকে।

সরলা চমকিয়া উঠিলেন। গোপাল জিজ্ঞাসা করিল, "কি মা! অমন করলে কেন?"

সরলা কহিলেন, "না বাবা, কিছু না। গোপাল, বাবা, তুমি এইখানেই ব'সে আছ?"

গোপাল। হাঁ মা; তোমাকে একা রেখে কোথায় যাব?

সরলা। কত ক্ষণ ব'সে আছ? আজ খেলা করতে গেলে না?

গোপাল। এখন ত মা আমি খেলা করতে যাই না।

সরলা ক্ষণেক ক্ষণেক পূর্ব্বের কথা ভুলিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। গোপালের সঙ্গে শেষ কথোপকথনের পর আবার ক্ষণকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিয়া একবার জাগিয়া উঠিলেন, এবং ব্যস্তসমস্ত হইয়া চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন। গোপাল জিজ্ঞাসা করিল, "মা, কি দেখ্‌ছো?"

সরলা। না বাবা, কিছু দেখ্‌ছি না। তুমি এইখানেই ব'সে আছ?

গোপাল। হাঁ মা, আমি ত তোমার বিছানা ছেড়ে কোনখানে যাই নাই।

সরলা। হাঁ হাঁ, আমি ভুলে গিয়েছিলাম। গোপাল, বাবা, আজ কিছু খেলে না।

গোপাল। দিদি পাড়া থেকে ফিরে এলেই খাব।

সরলা। শ্যামা এখনও ফিরে আসে নি? আহা, বাছা আমার কি ক্লেশই পাচ্ছে? সকাল বেলা যায় আর দুপুর বেলা আসে; আবার খেয়ে বেরোয় আর সন্ধ্যে কালে আসে। গোপাল, তুমি আমার কাছে একটা দিব্বি করো দেখি?

গোপাল। কি দিব্বি করবো মা?

সরলা। দিব্বি কর যে, আমি ম'লে তুমি শ্যামাকে কখন অভক্তি করবে না। তুমি আমারে যেমন ভক্তি কর, অমনি চিরকাল শ্যামাকে করবে?

গোপাল। মা, এর জন্যে দিব্বি করতে হবে কেন? আমি কি জানি নে যে, তুমি আমার যেমন মা, শ্যামাও তেমনি।

সরলার চক্ষে মুক্তার ন্যায় অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। সরলা চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। গোপাল নিজের বস্ত্র দ্বারা সরলার চক্ষের জল মুছিয়া দিল।

সরলা এক মুহূর্ত্ত পরে কহিলেন, "গোপাল, বাবা, বালিশ ক'টা উপরে রাখ দেখি, আমি এক বার বসি।"

গোপাল আস্তে আস্তে বিছানায় বালিশগুলি উপর্য্যুপরি রাখিল। সরলা বিছানায় বাহুর ভর দিয়া উঠিয়া বালিশ ঠেস দিয়া বসিলেন। এই পরিশ্রমে চারি পাঁচ বার ঘন ঘন নিশ্বাস বহিল। শ্রান্তি দূর হইলে সরলা কহিলেন, "বাবা গোপাল, একবার এসে আমার কোলে ব'সো দেখি। এখনও শক্তি আছে—এক বার কোলে ক'রে নি, আর দিন-কতক পরে তাও পারবো না।"

গোপাল সরলার দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া অন্য দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। গোপালের কথা কহিবার জো নাই। তাহার চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রুপাত হইতেছে।

সরলা বুঝিতে পারিয়া গোপালের হাত ধরিয়া টানিয়া আপনার বাম দিকে বসাইলেন। গোপাল সরলার বক্ষোপরি শির স্থাপন করিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিল।

সরলা হস্ত দ্বারা গোপালের মুখ ফিরাইয়া অঞ্চল দ্বারা চক্ষু মুছাইয়া দিয়া, হাসিয়া কহিলেন, "ভয় কি গোপাল, আমি কি তোমাকে ফেলে কোনখানে যেতে পারি ? আমি শীঘ্রই ভাল হবো।"

গোপাল পূর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বেগে অশ্রুপাত করতে লাগ্‌ল। সরলা দুই হাত দিয়া গোপালের মস্তক ধারণ করিয়া সস্নেহে বারম্বার শিরশ্চুম্বন করিলেন।

একটু পরে শ্যামা আসিল। বহু কাল পরে সরলার মুখে হাসি দেখিয়া শ্যামার আর আনন্দের সীমা রহিল না। শ্যামা বিছানার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খুড়ী-মা, আজ একটু ভাল আছ না ? রোজ যদি এমন ক'রে একটু একটু গোপালকে কোলে নেও, আর গোপালের সঙ্গে কথা কও, তা হ'লে পনের দিনের মধ্যেই আবার তুমি যেমন মানুষ, তেমনি হ'তে পারো।"

সরলা কহিলেন, "শ্যামা, আজ আমি ভাল আছি। তোমার মত মেয়ে আর গোপালের মত ছেলে কাছে থাক্‌লে যে হতভাগিনী ভাল না থাকে, সে স্বর্গেও ভাল থাক্‌বে না।"

শ্যামার চক্ষে জল টল টল করিতেছে। ঈষৎ মুখ বাঁকাইয়া কহিল, "আবার শ্যামার মতন মেয়ে, শ্যামার মতন মেয়ে করতে লাগলে কেন ? শ্যামা কার কি করেছে ?"

সরলা সজল নেত্রে হাসিয়া কহিলেন, "আমার আপনার মা যা না করেছে, শ্যামা তার বেশী করেছে। এর চাইতে পৃথিবীতে কি আর কারু বেশী করতে পারে ?"

শ্যামা সরলার কথা শেষ না হইতে হইতেই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। শ্যামা নিজের প্রশংসা শুনিতে পারে না। সমাজের খবরের কাগজের মত একটা ভাল কাজ করিয়া বলিয়া বেড়াইতে পারে

না। শ্যামার দান কেহ দেখিতেও পায় না, জানিতেও পারে না। কোন কাগজেও ছাপা হয় না, কোন সভাতেও সে বিষয়ে বক্তৃতা হয় না। কাগজে ছাপান সৎকর্ম্ম সেই কাগজের সঙ্গেই মৃত্তিকাসাৎ হইবে। শ্যামা, তোমার কীর্ত্তি সেই অক্ষয় পুরুষ অক্ষয় কাগজে অক্ষয় অক্ষরে লিখিয়া রাখিতেছেন।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

শশিভূষণের নূতন বাড়ী

শশিভূষণের নূতন বাটীতে গদাধরচন্দ্রের এক ভিন্ন বৈঠকখানা। সুন্দর একটি ছোট ঘর। ঘরের মেঝে জুড়ে একখানি শতরঞ্জি পাতা। শতরঞ্জির উপর তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র একখানি গালিচা পাতা, গালিচাখানি জুড়ে তাহার উপর একখানি জাজিম পাতা। জাজিমের উপর একটি তাকিয়া, তাহার সম্মুখে দুইটা রূপা-বাঁধা হুঁকা বৈঠকের উপর বসান। তাকিয়ার পশ্চাদ্ভাগে একটি আলনার উপর তিন-চারখানি কোকিল-পেড়ে সিমলাই ধুতি কোঁচান, একখানি চাদর ও দুটি পিরান। আলনার নিম্ন থাকের উপর দু-জোড়া জুতা ও আলনার ধারে একগাছি বেতের ছড়ি। আলনার অপর ধারে একটি আম্রকাষ্ঠের সিন্দুক।

অদ্য গদাধরচন্দ্র এখনও এখানে বসিয়া কেন? এমন সময়ে গদাধরচন্দ্র ত কখন বাড়ী থাকেন না? সূর্য্যদেবও অস্ত যাইতে থাকেন, গদাধরচন্দ্রেরও চক্ষু ফুটিতে থাকে। গদাধর একজন নিশাচর বলিলে হয়। কিন্তু আজি গদাধরের মুখ বিরস বিরস বোধ হইতেছে। গদাধর একবার বসিতেছেন, একবার উঠিতেছেন। একভাবে পাঁচ মিনিট থাকিতেছেন না; মাঝে মাঝে জানালা দিয়া রাস্তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। আজি গদাধর কাহারও আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন না কি? কৈ, কেহই ত আসিতেছে না। গদাধরচন্দ্র "দূর হোক্ গে" বলিয়া উঠিয়া আলনার উপর হইতে একখানি কোঁচান ধুতি পরিলেন, একটা পিরান গায়ে দিলেন। তৎপরে পৈতায় ঝুলান চাবিটি লইয়া সিন্দুকটি খুলিলেন। সিন্দুকটি খুলিয়া গদাধর দক্ষিণ হস্ত দ্বারা একটি বোতল বাহির করিয়া লইলেন এবং বাম হস্ত দ্বারা একটি কাচের গেলাস ধরিলেন। বোতল হইতে একটু আরক গেলাসে ঢালিয়া, তাহাতে খানিক জল মিশাইয়া সেবন করিলেন। পান করিয়াই একবার মুখ বক্র করিলেন। এবং অস্পষ্ট স্বরে কহিলেন, "শালা রামঢনা ব্রাণ্ডি ডেবে, তা না ডিয়ে রোম ডিয়েছে।" কিন্তু রোম বলিয়া যে বোতলটি রাখিলেন, তা নয়। তিন চার বার বোতল হইতে ঢালিলেন, তিন চার বার জল মিশাইলেন, এবং তিন চার বার মুখ বাঁকাইয়া "ডান হাতে" করিয়া প্রথম বারের মতন খাইলেন। যখন দেখিলেন, কিন্তু বেশ বোঝাই হইয়াছে, তখন বোতলটির ছিপি বন্ধ করিয়া আলোকের দিকে উঁচু করিয়া ধরিলেন এবং অতি মৃদু স্বরে "এখনও দশ আনার বেশী আছে" বলিয়া পুনরায় তাহাকে সিন্দুকে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিলেন। পরে চাদরখানি

স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া বাম হস্ত দ্বারা কোঁচার অগ্রভাগ এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ছড়িগাছটির মস্তক ধরিয়া বাহির হইলেন।

গদাধরচন্দ্রের বৈঠকখানা হইতে বাহির হইতে গেলে শশিভূষণের বৈঠকখানা দিয়া যাইতে হয়। বড়লোকের বাড়ীর বেড়ালটা পর্য্যন্ত মুরুব্বি; সুতরাং দুই এক জন উমেদার তাঁহার নিকট দরবার করিতে আসিল। গদাধর তাহাদিগকে দুই এক কথা বলিয়া রাস্তার দিকে অগ্রসর হইলেন। দুই চারি পদ গমন করিয়াছেন, এমন সময় রমেশ নামক কনষ্টেবলের সহিত দেখা হইল। রমেশ গদাধরচন্দ্রের সহিত দেখা করিতে আসিতেছিলেন। গদাধরচন্দ্র রমেশকে দেখিয়া কহিলেন, "রমেশ বাবু না কি? টবু ভাল। আমি মনে করেছিলাম, টুমি বুঝি ভুলে গেলে।"

রমেশ কহিল, "যেখানে আসবো বলেছি, সেখানে কি আর ভুল হয়? আমরা পুলিসের লোক, আমাদের যেমন কথা, তেমনি কাজ।"

উভয়ে অল্পে অল্পে আসিয়া গদাধরের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। গদাধর পুনরায় সিন্দুকের চাবিটি খুলিয়া বোতলটি বাহির করিলেন এবং খানিক জল ও আরক মিশাইয়া রমেশের হাতে দিলেন।

রমেশ গেলাসটি হাতে লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

গদাধর। রোম।

রমেশ। জল দিয়াছ না কি?

গদাধর। হাঁ।

রমেশ। তবে ওটা তুমি খেয়ে ফ্যালো। আমি পান্তা ভাত খেতে পারি না। আমরা পুলিসের লোক। গরম জিনিস নইলে আমাদের মুখে ভাল লাগে না।

গদাধর সে গেলাসটি সেবন করিলেন। রমেশ নিজের হাতে এক গেলাস ঢালিয়া লইয়া নির্জ্জলা খাইলেন।

গদাধর বোতলটি আবার সিন্দুকে রাখিয়া দিলেন, রমেশ কহিলেন, "ছুটি দিচ্চ না কি?"

গদাধর কহিলেন, "না। জানি কি, যডি কেউ আসে। ও ঢাকা ঠাকা ভাল।" রমেশ কহিলেন, "তবে আমি আর এক গেলাস একেবারে খাই।" রমেশ কথা কার্য্যে পরিণত করিলেন। গদাধর বোতল বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "টবে এখন কাজের কঠা কও।"

রমেশ কহিলেন, "কাজের কথা যা বলেছি তাই, আমরা পুলিসের লোক, বেশী কথা কই না।"

গদাধর কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, "ডেখ ডেখি ভাই, তোমার কি অন্যায়? আমি সকল করলাম, ঝুকি সমুডায় আমার। টুমি ভাই ফাঁকের ঘরে এসে অটো চাইলে চল্‌বে কেন?"

রমেশ কহিলেন, "আমি আর কত চাইলাম। আজকাল তাদের যে অবস্থা

হয়েছে, আমি যদি বলে দি, তা হ'লে তারাই আমাকে তিন ভাগ দিতে পারে।"

গদাধর। ডেখ ডেখি ভাই, আমার কণ্ট। আজ আবার ডাক হরকরা এসেছিল। চিঠিখানা ডিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি যে চিঠি ন্যান, আপনি তার কে হন ?" আমি বল্লাম, "আমি টার ভাই। ড্যাক ডেখি ভাই, আমি এট মিট্যা কটা কয়ে জাল ক'রে টাকাগুলি কর্‌লাম, টুমি টার টিন ভাগ চাও। আমার পক্ষে টা হ'লে বড় অন্যায় হয়।"

রমেশ। তুমি মিথ্যা কথা বল্লে, জাল করলে সত্যি, কিন্তু তোমাকে শিখালে কে ? তুমি ত পত্র পেয়েই তাদের দিতে যাচ্ছিলে। আমি যদি না পরামর্শ দিতাম, তা হ'লে তোমার ত এক পয়সাও থাকতো না।

গদাধর। টুমি টো পরামর্শ ডেও নি, ডিডিই আমাকে পরামর্শ ডিয়েছিলেন। টোমাকে এ যে ডিচ্ছি, এ কেবল আমার বোকামির জন্যে বৈ ট নয়! টোমাকে না বল্লে কি টুমি টের পেটে ?

রমেশ। আমাকে না বল্লে এত দিন তোমাকে পুলিসে পাকড়া ক'রে ফেল্‌তো। আমিই তোমাকে বল্লাম যে, রসিদে নিজের নাম সই না ক'রে গোপালের নাম সই করো। তা হ'লে আর কোন গোল থাকিবে না। কেমন, এ কথা আমি বলি নাই ?

গদাধর। টা তুমি বলেছিলে বটে, কিণ্টু ডেখ ডেখি, টোমার ডাবিটা অন্যায় কট ? এখন ছ-শ টাকার চার-শ টোমাকে ডিলে আমার ঠাকে কি ? আবার তার মড্যে ঠেকে ডিডিকে ডিটে হবে ?

রমেশ একটু কৃত্রিম বিরক্তি প্রদর্শন করিয়া কহিল, "আমি কিছু চাই নে। যার টাকা, সেই পায়, এই আমার ইচ্ছা। চল, আমার কাছে যা আছে আর তোমার কাছে যা আছে, সমুদায় গোপাল ও গোপালের মা'র কাছে দিয়ে আসি। আমি ও-টাকা চাই নে, কখন চাইও নি। তোমার ইচ্ছা হয়, সমুদায় নেও। আমি যা জানি, তাই করবো এখন।" এই বলিয়া রমেশ বাবু উঠিতে উদ্যত হইলেন।

গদাধর একটু হাসিয়া কহিলেন, "রমেশ বাবু, চট্‌লে না কি ? আমি টো ভাই চট্‌বার কঠা কিছুই বলি নাই। অচ্ছা, যার টাকা, টাকেই ডেওয়া যাবে ; এখন টুমি ব'সো বোটলটা খালি করা চাই টো ?"

রমেশ বসিলেন।

পাঠকবর্গ বোধ হয় টের পাইয়াছেন যে, বিধুভূষণের রেজেস্টরী চিঠিগুলি কোথায় গিয়া পড়িয়াছিল।

বিধুভূষণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, কিঞ্চিৎ টাকার সংস্থান না করিয়া আর দেশে প্রত্যাগত হইবেন না। মাঝে মাঝে বাটীর খরচপত্রের জন্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাঠাইয়া দিতেন। চিঠির কোন জবাব পাইতেন না বটে, কিন্তু গোপালের

স্বাক্ষরিত রসিদ দেখিয়া মনে করিতেন, টাকা সরলার হস্তেই পতিত হইতেছে। গোপাল ছেলেমানুষ, ভাল করিয়া লিখিতে শেখে নাই বলিয়াই তাঁহাকে পত্র লেখে না।

বিধুভূষণের প্রথম চিঠি গদাধরচন্দ্রের হস্তে পতিত হয়। গদাধরচন্দ্র চিঠিখানি খুলিয়া নোট দেখিতে পাইয়া অমনি প্রমদার নিকট গিয়া জানাইলেন। প্রমদা তাঁহাকে রসিদ সই করিয়া চিঠিখানি রাখিতে পরামর্শ দেন। গদাধর নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া পত্র রাখিবেন স্থির করিয়া বাহিরে আসিলেন। নোট পাইয়া গদাধরের আর আহ্লাদের সীমা নাই। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার পরম বন্ধু রমেশ বাবু আসিয়াছেন। গদাধর অবিলম্বে রমেশ বাবুর নিকট চিঠিখানি দেখাইয়া প্রমদার উপদেশের কথা কহিলেন। রমেশ গোপালের নাম লিখিয়া দিতে পরামর্শ দিলেন। গদাধর সেই পরামর্শের বশবর্ত্তী হইয়া গোপালের নাম লিখিয়া দিলেন। বিধুভূষণ কখন গোপালের হস্তাক্ষর দেখেন নাই। তিনি সই দেখিয়া মনে করিলেন, 'এই গোপালের লেখা।"

গদাধরের সহিত রমেশের প্রণয় এই ঘটনা অবধি ঘনীভূত হইতে লাগিল। এই প্রণয়ের উপর নির্ভর করিয়াই শ্যামার নামে নালিশ করিতে গিয়াছিলেন। রমেশ যথার্থই পুলিসের লোক। অপর লোক উপস্থিত থাকিলে গদাধরের সহিত এরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেন যে, সহজে কেহ বুঝিতে পারিত না যে, তাঁহাদের সহিত বড় অধিক প্রণয় আছে।

যত বার রেজেষ্টরী চিঠি আসিয়াছে, গদাধর হস্তগত করিয়াছেন। গদাধরেরা পুরাতন বাটী হইতে নূতন বাটীতে আসিলে রমেশ হরকরাকে নূতন বাড়ী দেখাইয়া বলিয়া দেয়, "ঐ বাড়ীতে সরলা থাকেন।" ডাকমুন্সী ও খোঁয়াড়-রক্ষক এক ব্যক্তিই। সে থানায়ই থাকিত, সুতরাং যখন রেজেষ্টরী চিঠি আসিত, রমেশ জানিতে পারিত।

এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত গদাধর ও রমেশ সমান ভাগ করিয়া টাকাগুলি লইয়াছেন। কিন্তু শেষ চিঠিতে বিধুভূষণ সত্বরে বাটী আসিবেন লিখিয়া দিয়াছেন। চিঠিখানি সকাল বেলা পাইয়া পড়িবার সময় গদাধরের মুখ রক্তহীন হইয়া গেল, এবং হাত কাঁপিতে লাগিল। তদ্দর্শনে হরকরা মনে করিল, কোন বিপদের সম্বাদ আসিয়া থাকিবেক। এই ভাবিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "গোপাল বাবু, এ কার চিঠি?" হরকরা গদাধরকে গোপাল বাবু বলিয়াই জানিত। গদাধর অম্লান বদনে উত্তর করিলেন, "আমার দাদার।"

হরকরা কহিল, "খবর ত ভাল সব?"

গদাধর উত্তর করিলেন, "ভাল।"

সেই চিঠি অবিলম্বে গদাধর রমেশকে দেখান। রমেশ যখন-তখন বলিতেন, "আমরা পুলিসের লোক।" বস্তুতঃই তিনি যথার্থ পুলিসের লোক। চিঠিখানি দেখিয়া তিনি গদাধরের ভয় আরও দশগুণ বাড়াইয়া দিলেন। তখন বন্ধুতা

ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "আমাকে দুই শত টাকা দাও, নচেৎ আমি সমুদায় প্রকাশ ক'রে দেবো।"

গদাধর কহিলেন, "টোমাকে ২০০ টাকা ডেবো কেন ? টুমি কি এর মড্যে নও ? টোমারও যে বিপড, আমারও সেই বিপড।"

রমেশ কহিল, "আমি কি টাকা নিয়েছি যে আমার বিপদ্ ?"

গদাধর আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন. "সে কি রমেশ বাবু ? টুমি কেমন ক'রে বল্লে যে. টুমি টাকা নেও নাই ?"

রমেশ। আমি টাকা নিয়েছি, কে দেখেছে ?

গদা। আমি ডেকিছি।

রমেশ। তুমি আসামী, তুমি ত সকলকে জড়াবেই। তোমার কথা কে বিশ্বাস করে ?

গদাধর অতল জলে পড়িলেন। ঘোর বিপদ্। এখন উপায় ? সর্ব্বসমেত ছয় শত টাকা চুরি করিয়াছেন। তার অর্দ্ধেক রমেশ বাবু লইয়াছেন। বাকি অর্দ্ধেকেরও দুই শত চান।

বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়া রমেশ এক শত টাকায় নামিলেন।

গদাধর এক শত টাকা দিতে রাজী হইয়া বাটী আসিয়াছিলেন। আসিবার সময় রমেশকে বলিয়া আসিয়াছিলেন, "সন্ধ্যার পর একবার আমাডের বাড়ী অবশ্য ক'রে যেও।" রমেশ গদাধরকে বাগে পাইয়া নিজে গম্ভীর হইল ; কহিল, "যদি অবকাশ পাই, তবে যাব। আমরা পুলিসের লোক, আমাদের কি অল্প কাজ ?"

গদাধর বাটী আসিয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় রমেশের নিকট লোক পাঠাইয়াছিলেন। রমেশ আসি আসি বলিয়া সন্ধ্যার সময় আসিলেন। গদাধর রমেশকে তুষ্ট করিবার জন্য এক বোতল রম রামধন শুঁড়ীর দোকান হইতে আনাইয়া রাখিয়াছেন। ব্রাণ্ডির কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু রামধনের পাড়াগেঁয়ে দোকান, সর্ব্বদা ভাল বিলাতী জিনিস থাকে না, এ জন্য রমই পাঠাইয়া দিয়াছিল।

গদাধর কহিলেন, "রমেশ বাবু, ব'সো বোতলটা খালি করা চাই টো ?"

রমেশ বসিলেন, কিন্তু কহিলেন, "আজ আমার শরীরে কিছু অসুখ হয়েছে, বিশেষ আজ বড় কাজ আছে, আর খেলে কাজ ক'রতে পারবো না। এখন কাজের কথা বলো, তা না হ'লে বৃথা ব'সে থাকা।"

গদাধর পৈতা দিয়া রমেশের দুই হাত জড়াইয়া কাতর স্বরে কহিলেন, "রমেশ বাবু, এ বিপড্ ঠেকে আমাকে উড্ডার করো। টোমায় এক-শ টাকা ডিটে হ'লে আর বাঁচি নে। যডি আমার হাটে টাকা ঠাক্‌টো, টা হ'লে টুমি যা চাইটে, আমি টাই ডিটাম, কিণ্টু আমার হাটে একটি পয়সাও নেই।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া গদাধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় রমেশের হাত ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার পা ধরিলেন এবং শ্রাবণের ধারার ন্যায় নেত্রাসার বৃষ্ণ করিতে লাগিলেন।

গদাধরের রোদনে রমেশের হৃদয় কিছু মাত্র আর্দ্র হইল না। কহিল, "ছি

গদাধর বাবু, ও কি ? অমন করো ত আমি এখনই সব কথা ভেঙে দেবো, চুপ ক'রে ব'সে কাজের কথা বলো, আমরা পুলিসের লোক, কত ব্যাটা আমাদের পায় ধ'রে থাকে।"

গদাধর পা ধরিয়াই আছেন। রমেশ ছাড়াইতে পারিলেন না। ক্ষণকাল নিঃশব্দে অশ্রুপাত করিয়া পুনরায় কহিলেন, "রমেশ বাবু, টোমার কি ডয়া মায়া নাই ? আমার ঢন, মান, প্রাণ, সকলই টোমার হাটে। টুমি যদি না রক্ষা করো, টবে আমি আর বাঁচি নে।"

রমেশ (এবার গদাধরকে ঠাট্টা করিয়া গদাধরের স্বরে কহিল) "টোমার মান, ঢন, প্রাণ, সকলই টোমারই হাটে। টুমি যডি না রাখ, টবে আমার সাঢ্য কি আমি রাখি।"

গদাধর। রমেশ বাবু, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা ডিও না।

রমেশ চুপ করিয়া রহিল। গদাধর মনে করিলেন, রমেশের দয়া হইল, পা ছাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "টবে কি বলো রমেশ বাবু ?"

রমেশ। নগদ কোম্পানি সিক্কা এক শত টাকা।

গদাধর। টবে আমাকে কেটে ফ্যালো।

রমেশ। আমি কাট্‌বো কেন, যারা কাট্‌বার, তারাই কাট্‌বে।

গদাধর দেখিলেন, রমেশ এক শত টাকার কমে কোন মতেই ছাড়ে না। তখন রমেশকে বসিতে বলিয়া নিজে বাড়ীর মধ্যে গেলেন।

রমেশ একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "বাছাধন ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ দেখেন নি। এখনও হয়েছে কি ? আগে জেলে যাউন, তখন সুখ পাবেন। ভগিনীপতির টাকায় বাবুয়ানার ফল পাবেন। আর লম্বা কোঁচা, বাঁকা সিঁতি থাক্‌বে না।"

অর্দ্ধ ঘণ্টা আন্দাজ বাটীর মধ্যে থাকিয়া গদাধরচন্দ্র ম্লানমুখে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন, রমেশ যেখানে, ছিলেন, সেইখানেই বসিয়া আছেন। গদাধরকে দেখিয়া রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর ?"

গদাধর। আর ভাই খবর ! আমি টোমাকে বলেছি, আমার হাটে এক পয়সাও নাই। ডিডির কাছ ঠেকে টাকা বের করা কি সহজ কটা ?

রমেশ গদাধরের কথা শেষ হইতে-না-হইতে কহিল, "কাজের কথা কি এখন বলো। ও-সব কথা রেখে দাও। আমি আর দেরি করতে পারি না। জান ত ভাই, আমরা পুলিসের লোক, কোনখানে দু-দণ্ড থাকবার জো নাই। এক রকম জবাব পেলেই চলে যাই। পরের কাজে মিথ্যা সময় নষ্ট করা কি উচিত ?" রমেশের ধর্ম্মশাস্ত্রেও উত্তম জ্ঞান আছে।

গদাধর কহিলেন, "ভাই, বিশেষ কেঁডে কেটে বলায় ডিডি ডিটে স্বীকার হয়েছে। প্রঠমে কিছুই ডেবে না, টার পর পঞ্চাশ টাকা। টার পর আমি ব'লে ক'য়ে আর মা অনেক কেঁডে কেটে ১০১ টাকা ডিটে স্বীকার করিয়ে এসেছি। টোমার

১০০ টাকা, আর ঐ রোমের (গদাধর রমকে রোম বলিতেন) ডাম এক টাকা।"

রমেশ কহিল, "তবে টাকা আনো।"

"আজিই ?"

রমেশ। এখ্নুনিই।

গদাধর। টা টো হবে না।

রমেশ। তা না, হ'লে চলে কই। তোমার কাছে ব'লবো ভাই, তার দোষ কি ? কারণ, তোমার কথা সাক্ষীর মধ্যে গণ্য নয়। সকাল বেলা ঐ চিঠিটে শুনে অবধি আমারও গা কাঁপছে। বলা যায় না, ফৌজদারির হ্যঙ্গাম, কোথা থেকে কোথায় যায়। আমার ইচ্ছা করছে, আমিই আগে প্রকাশ করি, তা হ'লে ত আমি বেঁচে যাব। হয় ত আমি বেঁচে যাব। হয় ত এত ক্ষণ ব'লে ফেলতাম, তা তোমার বিস্তর অনুরোধে বলি নাই। আর কেউ হ'লে আমি ছেড়ে কথা কইতাম না, কিন্তু তোমার সঙ্গে আলাদা কথা। তোমাকে ভাই, এত ভালবাসি বলেই বলি নাই। যদি এ বিপদে আর কেহ পড়তো, তা হ'লে কি আমি পাঁচ-শ টাকার কম ছাড়তাম ? তবে তুমি নিতান্ত আত্মীয় ব'লেই ১০০ টাকায় সম্মত হয়েছি। যদি নগদ পাই, তবে "পেটে খেলে পিঠে সয়" মনে ক'রে থাকি। কিন্তু নগদ না পেলে ভাই, বড় সুবিধা হবে বোধ হয় না।

রমেশের কথা শুনিয়া গদাধরচন্দ্র পুনরায় ম্লানবদনে বাটীর মধ্যে গেলেন। এবং ঘণ্টাখানেক পরে এক শত টাকা আনিয়া রমেশের হাতে গণিয়া দিলেন। রমেশ টাকা লইয়া থানায় গমন করিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

বিধুভূষণের দেশে প্রত্যাগমন—সরলার ঋণ পরিশোধ

ভাদ্র মাস। সন্ধ্যার প্রাক্কাল। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। পূর্ব্বের সাত দিবস অনবরত বৃষ্টি হইয়াছে। রাস্তা কর্দ্দমময়। অধিকন্তু গাড়ীর চাকায় কাটিয়া গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল হইয়াছে, সেগুলি জলে পরিপূর্ণ। তাহার দুই পার্শ্বে মৃত্তিকা উচ্চ হইয়া রহিয়াছে। অসাবধানতাপ্রযুক্ত তথায় পদপ্রক্ষেপ করিলে পিচকারির ন্যায় বেগে পঙ্কিল সলিল উঠিয়া সমুদায় বস্ত্রাদি নষ্ট করিয়া ফেলে। যেখানে রাস্তার ধারে বৃক্ষাদি আছে, সেখানে শুষ্ক পত্র পড়িয়া জল-সংযোগে পচিয়া দুর্গন্ধ বিস্তার করিতেছে। গ্রামের মধ্যে প্রতি গৃহ হইতে ধূম উঠিতেছে। গৃহস্থেরা বেলা থাকিতে থাকিতে বাহিরের কর্ম্ম সমাধা করিয়া ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রদীপ জ্বালিতেছে। ঝিঁঝিঁ, মশা ইত্যাদি নানাবিধ কীট পতঙ্গ উড়িতেছে, ভেককুল আনন্দে রব করিতেছে, ঝিল্লীগণের কর্কশ স্বরে কর্ণে তালা লাগিতেছে। গাভী, ছাগ, মেষ প্রভৃতি গ্রাম্য জন্তু একটিও বাহিরে নাই। মনুষ্যের গতায়াত অনেক ক্ষণ বন্ধ হইয়াছে।

এমন সময়ে দুইটি পথিক কৃষ্ণনগরাভিমুখে যাইতেছে। পথিকদ্বয়ের বাম হস্তে একটি একটি ক্ষুদ্র ব্যাগ, দক্ষিণ হস্তে একটি একটি কাপড়ের ছাতি ; গায়ে পিরান, মস্তকে চাদরের উষ্ণীষ, পদযুগ বিনামাশূন্য। যে অগ্রে যাইতেছে, তাহাকে দেখিলে বড় শ্রান্ত বোধ হয় না। কিন্তু যে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে, তাহার পদপ্রক্ষেপ দর্শন করিলে বোধ হয় যেন তাহার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। সন্ধ্যাও হইল, পথিকদ্বয়ও এক গ্রামে প্রবেশ করিল। এত ক্ষণ তাহারা পরস্পরে কথা কহে নাই, কিন্তু গ্রামে প্রবেশ করিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী অগ্রগামীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "দাদাঠাকুর, আজ আর চ'লে কাজ নেই, এই গ্রামেই থাকা যাউক।" এই কথাটি এমন মৃদু স্বরে কহিল যে, কোন তৃতীয় ব্যক্তি শুনিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারিত, পথিক কোন-না-কোন প্রকার ভয় পাইয়াছে। বোধ হয়, কথা শুনিয়া পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বক্তা নীলকমল এবং যাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, তিনি আমাদের বিধুভূষণ।

প্রথম বার কোন উত্তর না পাইয়া নীলকমল পুনরায় পূর্ব্ববৎ মৃদু স্বরে কহিল, "দাদাঠাকুর, পূজার সময় রাত্রে রাস্তা চলা কিছু না, এস আমরা এক বাড়ী থাকি, কাল রাত থাকৃতে থাকৃতে উঠে চ'লে যাব।"

বিধু একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "কেন নীলকমল, এখন ভয় করো কেন ? আগে ত তুমি চোরের ভয় করতে না ?"

নীলকমল কহিল, "আগে কিছু ছিল না, এখন কিছু হয়েছে। কিন্তু যা বললাম, সে কথার কি ?"

বিধুভূষণ উত্তর করিলেন, "এই গ্রামের পরেই হাঁসখালি। হাঁসখালি গেলেই ত বাড়ী গেলাম। এই একটুকুর জন্যে এখানে থেকে কষ্ট পাওয়া কি ভাল ? তুমি যে ভয়ের কথা বলছো, এখানে সে ভয়ের কোনই কারণ নাই। এ কৃষ্ণনগরের নিকট, এখানে কি রাস্তার লোক কেউ মেরে নিতে পারে ?"

"তবে চল। কিন্তু যদি আমার কথা শোন, তবে এইখানেই থাকা উচিত।"

বিধুভূষণ নীলকমলের কথা না শুনিয়া অগ্রে অগ্রে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। নীলকমলও (অত্যন্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক) তাঁহার অনুসরণ করিল। কিয়দ্দূর নীরবে গমন করিয়া বিধুভূষণ সম্মুখে অংগুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "নীলকমল, সেই গাছতলা দেখা যাচ্ছে।" নীলকমল একটু হাসিয়া উত্তর করিল, "দাদাঠাকুর, সেই এক দিন, আর এই এক দিন।"

পুনর্ব্বার কিয়দ্দূর নীরবে গমন করিয়া সেই বৃক্ষের সমীপবর্ত্তী হইলে, বিধু কহিলেন, "নীলকমল, চলো—গাছতলায় ব'সে আর একবার তামাক খাই।"

নীলকমল উত্তর করিল, "দাদাঠাকুর, অঘ্রার মা যা বলেছিল তাই, তুমি মনের কথা টেনে বলেছ।"

উভয়ে বৃক্ষমূলে গিয়া বসিলেন। নীলকমল অংগুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল, "দাদাঠাকুর, তুমি ঠিক যেখানে বসেছ, ঐখানেই বসেছিলে, আর

আমিও এইখানে এসে বসেছিলাম। তুমি আমাকে দেখে ডরিয়ে উঠেছিলে।"

বিধুভূষণ চতুর্দ্দিক্ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

হায়! আমাদের যে দিনটি যায়, সেটির মতন আর আইসে না। বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া কে ক'দিন সুখভোগ করিয়াছেন? কাহার চিত্ত আর নব-যৌবনের ন্যায় সৌহার্দ্দ বা প্রণয়রসে অভিষিক্ত হইয়াছে? স্বভাবের শোভা দর্শনে কাহার অন্তঃকরণে আর সেরূপ প্রীতির সঞ্চার হইয়াছে? সংসার, তোমাকে ধন্যবাদ! তোমাতে প্রবেশ করা আর বিস্মৃতিহ্রদে অবগাহন করা, উভয়ই সমান। বিদ্যালয়ে থাকিতে যে সুহৃদ্‌কে অবলোকন করিলে ভাবনা চিন্তা দূর হইয়া যাইত, যাহার মুখে হাসি দেখিলে হৃদয়াকাশে শরচ্চন্দ্রের জ্যোতির ন্যায় প্রভা বিকীর্ণ হইত, যাহার বিরহ মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক ক্লেশকর বোধ হইত, সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে যাহার চিরসহচর হইব মনে হইত, এখন সে প্রিয় সুহৃদ্ কোথায়? সকলেই স্বার্থপরতা-পাশে আবদ্ধ হইয়া আপনাপন চিন্তায় মগ্ন হইয়া রহিয়াছে। মুখ তুলিয়া অগ্রপশ্চাতে কে আছে, দেখিবার অবকাশ নাই।

চারি বৎসর অগ্রে বিধুভূষণের চিত্ত একরূপ ছিল। এখন আর একরূপ হইয়াছে। অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হওয়া অবধি প্রকৃত সুখের সঙ্গে চিরবিদায় লইয়াছেন। নবযৌবনের সুখের সহিত সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা তুলনা করিলে কাহার হৃদয়ে না শোকানল জ্বলিয়া উঠে? কে দীর্ঘনিশ্বাস না ছাড়িয়া থাকিতে পারে?

নীলকমল চক্‌মকি ঠুকিয়া আগুন বাহির করিল। উভয়ে তামাক খাইয়া বৃক্ষমূল হইতে পুনরায় যাত্রা করিলেন।

বহুকাল বিদেশে থাকিয়া বাটী আসিবার সময় মনোমধ্যে কত প্রকার ভাবের উদয় হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কখন কখন আনন্দে হৃদয় উচ্ছলিত হইতে থাকে, কখন কখন ভয়ে শরীরকে কম্পিত করে। যাহাদিগকে বাটী রাখিয়া গিয়াছিলাম, তাহাদিগকে সুস্থকায় দেখিতে পাইব, ভাবিলে মনে কতই আহ্লাদ হয়, কিন্তু তাহাই যে দেখিতে পাইব তাহারই বা প্রমাণ কি? এরূপ চিন্তায় হৃদয়কে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া ফেলে। বিধুভূষণ পর্য্যায়ক্রমে ভাল মন্দ ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে বাটীর দ্বারের সমীপবর্ত্তী হইলেন। বাটী হইতে যাইবার সময় দেখিয়া গিয়াছিলেন, বাটীতে লোক ধরে না। তখন শশিভূষণের নূতন বাটী প্রস্তুত হয় নাই। শশিভূষণ, তাঁহার সন্তানাদি, গদাধরচন্দ্র ও তদীয় জননী প্রভৃতি সকলেই এক বাটীতে থাকিতেন। সুতরাং অহর্নিশি বাটীতে গোলমাল থাকিত। বিধুভূষণ এখন বাটীর নিকটবর্ত্তী হইয়া গোলমালের চিহ্ন মাত্রও শুনিতে পাইলেন না। ভয়ে তাঁহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া নীলকমলকে কহিলেন, "নীলকমল, তুমি ডাক দেখি একবার, 'বাড়ী কে আছে' ব'লে?" বিধুভূষণের নিজে উচ্চ কথা কহিবার সামর্থ্য হইল না। নীলকমল উচ্চৈঃস্বরে "বাড়ী কে আছে" বলিয়া দুই তিন বার চীৎকার

করিল। কোনই উত্তর নাই। বিধুভূষণ কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, সর্ব্বনাশ হয়েছে।" নীলকমল পুনর্ব্বার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল। এবার শ্যামা বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এত রাত্রে তোমরা কা'রা দরজায় ঘা দিচ্ছ ?"

নীলকমল। বাহির হইয়া দেখ।

শ্যামা দরজা খুলিয়া দেখিল দুটি লোক। একটি দরজার ধারে বসিয়া, আর একটি দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কা'রা ?

বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্যামা, তোমরা সব ভাল আছ ?"

শ্যামা বিধুভূষণের স্বর জানিতে পারিয়া কম্পিত কলেবরে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "তুমি কোথা থেকে এলে ?"

বিধুভূষণ কহিলেন, "শ্যামা, স্থির হও। বাটীর সকলে ভাল আছে ?"

শ্যামা একটু বিলম্বে কহিল, "প্রাণে প্রাণে। তুমি কোথা থেকে এলে ?"

বিধুভূষণ শ্যামার কথা শুনিয়া "মা দুর্গা" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, "শ্যামা, আমি কোথা থেকে এলাম যে জিজ্ঞাসা করলে—আমার পত্র কি পাও নাই ?"

শ্যামা কহিল, "তুমি বাড়ী ছাড়া অবধি পত্র পাওয়া দূরে থাকুক, কোন লোকের মুখেও তোমার খবর পাই নাই। খুড়ী-মা ভেবে ভেবে প্রায় "এখন তখন" এমনি অবস্থা হয়েছে।"

বিধু। আর গোপাল—সে কেমন আছে ?

শ্যামা। সে ভাল আছে।

বিধু। তবে চলো শ্যামা, বাড়ীর মধ্যে যাই।

শ্যামা কহিল, "এখন বাড়ীর মধ্যে গেলে খুড়ী-মা মূর্চ্ছা যাবেন। তোমরা এইখানেই ব'সো, আমি আগে গিয়া তাঁকে বলি, তার পর তোমাদের নিয়ে যাব।"

বিধু কহিলেন, "শ্যামা, সরলা কি এতই কাহিল হয়েছে যে, আমাদের বাড়ী আসার খবর শুনে মূর্চ্ছা যাবে ?"

শ্যামা। বড় কাহিল।

বিধুভূষণ শ্যামার নিকট সরলার অসুস্থতার খবর পাইয়া বড় অধিক কাতর হইলেন বোধ হইল না। তাঁহাকে এত ভালবাসেন যে, তাঁহার বিরহে কাহিল হইয়াছেন শুনিয়া যেন বিধুভূষণের দুঃখের মধ্যে কিঞ্চিৎ সুখের উদয় হইল। যেন অন্ধকার রজনীতে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুৎ খেলিল। হায়! ভাবিয়া ভাবিয়া সরলার যে যক্ষ্মারোগ হইয়াছে, বিধুভূষণ তা জানিতে পারিলেন না।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে শ্যামা আসিয়া বিধুভূষণকে ডাকিয়া লইয়া গেল। বিধুভূষণ সরলার গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত প্রায় হাসিতে হাসিতে গমন করিলেন বলিলে হয়। কিন্তু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই তিনি বসিয়া পড়িলেন। সরলাকে আর চেনা যায় না, এরূপ কৃশা ; কিন্তু তথাপি বিধুভূষণের নাম শুনিয়া তিনি

বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছেন। বিধুভূষণকে দেখিয়া সাশ্রুনয়নে হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "এত দিনের পর কি দুঃখিনীকে মনে পড়েছে ?"

বিধুভূষণ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, 'সরলা, এত কাল তোমার নাম জপ ক'রে বেঁচেছিলাম। কিন্তু স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, তোমাকে এরূপ অবস্থায় দেখবো।"

সরলা হাসিয়া উত্তর করিলেন, "এখন ভালো হবো। কিন্তু আজ আর অধিক ব'সতে পারছি না, আমার মাথা ঘুরছে, সর্ব্বাঙ্গ শরীর অবশ হয়ে আসছে।" এই বলিয়া সরলা শয়ন করিলেন। শ্যামা নিকটে বসিয়া সরলার কেশ একত্র করিয়া বাঁধিয়া দিল।

রজনী প্রভাত হইলে সরলা প্রত্যূষে নিজে উঠিয়া বাহিরে আসিয়াছেন; তদ্দর্শনে শ্যামার যার-পর-নাই আহ্লাদ হইল। শ্যামা মনে করিল, ভাবিয়া ভাবিয়া সরলা এরূপ কৃশ হইয়াছিলেন। সরলাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "খুড়ী-মা, দেখ দিখি, আমি ত বলেছিলাম, খুড়াঠাকুর বাড়ী এলেই তোমার ব্যামো সব আরাম হয়ে যাবে।"

সরলা কহিলেন, 'শ্যামা, তুমি আমার লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি আমার অন্নপূর্ণা। তোমার কথা সত্যি হবে না ত কার কথা সত্যি হবে ?"

সরলার কথা শুনিয়াই শ্যামা বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল। শ্যামার মহৎ দোষ, সে নিজের প্রশংসা শুনিতে পারে না। আহা, শ্যামার পরকালে কি উপায় হবে ? "পৃথিবীসংশোধনী সভায়" যদি শ্যামা অন্ততঃ দু-দিন যাইতে পারিত, তাহা হইলে শ্যামার এরূপ দুষ্প্রবৃত্তি থাকিত না।

রজনীর প্রথম ভাগে চিন্তায় বিধুভূষণের নিদ্রা হয় নাই। শেষ রাত্রে একটু ঘুম হইয়াছিল। এ জন্য বিধুভূষণ সকালে উঠিতে পারেন নাই। শ্যামা পাকশাকের উদ্যোগ করিয়া দিয়াছে, এমন সময় বিধুভূষণ শয্যা হইতে উঠিলেন। সরলা উঠিয়া বেড়াইতেছেন দেখিয়া বিধুভূষণের আনন্দের আর সীমা রহিল না। সরলা অত্যন্ত কাহিল বটে, কিন্তু এরূপ ভাবে বেড়াইতেছেন এবং এরূপ প্রফুল্লচিত্তে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন যে, সকলে দেখিয়া যার-পর-নাই আহ্লাদিত হইল। সরলা রন্ধন করিতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু শ্যামা কোন মতেই তাঁহাকে রান্নাঘরে যাইতে দিবে না। সরলা বলিলেন, "আমি না রাঁদলে কে রাঁদবে শ্যামা ?"

শ্যামা কহিল, "ঠাকরুণদিদিকে ডেকে আনি।"

সরলা কহিলেন, "শ্যামা, ঠাকরুণদিদি কি আসবেন ?"

শ্যামা। "খুড়ী-মা, পয়সা হ'লে সকলই হয়। আমাদের ভাবনা কি ?" বস্তুত শ্যামা যাহা বলিয়াছিল, তাহাই কার্য্যে পরিণত হইল। ঠাকরুণদিদি যেই শুনিলেন যে, বিধুভূষণ অনেক টাকা লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন, অমনি আর দ্বিতীয় কথা না কহিয়া চলিয়া আসিলেন। সরলাকে দেখিয়া

ঠাকুরুণদিদি কহিলেন, "সরলা, তুমি এমন কাহিল হয়েছ, আমাকে এক দিনও বলো নাই ?"

সরলা একটু হাসিলেন, আর উত্তর করিলেন না।

বিধুভূষণ অনেক টাকা লইয়া বাটী আসিয়াছেন, এ কথা মুহূর্ত্তমধ্যে সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া পড়িল। সকলেই দেখা করিতে শশব্যস্ত। অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক, গদাধরচন্দ্র স্বয়ং আসিলেন। আগে যাহারা ঘৃণায় কথা কহিত না, এক্ষণে যেন তাহারা চিরসুহৃদের ন্যায় হইয়া উঠিল। "রজতে"র কি মহিমা !

লোকের সহিত আলাপ করিতে বিধুভূষণের প্রায় সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। বাটীর মধ্যে আসিয়া যে সরলার কাছে দু-দণ্ড বসেন, সন্ধ্যার অগ্রে তাঁহার এমন অবকাশ হইল না। সন্ধ্যার সময় সকলে চলিয়া গেলে বিধুভূষণ বাটীর মধ্যে আসিলেন।

সরলা প্রাতঃকালে শরীরে এরূপ বল পাইয়াছিলেন যে, তাঁহার মনে হইয়াছিল, তিনি যেন পূর্ব্বের ন্যায় নীরোগ অবস্থাতেই আছেন। বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত সরলা সহাস্যবদনে ব্যস্তসমস্ত হইয়া কাজকর্ম্ম করিলেন। কিন্তু দুই প্রহরের পর হইতে তাঁহার হস্ত পদ বলশূন্য হইয়া আসিতে লাগিল। কাহাকে কিছু না বলিয়া আপনার ঘরে গিয়া শয়ন করিলেন। শ্যামা যে-কোন কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকুক, তাহার এক চক্ষু নিয়তই সরলার উপর থাকিত। সরলা শয়ন করিলে শ্যামা তাঁহার বিছানার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খুড়ী-মা আবার শুলে যে ?"

সরলা উত্তর করিলেন, "শ্যামা, কাল রাত্রে আমার ঘুম হয় নাই। ঘুমে আমার শরীর অবসন্ন হয়ে আস্‌ছে। আমাকে জাগাইও না, আমি একটু ঘুমাই।" সরলা এই বলিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিলেন। শ্যামা আপনার কাজ করিতে গেল।

ক্ষণকাল পরে শ্যামা আবার সরলার বিছানার নিকটে গেল। সরলা এখনও নিদ্রা যাইতেছেন। মুখমণ্ডলে আর কোন চিন্তার লক্ষণ নাই ; প্রফুল্ল কমলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। এত বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, বায়ু শীতল হইয়াছে, তথাপি সরলার ঘর্ম্ম হইতেছে। শ্যামা অঞ্চল দ্বারা আপনার হস্ত পরিষ্কার করিয়া আস্তে আস্তে সরলার কপাল স্পর্শ করিল। কপাল শীতল। কিন্তু শ্যামার হস্তস্পর্শে সরলা চমকিয়া উঠিলেন। পাছে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় শ্যামা নিঃশব্দপদসঞ্চারে তথা হইতে চলিয়া আসিল।

শ্যামা বাহিরে আসিয়া ভাবিল, "এখন গ্রীষ্ম কিছু নেই, তবু গা ঘামে কেন ?" কিন্তু সরলা বহু কাল শয্যাগত ছিলেন, আজি উঠিয়া বেড়াইয়া কাজকর্ম্ম করিয়াছেন, সুতরাং শ্যামার কোন ভয় হইল না। পরন্তু মনে করিল, শ্রান্তিপ্রযুক্ত সরলার শরীরে ঘর্ম্ম হইতেছে।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল, সরলার তথাপি নিদ্রাভঙ্গ হইল না।

বিধুভূষণ বাড়ীর মধ্যে আসিয়া, সরলাকে নিদ্রিত দেখিয়া শ্যামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্যামা, সেই ঘুম এখনও ভাঙ্গে নাই ?" শ্যামা কহিল, "না" শয্যার শিয়রে বসিয়া সরলার কপালে হাত দিলেন। কপাল যেন হিম পাথর। বিধুভূষণ কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া "সরলা, সরলা" বলিয়া তিন চারি বার ডাকিলেন।

সরলা চক্ষু মেলিয়া বিধুভূষণকে দেখিতে পাইলেন। পাইয়া বিস্ময়াত্মক স্বরে কহিলেন, "কে তুমি ?" বিধুভূষণের উত্তর দিবার পূর্বেই পুনর্ব্বার কহিলেন, "না, আমার ভুল হয়েছিল। চিনেছি। এখন, তুমি বুঝি আমার গোপালকে নিতে এসেছ ? তা পাবে না। আমি যাচ্ছি।"

সরলা প্রলাপ বকিতেছেন।

বিধুভূষণ তিন চারি বার বড় বড় করিয়া সরলার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। সরলা উত্তর করিলেন, "কি ? এক-শ বার ডাক কেন ? এই যাচ্চি।" এই বলিয়া সরলা পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

বিধুভূষণ রোদন করিতে করিতে ঘরের বাহিরে আসিলেন। শ্যামাকে ডাকিয়া কহিলেন, "শ্যামা, সরলা বুঝি ফাঁকি দিলে। তুমি ঘরে যাও, আমি দেখি, যদি একজন ডাক্তার পাই।"

শ্যামা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া ঘরে আসিল। দেখিল, সরলা পূর্ব্ববৎ নিদ্রা যাইতেছেন। "খুড়ী-মা," "খুড়ী-মা" করিয়া ডাকিল, সরলা উত্তর করিলেন না। নিশ্বাস স্বাভাবিক বহিতেছে, মুখভঙ্গী স্বাভাবিক আছে। কিন্তু সরলার শরীর শীতল হইয়াছে। শ্যামা পায়ের কাছে বসিয়া সরলার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

গোপাল অনেক দিনের পর আজি মাতাকে একটু ভাল দেখিয়া ভুবনের সহিত খেলা করিতে গিয়াছে। বিধুভূষণ ডাক্তার ডাকিতে যাইবার সময় ভুবনদের বাড়ী ভুবনের মাতাকে সরলার অবস্থা জানাইয়া গোপালকে সে রাত্রে সেইখানে রাখিতে বলিয়া গেলেন।

প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে বিধুভূষণ ডাক্তার সমভিব্যাহারে ফিরিয়া আসিলেন। ডাক্তার বাবু আসিয়াই রোগীকে একটু আরক খাওয়াইয়া দিলেন। পরে বসিয়া শ্যামা ও বিধুভূষণের নিকট সমুদায় বিবরণ অবগত হইলেন। ঘড়ি খুলিয়া সরলার নাড়ীর গতিক দেখিলেন, তৎপরে যন্ত্রদ্বারা সরলার বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশ পরীক্ষা করিলেন। তখন বিধুভূষণ চিন্তাকুলচিত্তে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখ্‌লেন মশায় ?"

ডাক্তার উত্তর করিলেন, 'রোগ সাংঘাতিক। বাঙ্গালায় ইহাকে যক্ষ্মা বলে। এ রোগ কখনও আরাম হয় না। পুস্তকে লেখে বটে যে, দৈবাৎ আরোগ্য হ'লেও হ'তে পারে, কিন্তু আমি এই ৩০ বৎসরের মধ্যে একটিকেও আরাম হ'তে দেখি নাই। রোগীর চেহারায় বোধ হচ্ছে, চার পাঁচ বৎসর এ রোগের সূত্রপাত হয়েছে। বোধ হয় প্রথমাবধি যত্ন করলে আরও দুই এক বৎসর বাঁচার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু

সে অনুমান মাত্র। এ রোগে কখন্ মৃত্যু হয়, তার স্থিরতা নাই। এখন যে এত মন্দ দেখা যাচ্ছে, তবুও এমন হ'তে পারে যে, এখনও পাঁচ ছয় মাস বেঁচে থাকলেও থাকতে পারেন। কিন্তু তা নিতান্ত অসম্ভব। আমার বোধ হচ্ছে, আজ শেষ রাত্রেই এঁ'র প্রাণত্যাগ হবে। আজ সকাল বেলা হ'তে দুই প্রহর পর্য্যন্ত ভাল ছিলেন ; সে কেবল আপনার আগমনপ্রযুক্ত। তাতেই রোগীর মনে উৎসাহ উৎপাদিত হয়েছিল। কখন কখন সুসমাচার পেলে অন্তঃজলের রোগীও পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করে, চার পাঁচ দিন বেঁচেও থাকে। বোধ হয়, আপনি যদি এমন সময় বাড়ী না আসতেন, তা হ'লে আরও কিছু কাল বেঁচে থাক্‌তেন। কোন উৎসাহ হ'লেই কিঞ্চিৎ পরে তাহার বিপরীত ফলোৎপত্তি হয়। রোগীর তাই হয়েছে। বাঁচতেও পারেন, নাও পারেন। কিন্তু আজ বাঁচলেও অধিক দিন জীবিত থাক্‌বেন না।"

ডাক্তারের কথা শুনিয়া বিধুভূষণ ম্রিয়মাণ হইলেন। "হায়, আমিই সরলার মৃত্যুর কারণ" বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন।

ডাক্তার বাবু কহিলেন, "আপনি যদি অমন ছেলেমানুষের মতন কাঁদেন, তাহা হ'লে আপনি এ ঘরে থাক্‌বার যোগ্য ন'ন। এখনও বলা যায় না কি হবে। হয় ত বাঁচতে পারেন। কিন্তু অমন গোলমাল করলে সে সম্ভাবনা তত থাক্‌বে না।"

বিধুভূষণ কহিলেন, "মহাশয়, আর না, আর কাঁদবো না। কিন্তু বিবেচনা ক'রে দেখুন, আমি বাড়ী না এলে আর কিছু কাল বেঁচে থাক্‌বার সম্ভাবনা ছিল—এ কথা শুনে কি আমি না কেঁদে থাক্‌তে পারি ?"

ডাক্তার সস্নেহে বিধুভূষণের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "সে অনুমান মাত্র, আমি ত পূর্ব্বেই বলেছি। কিন্তু তা না হ'লেও গত বিষয় ল'য়ে কষ্ট পাবার দরকার কি ? যে বিষয় আর সংশোধিত হবার জো নাই, তা মনে না করাই ভাল।"

বিধুভূষণ চুপ করিয়া বসিলেন। ডাক্তার বাবু অনন্যমনা হইয়া সরলার মুখপানে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন।

ক্ষণকাল পরে সরলার ঠোঁট নড়িল। সরলা অস্পষ্টস্বরে যেন জল জল বলিলেন, শ্যামা জল দিতে গেল। ডাক্তার বাবু শ্যামার হস্ত হইতে গেলাস লইয়া একটি ঝিনুকে একটু জল ও আর একটু আবক একত্র করিয়া সরলাকে খাওয়াইয়া দিলেন। সরলা খাইয়া মুখ বক্র করিয়া কহিলেন, "বড় ঝাল।

ক্রমে ক্রমে সরলার চৈতন্য হইল। বিধুভূষণ আর থাকিতে পারিলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে সরলাকে কহিলেন, "সরলা, তোমার আর এক দিনের তরে সুখ হ'ল না।"

সরলার এক্ষণে উত্তম জ্ঞান হইয়াছে। মৃত্যুর অগ্রে প্রায় সকলেরই হইয়া থাকে। একদৃষ্টে বিধুভূষণের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তুমি কাঁদ্‌ছো কেন ?

বিধুভূষণ কহিলেন, “সরলা—তুমি চল্লে, আর আমি কাঁদ্‌ছি কেন জিজ্ঞাসা করছো ?”

সরলার প্রেমময়ী মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া ডাক্তার বাবু রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিলেন।

সরলা কহিলেন, “আমি যাচ্ছি সত্য, কিন্তু আমার সুখ হয় নাই কে বল্লে ? পতির সেবা ও সন্তান পালন করা আমাদের প্রধান সুখ ; তা আমার হয়েছে। যেটুকু দুঃখ ছিল, তা কাল তুমি বাড়ী আসায় দূর হয়েছে। আমার ন্যায় সুখী ক'জন হয়েছে ?

বিধুভূষণ কহিলেন, “সরলা, তুমি আর ও-কথা ব'লো না, তা হ'লে আমার বুক ফেটে যাবে।”

সরলা বিধুভূষণের হস্ত ধরিয়া কহিলেন, “শেষ কালে আমার এক অনুরোধ আছে। এই বলিয়া শ্যামার দিকে চাহিলেন। সরলার চক্ষু হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া জল বহিতে লাগিল। বাক্য নিঃসরণ হইল না ; শ্যামা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। ডাক্তার বাবু থামাইবেন কি, তাঁহারও আর কথা কহিবার সামর্থ্য রহিল না। অবিশ্রান্ত কেবল রুমাল দিয়া মুখ চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

বিধুভূষণের হস্ত সরলার হাতেই আছে। তিনি একটু পরে কহিলেন, “অনুরোধ এই যে, শ্যামাকে কখন দাসী ব'লে মনে ক'রো না। চিরকাল তোমার যেন জ্ঞান থাকে যে, শ্যামা তোমার আপন মেয়ে।” সরলা আবার চুপ করিলেন।

বিধুভূষণ কহিলেন, “সরলা, শ্যামা শুধু আমার মেয়ে নয়। শ্যামা আমার মা। শ্যামা ছিল ব'লেই আমরা এখনও বেঁচে আছি।” শ্যামা গৃহ হইতে চলিয়া গেল।

ডাক্তার বাবু অনেক চেষ্টা করিয়া চক্ষু মুছিয়া ঝিনুকে করিয়া আর একটু ঔষধ সরলার কাছে লইয়া গিয়া কহিলেন, “এইটুকু খাউন দেখি ?”

সরলা কহিলেন, “আর কেন ? ঔষধে আর আমার দরকার কি ?”

বিধুভূষণ কহিলেন, “সরলা খাও। এখনও তোমার পীড়া তত শক্ত হয় নাই।”

সরলা কহিলেন, “আমার নিজের শরীরের ভাব আমি বুঝি। আমি এত দিন মরে যেতেম। কেবল তোমাকে দেখবো ব'লে জীবনটি বেরোয় নাই। একবার আমার গোপালকে ডেকে দাও।”

বিধুভূষণ ডাক্তার বাবুর দিকে চাহিলেন। ডাক্তার বাবু কহিলেন, “এখন আর কি ? যা বলছেন, তাই করো।”

শ্যামা দৌড়িয়া গিয়া গোপালকে কোলে করিয়া আনিল। সরলার নিকট আনিয়া নামাইয়া দিতে গেল। সরলা কহিলেন, “না—না, অমনিই থাক।” তখন গোপালের এক হাত ও শ্যামার এক হাত ধরিয়া কহিলেন, “গোপাল, তুমি সে দিন যে দিব্বি করেছিলে, তা মনে আছে ত ? শ্যামা তোমার মা, তোমার যথার্থ মা ! দেখো, যেন তোমার দিব্বি মনে থাকে।” পরে শ্যামার দিকে চাহিয়া কহিলেন, “শ্যামা, তুমি আমার বিস্তর করেছ। আমার মা বাপও এমন করতেন

না—আমার গর্ভের মেয়ে এমন করতো কি না সন্দেহ। তোমার ধার এ জন্মে ত হ'লই না, আর কোন জন্মে যে শোধ দিতে পারবো, তাহাও অসম্ভব। আমি তোমাকে কি দেবো? আমার সর্ব্বস্বধন গোপাল। শ্যামা, গোপালকে আমি জন্মের মত তোমাকে দিয়ে গেলাম।"

সরলার কথা শুনিয়া সকলে ক্রন্দন করিতে লাগিল। চক্ষের তারা দেখিতে দেখিতে মস্তকে উঠিল।

সকলে ধরাধরি করিয়া সরলাকে বাহিরে আনিল। মুহূর্ত্তেকে সরলা জন্মের মতন চক্ষু মুদিত করিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

নানাবিধ

শশিভূষণের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়া এক্ষণে বাবুর বাটীতে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছেন। তাঁহার উপর বাবুর বিশ্বাস অসীম, তিনিই এখন জমিদার বলিলে হয়। বাবু বেশভূষা ও সুরার খরচ পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন।

পৃথিবীতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই। শশিভূষণের উচ্চ পদ হইল বটে, কিন্তু সে পদ নিষ্কণ্টক হইল না। পূর্ব্বে যে সমস্ত আমলারা শশিভূষণের উন্নতির জন্যে অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারাই কিসে শশিভূষণের অবনতি হয়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সাবেক দেওয়ানের আমলে তাঁহারা উৎকোচ গ্রহণ করিতে পারিতেন না; ইচ্ছাপূর্ব্বক কর্ম্ম বন্ধ করিয়া অলসভাবে থাকিতে পারিতেন না, এ জন্য মনে করিয়াছিলেন, শশিভূষণ তাঁহাদের সমান পদের লোক, তিনি দেওয়ান হইলে তাঁহারা আপন আপন ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম করিতে পারিবেন। কিন্তু শশিভূষণ দেওয়ান হইলে তাঁহারা দেখিলেন যে, তাঁহাদিগের অবস্থার কোন ইতরবিশেষ হইল না। পূর্ব্বেও যেমন দেওয়ানকে ভয় করিয়া চলিতে হইত, এক্ষণেও সেইরূপ করিতে হয়; সুতরাং তাঁহারা সকলে একমত হইয়া কিসে শশিভূষণ কর্ম্মচ্যুত হন, অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

এক দিবস মুহুরির, হিসাবনবিস, খাজাঞ্জি, ইত্যাদি আমলাবর্গ একত্র হইয়া কি প্রকারে তাঁহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, তাহার বিবেচনা করিতে বসিলেন। অনেকে অনেক প্রকার উপায়ের কথা বলিলেন। কিন্তু কোনটিই সর্ব্ববাদিসম্মত হইল না। পরিশেষে রামসুন্দর বাবু কেরাণী কহিলেন, 'বাবু ত মদ খেয়ে খেয়ে এক রকম পাগলের মতন হয়েছেন। তাঁর হাতে বিষয়-আশয় রক্ষা পাওয়া দুর্ঘট। এই মর্ম্মে কর্ত্তা ঠাকুরুণের দ্বারায় কালেক্টর সাহেবের নিকট একখান দরখাস্ত করাতে পারলে একজন ম্যানেজার নিযুক্ত হ'তে পারে। তা হ'লে শশীবাবুকে বিদায় হ'তে হবে।"

রামসুন্দর বাবুর পরামর্শ সকলেই ভাল বলিয়া স্বীকার করিলেন। কিন্তু

খাজাঞ্চি কহিলেন, "আমার এক আপত্তি আছে। সকলে যেখানে এক গ্রহয়েছি, সেখানে মনের কথা খুলে বলাই ভাল। আমার ভয় হচ্ছে, ম্যানেজার হ'লে এখন যে দু-এক পয়সা পাচ্ছি, তাও পাব না।"

এই কথা শুনিয়া সকলেই একটু ভাবিত হইলেন। কিন্তু রামসুন্দর বাবু কহিলেন, "সে আপনাদের ভ্রান্তি মাত্র। ম্যানেজার নিযুক্ত হইলে সে বিষয়ে সুবিধা ছাড়া অসুবিধা হবে না। শশীবাবু যেমন সব বিষয়ে খোঁজ রাখে, ম্যানেজার তা করবে না। কাগজপত্র সাফ সাফাই আর তহবিল দুরস্ত রাখতে পারলেই হ'ল। বিশেষ এখন যে কাজে পাঁচ টাকা ব্যয় হয়, তখন তাতে পনের টাকা হ'লেও কেউ কিছু বলবে না। কোম্পানীর রেটের বেশী না হ'লেই হ'ল।

রামসুন্দর বাবুর কথায় সকলেই অনুমোদন করিলেন। অতঃপর সভা ভঙ্গ করিয়া যে যাহার বাটী চলিয়া গেলেন।

সরলার মৃত্যুর পর দশ দিনের দিন শ্রাদ্ধ হইল। সেটি বন্ধ করিবার জো নাই। বঙ্গদেশের কি চমৎকার প্রথা! জীবিতাবস্থায় যাহার জন্যে লোকে এক টাকা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয়, সে মরিলে তাহার শ্রাদ্ধে অনায়াসে দশ টাকা ব্যয় করিতে পারে। যদি শ্রাদ্ধের টাকা দিয়া লোকে চিকিৎসা করিত, তাহা হইলে বোধ হয়, অনেক অকালমৃত্যু রহিত হইতে পারিত।

সরলার মৃত্যু অবধি বিধুভূষণের চিত্তে উদাসীনের ন্যায় ভাব হইল। কোনখানে যান না; কোন কাজকর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে পারেন না; নিয়তই এক স্থানে বসিয়া ভাবেন ও মাঝে মাঝে নিঃশব্দে অশ্রুপাত করেন। শ্যামা বিধুভূষণকে একাকী থাকিতে দেয় না। সর্ব্বদাই গোপালকে তাঁহার নিকট বসাইয়া রাখে। গোপাল বাটী না থাকিলে নিজেই তাঁহার নিকট বসিয়া তাঁহার সহিত নানাবিধ গল্প করে। একদিবস গল্প করিতে করিতে বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্যামা, তোমরা কি আমার একখানাও চিঠি পাও নাই?

শ্যামা উত্তর করিল, "না।"

"তবে রেজেষ্টরী চিঠিতে গোপালের নামে কে রসিদ দিত?"

শ্যামা কহিল, গোপালের নামে কখন কোন চিঠি আসেও নি, সে রসিদও দেয় নি। গদাধর রেজেষ্টরী চিঠি পেত, সে রসিদ-টসিদ দিত। কিন্তু গোপাল ত কখন দিত না।"

বিধুভূষণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, গদাধর কোথা থেকে রেজেষ্টরী চিঠি পেত?"

শ্যামা। তার মামা না কি ডাকে টাকা পাঠিয়ে দিত।

বিধুভূষণ বসিয়াছিলেন, শ্যামার কথা শুনিয়া অবিলম্বে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং চাদর লইয়া কহিলেন, "শ্যামা, টের পেয়েছি। সব চিঠিগুলো আর টাকা ঐ গদাই নিয়েছে।" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ ঘরের বাহির হইলেন। শ্যামা বুঝিতে পারিল না, কি প্রকারে তাঁহার চিঠি গদাধরের হস্তগত হইবার সম্ভব। এ জন্য

বিধুকে ফিরাইবার জন্য সে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল ; কিন্তু কোন মতেই ফিরাইতে পারিল না।

বিধুভূষণ দেরি না করিয়া একেবারে ডাকঘরে গেলেন। তথায় ডাকমুন্সীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপালের নামে যে রেজেষ্টরী চিঠি আস্‌ত, তা কার নিকট দেওয়া হ'ত ?"

ডাকমুন্সী কহিল, "সে সব চিঠি গোপাল বাবুকেই দিয়াছি। তাঁর হাতের রসিদ আছে।"

বিধু। রসিদ আমি চাই না। হরকরাকে বলুন, আমাকে সেই গোপাল বাবুকে দেখাইয়া দিক।

বলিবা মাত্র ডাকমুন্সী হরকরাকে বিধুভূষণের সহিত পাঠাইয়া দিল। হরকরা বিধুকে শশিভূষণের বাটী লইয়া গেল। গদাধর যে যথার্থই চিঠি লইয়াছিল, সে বিষয়ে এখন আর বিধুর সন্দেহ রহিল না। শশিভূষণের বাটীর দ্বারে আসিয়া তিনি গদাধরের রূপ বর্ণনা করিয়া কহিলেন, "কেমন, গোপাল বাবুর ত এমনি চেহারা ?"

হরকরা উত্তর করিল, "হাঁ মহাশয় ! আপনি ঠিক বলেছেন।"

বিধু কহিলেন, "তবে আর চেনাবার দরকার নাই। তুমি ঘরে যাও ; আমি বুঝেছি। কিন্তু খবরদার, এ কথা যেন প্রকাশ না হয়, টাকা গোপাল পায় নাই। অন্য একজন নিয়েছে। প্রকাশ হ'লে চোর ধরা যাবে না।"

বিধুভূষণের কথা শুনিয়া হরকরার মুখ শুকাইয়া গেল। কম্পিত কলেবরে কহিল, "মশায়, এতে আমার অপরাধ নেই। আমাকে উনি বল্লেন, 'আমি গোপাল বাবু,' সুতরাং আমি ওঁকেই চিঠি দিয়েছি। দেখবেন, যেন গরিব না মারা যায়।"

বিধু। তোমার ভয় কি ? কিন্তু যদি এ কথা প্রকাশ হয়, আর যদি আসামী পালায়, তা হ'লে আমি তোমাকেই ধরবো।

হরকরা "আমার দ্বারা এ কথা প্রকাশ হবে না" এই বলিয়া চিন্তাকুল চিত্তে চলিয়া গেল। বিধুভূষণ থানায় দারোগার কাছে গেলেন।

বিধুভূষণ থানায় গিয়া দারোগার নিকট এ সমস্ত কথা বলিলে দারোগা বাবু কহিলেন, "আজ সন্ধ্যা হয়েছে, এখন গেলে আসামী ধরা যাবে না। কাল সকালে আসবেন। লোকজন নিয়ে যাব, তা হ'লে অনায়াসে আসামী ধরা পড়বে।"

বিধুভূষণ কহিলেন, "যদি এ কথা রাত্রের মধ্যে প্রকাশ হয় আর যদি আসামী পালায়, তা হ'লে কি হবে ?"

দারোগা বাবু উত্তর করিলেন, "আমি তার উপায় করছি।" এই বলিয়া রমেশ কনষ্টেবলকে কহিলেন, "রমেশ, আজ চার জন কনষ্টেবল যেন শশীবাবুর বাড়ীতে রোঁদে থাকে। কাল খানাতল্লাসি করতে হবে। আসামী ঐ বাড়ীতে আছে, কিন্তু খবরদার, যেন এ কথা প্রকাশ না হয়। প্রকাশ হ'লে আসামী পাওয়া যাবে না।"

রমেশ "যে আজ্ঞা" বলিয়া ডায়রিতে চারি জন কনষ্টেবলের নাম লিখিয়া শশীবাবুর বাটীতে পাহারায় থাকিবার জন্য পাঠাইয়া দিল। পরে ভাবিতে লাগিল, "গদাধরকে এ বিষয়ে সংবাদ দেবো কি না?" অনেক ক্ষণ আন্দোলন করিয়া স্থির করিল, এত চক্ষুলজ্জা থাকিলে পুলিসে চাকরি করা সুকঠিন হইবে।

গদাধর নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন। বিধুভূষণ বাটী প্রত্যাগমন করিলে তিন চারি দিবস অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় কাল যাপন করেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, চার পাঁচ দিবস কোন গোল উপস্থিত হইল না, তখন ভাবিলেন, আর ভয় নাই। বিধুভূষণের সহিত যে তিনি দেখা করিতে গিয়াছিলেন, সে কেবল তাঁহার নির্দ্দোষিতা দেখাইবার জন্য।

রাত্রিতে শশিভূষণের বাটী কনষ্টেবল পাহারা দিল, কিন্তু তাহা শশিভূষণ কিম্বা তাঁহার বাটীর আর কেহ টের পাইল না। পরদিন প্রত্যূষে শশিভূষণ বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া কাছারি যাইবেন, সম্মুখে একজন কনষ্টেবলকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি মনে ক'রে?"

কনষ্টেবল কহিল, "আপনি একটু দেরি ক'রে কাছারি যাবেন। আমাদের বাবু এখানে আসছেন। এই বাটীতে আমাদের আসামী আছে।"

শশিভূষণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার বাড়ী কিসের আসামী?"

কনষ্টেবল কহিল, "গদাধর বাবু পরের নামের রেজেষ্টরী চিঠি নিজের ব'লে নিয়েছেন, তাই এখন প্রকাশ হয়েছে। আমরা গদাধরকে ধরতে এসেছি।"

শশিভূষণের তখন স্মরণ হইল, গদাধর একখান রেজেষ্টরী চিঠি পাইয়াছিল। সে সময় তাঁহার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ হয় নাই। সুতরাং তাহার কোন অনুসন্ধানও করেন নাই। গদাধর বলিয়াছিলেন, চিঠি পেঁৗছিবে না ভয়ে তাহার মামা রেজেষ্টরী চিঠি পাঠাইয়াছেন। শশিভূষণ তাহাই বিশ্বাস করিয়াছিলেন। কনষ্টেবলের মুখে প্রকৃত বিষয় শুনিয়া তিনি রাগত হইয়া গদাধরকে ডাকিলেন। গদাধর নিকটে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে তোমার মামার রেজেষ্টরী চিঠি পেয়েছিলে, সেই চিঠিখানা আন দেখি।" গদাধর শশিভূষণের রাগত ভাব ও কনষ্টেবলকে দেখিয়া দৌড়িয়া খিড়কীর দরজার দিকে গেল। অন্তঃপুরে প্রমদার সহিত দেখা হইল। প্রমদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "গদাধরচন্দ্র, দৌড়াচ্ছ কেন?" গদাধর উত্তর না করিয়া একেবারে খিড়কীর দরজায় গিয়া উপস্থিত হইল। প্রমদা ও প্রমদার মাতা কারণ জানিবার জন্য গদাধরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন। গদাধর খিড়কীর দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া যাইবে, এমন সময় তথায় আর এক জন কনষ্টেবল দেখিতে পাইয়া "বাবা রে" বলিয়া বেগে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। গদাধরের মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গদাধরচন্দ্র?"

গদাধর উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া কহিল, "আর গডাধর চণ্ডূ! গডাধরচণ্ডু এই বার মোলো।"

প্রমদা ও প্রমদার মাতা "ষাট্ ষাট্ করিয়া" জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ?: কি হ'ল ?"

গদাধর কহিল, "সেই রেজেষ্টরী চিঠি—"

এমন সময় শশিভূষণ বাটীর মধ্যে আসিয়া রাগতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গেল সে হতভাগাটা ?"

গদাধর ভূতলে পড়িয়া রোদন করিতেছেন। প্রমদা ও প্রমদার মাতা পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। শশিভূষণ কহিলেন, "কেন ? এখন কাঁদ কেন ? যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। এই বুঝি তোমার মামার রেজেষ্টরী চিঠি ? তুই আপনিও গেলি, আমার নামেও কলঙ্ক দিয়ে গেলি।"

প্রমদা ও প্রমদার মাতা শশিভূষণের কথায় অত্যন্ত রাগ করিলেন। গদাধর যে দোষ করিয়াছে, সে কিছুই নয়। কিন্তু শশিভূষণের কর্কশ কথা তাঁহাদের নিকট অত্যন্ত অন্যায় বোধ হইল। প্রমদার মাতা সকরুণ স্বরে প্রমদাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ দেখি বাছা, আমি বলেছিলাম, 'প্রমদা, আমাদের নিয়ে যাচ্ছ বটে, কিন্তু শেষকালে অপমান হয়ে আসতে হবে।' দেখ দেখি, এখন তা সত্যি হ'ল কি না ?" তুমি বলেছিলে, 'মা, আমার বাড়ী, আমার ঘর, কে তোমাকে অপমান করবে ?"

প্রমদা কহিলেন, "আর সে কথায় কাজ কি ? অদেষ্ট ছাড়া ত পথ নেই ?"

শশিভূষণ কহিলেন, "এখন অদৃষ্টের কথা রেখে দাও। যদি গদাকে বাঁচাতে চাও, তবে ওরে একখানা শাড়ী পরাও, আর কেউ জিজ্ঞাসা করলে তোমার ভগ্নী ব'লে পরিচয় দিও। আমি সদর দরজায় চললাম, সেখানে দারোগা এসেছে।"

শশিভূষণ বাহির-বাটীতে আসিলে দারোগা বাবু কহিলেন, "আপনার বাটীতে আসামী আছে। হয় বাহির করিয়া দিন, নচেৎ আমরা খানাতল্লাসি করবো।"

শশি। মহাশয়, হিসেব ক'রে কথা কবেন। এ ছোট লোকের বাড়ী নয়। আপনারা যে যাবেন, যদি আসামী না পান তখন কি হবে ?

দারোগা বিধুভূষণের দিকে চাহিলেন। বিধু কহিলেন, "এই বাড়ীতেই আসামী আছে।"

শশিভূষণ আরক্ত নয়নে বিধুভূষণের দিকে চাহিলেন। বিধুভূষণ কিছু বলিলেন না। পরে সকলে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু কোন স্থানেই গদাধরকে দেখিতে পাইলেন না। তখন বিধুভূষণ কহিলেন, "একবার রান্নাঘরটা দেখা যাউক।" দারোগা কহিলেন, "হাঁ, উচিত বটে।" এবং শশীবাবুকে কহিলেন, "আমরা এইখানেই দাঁড়াই, পরিবারদিগকে আমাদের সম্মুখ দিয়া যাইতে বলুন।" শশিভূষণ প্রথমতঃ আপত্তি করিলেন, কিন্তু দারোগা বাবু কোন মতেই শুনিলেন না। সুতরাং শশীবাবু পরিবারদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "তোমরা এক এক ক'রে বাহির হয়ে যাও।"

প্রথমতঃ প্রমদা, পরে স্ত্রীরূপী গদাধর, সর্ব্বশেষে প্রমদার মাতা বাহির

হইলেন। বিধুভূষণ গদাধরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন। দারোগা শশিভূষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মধো যিনি যাচ্ছেন, তাকে থামতে বলুন। উনি কে?"

শশিভূষণ উত্তর করিবার অগ্রে প্রমদার মাতা কহিলেন, "ও আমার বড় মেয়ে গদাধরচন্দ্র।"

দারোগা শুনিয়াই একজন কনষ্টেবলকে কহিলেন, "পাকড়াও।"

গদাধর অমনি "ঐ চরলে ডিডি" বলিয়া দৌড়িয়া ঘরে প্রবেশ করিল। কনষ্টেবল পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া গদাধরকে ধৃত করিল।

গদাধর যথাক্রমে থানা ও মেজেণ্টার পার হইয়া সেসন জজের নিকট হইতে ১৪ বৎসর কারাবাসের আদেশ পাইলেন।

গদাধরের শাস্তি হইল বটে, কিন্তু তাহাতে বিধুভূষণের মনে কোন শান্তি হইল না। তাঁহার আর ও-বাটীতে থাকিতেও ইচ্ছা রহিল না। তথায় যে সমস্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন, তাহাই নিয়ত তাঁহার স্মরণ হইয়া পুনরপি তাঁহাকে সেই সমস্ত কষ্ট সহ্য করিতে হইত। যে কিছু সুখভোগ করিয়াছিলেন, তাহা দুঃখে পড়িয়া একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেলেন। তাঁহার সঞ্চিত অর্থও ক্রমে শেষ হইতে লাগিল। নানা প্রকার চিন্তা করিয়া, শ্যামা ও গোপালকে লইয়া পুনরায় কলিকাতায় আসিলেন। আসিয়া গোপালকে এক বাটীতে রাখিয়া দিলেন। তথায় রন্ধনাদি করিবে ও ডফ্ সাহেবের স্কুলে পড়িবে। শ্যামাও সেই বাটীতে দাসী হইল। বিধুভূষণ ভাবিলেন,—এখন আমি কি করি? পাঁচালির দলে গেলে টাকা হয় বটে, কিন্তু কর্ম্মটি বড় হেয়। এই প্রকার ভাবিয়া তিনি আর যাত্রার দলে না গিয়া একজন ডেপুটী কলেক্টরের সহিত ঢাকা জেলায় গমন করিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নীলকমল

নীলকমল বিধুভূষণের সহিত একত্র আসিয়া সে রাত্রি বিধুভূষণের বাটীতে ছিল। পরদিবস প্রাতে আর কেহ না উঠিতে উঠিতে তথা হইতে চলিয়া গেল। রামনগরের নিকটএক মহকুমা আছে, তথায় গিয়া এক জোড়া ধুতি ও চাদর খরিদ করিল। এবং বাজার অতিক্রম করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া সেই ধুতি ও চাদর পরিধান করিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল। নীলকমলের বহু কালের আশা ফলবতী হইল। নীলকমল দু-এক পা যায়, আর আপনার পরিচ্ছদের উপর দৃষ্টি করে। এইরূপে গমন করিতে করিতে বেলা এক প্রহরের সময় বাটী গিয়া উপস্থিত হইল।

নীলকমলের স্বর শুনিয়াই নীলকমলের মাতা ও দুই ভ্রাতা আসিয়া নীলকমলকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণকমল ও রামকমলের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহাদিগের মাতা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। নীলকমল বাটী হইতে

রাগ করিয়া গিয়াছিল, কিন্তু চারি বৎসরের পর সকলকে পাইয়া আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না।

নীলকমল বাটী আসিয়া একটি ক্ষুদ্র নবাববিশেষ হইল। দশটার মধ্যে তাহার আহার না হইলে নয়। কৃষ্ণকমল ও রামকমল ভয়ে কিছু বলিতে পারে না। চাকুরে ভাই—যাহা করে, তাহাই শোভা পায়। আহারান্তে নীলকমল পাড়ায় গিয়া যাত্রা গান ও নানাবিধ গল্প করে। কিন্তু সুখ কখন চিরস্থায়ী নহে। নীলকমলের সুখ দেখিতে দেখিতে অবসান হইল।

এক দিবস নীলকমল গৌরহরি ঘোষের বাটীতে গিয়া বসিয়া নানাবিধ গল্প করিতেছে; পল্লীস্থ সকলে একত্র হইয়া শুনিতেছে। ইতিমধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল, নীলকমল, তুমি কি সাজ্তে?"

প্রশ্ন শুনিয়া নীলকমলের চেহারা অপ্রতিভের ন্যায় হইল। তদ্দর্শনে আর একজন ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। নীলকমল এবার একটু রাগত হইল। কিন্তু বাক্য দ্বারা সে রাগ প্রকাশ না করিয়া কহিল, "পাঁচালির আবার সঙ্ সাজা কি?" প্রথম প্রশ্নকারী উত্তর করিল, "তুমি ত বরাবর পাঁচালির দলে ছিলে না? আগে যখন যাত্রার দলে ছিলে, তখন কি সাজ্তে?"

নীলকমল এবার রাগ গোপন রাখিতে পারিল না। চীৎকার করিয়া কহিল, "তোমাদের সে সব কথায় কাজ কি? যত পাড়াগেঁয়ে ভূত বৈ ত নয়।"

নীলকমলকে রাগত দেখিয়া একজন কৌতুক করিয়া কহিল, "নীলকমল তামাক সাজিত।"

নীলকমল শুনিয়া একটু হাসিল। ভাবিল, উৎপাত কাটিয়া গেল। কিন্তু অবিলম্বেই অন্য একজন কহিল, "নীলকমল হনুমান্ সাজিত!"

নীলকমল এই কথা শুনিয়া রাগতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তোকে বল্লে আমি হনুমান্ সাজতাম?" এই বলিয়া নীলকমল তথা হইতে উঠিল। কিন্তু তাহাকে গমনোন্মুখ দেখিয়া আর চার পাঁচ জন "হনুমান্ হনুমান্" করিয়া ডাকিতে লাগিল। নীলকমল রাগ করিয়া তাহাদের একজনকে ধরিয়া প্রহার করিতে গেল। অমনি আর সাত আট জন 'বাছা হনুমান্, বাছা হনুমান্" বলিয়া নীলকমলের কর্ণকুহরে মধুসিঞ্চন করিতে লাগিল।

নীলকমল যাহাকে প্রহার করিতে গিয়াছিল, তাহাকে ধরিতে পারিল না। সুতরাং রাগত হইয়া বাটীর দিকে ফিরিল। অমনি দশ বার জন "বাছা হনুমান্, বাছা হনুমান্" বলিতে বলিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। নীলকমল যে-দিকে যায়, তাহারাও সেই দিকে চলিতে লাগিল। এবং যত যায়, ততই তাহাদিগের সংখ্যা ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

বিরক্ত হইয়া নীলকমল বাটী আসিল। বালকেরাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটী আসিল এবং অনবরত নীলকমলের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। নীলকমল এক এক বার রাগিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় হইতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে

নীলকমলের মাতা কহিল, "ওরা বল্লেই বা বাছা হনুমান্, তুমি ক্ষ্যাপো কেন ?"

নীলকমল কহিল, "ওরা ত পর—বলবেই, তুমিই বলতে আরম্ভ করলে ? আমার দেশে থাকা হ'ল না।" এই বলিয়া আপনার বস্ত্রাদি সেই কেম্বিসের ব্যাগটির মধ্যে লইয়া বাটী হইতে বাহির হইল। নীলকমলের মাতা তাহাকে ফিরাইবার জন্য বিস্তর যত্ন করিলেন, কিন্তু নীলকমল কোন ক্রমেই তাঁহার কথা শুনিল না।

নীলকমল চলিল, বালকেরাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। যত ক্ষণ পর্য্যন্ত নিজগ্রামে ছিল, তত ক্ষণ সেই গ্রামের বালকেরা তাহাকে ক্ষেপাইতে লাগিল। নিজগ্রাম পরিত্যাগ করিলে আবার সেই নূতন গ্রামের বালকেরা জুটিল।

কৃষ্ণকমল ও রামকমল বাটী আসিয়া মাতার নিকট বিবরণ জ্ঞাত হইয়া নীলকমলের উদ্দেশে গেল, কিন্তু দেখা পাইল না। পরদিবসও গেল, তথাপি দেখা পাইল না ; রামনগর হইতে চারি পাঁচ ক্রোশ দূরে গিয়া শুনিল যে, এক জন "বাছা হনুমান্" বল্লে ক্ষেপে, এমন লোক এসেছিল বটে, কিন্তু সে যে কোথায় গিয়াছে, বলিতে পারিল না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গোপাল ও হেমচন্দ্র

কলিকাতার বকুলতলা ষ্ট্রীটে হেমচন্দ্রের বাসা। দু-তলা বাটী, কিন্তু উপর তলায় একটি মাত্র ঘর। সে ঘরটি হেমচন্দ্রের শয়নাগার। নীচের তলার রাস্তার ধারের ঘরটি বৈঠকখানা। ঐ বৈঠকখানায় হেমচন্দ্র অধ্যয়নাদি করেন। হেমচন্দ্রের বাসার একটু দক্ষিণে এক বাটীতে গোপাল থাকেন। গোপাল ডফ সাহেবের ইস্কুলে পড়েন, ইস্কুলে যাইবার সময় হেমচন্দ্রের বাসার সম্মুখ দিয়া যাইতে হয়। হেমচন্দ্র প্রত্যহই গোপালকে দেখিতে পান। গোপাল তাঁহার ঘড়ি স্বরূপ। গোপালকে যাইতে দেখিলেই হেমচন্দ্র ইস্কুলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হন।

এক দিবস ইস্কুলের ছুটির পর গোপাল বাটী আসিতেছেন। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। গোপালের ছাতি নাই। সেলেটখানির উপর পুস্তকগুলি রাখিয়া উপুড় করিয়া মাথায় দিয়া আসিতেছেন। হেমচন্দ্রের বাটীর নিকট আসিলে প্রবল বেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। গোপাল দৌড়িয়া আসিয়া হেমচন্দ্রের দরজায় গিয়া দাঁড়াইল।

হেমচন্দ্র একটু পূর্ব্বে বাসায় আসিয়াছেন। গোপালকে প্রত্যহ তাঁহার বাসার ধার দিয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহার মনে ইচ্ছা হইয়াছিল, গোপালের সহিত আলাপ করেন। এত দিন সে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। আজি গোপালকে দরজায় দেখিয়া হেমচন্দ্র তাঁহাকে বিছানায় আসিয়া বসিতে বলিলেন।

গোপাল কহিলেন, "মহাশয়, আমি যেখানে আছি, সেইখানে থাকি। আমি বিছানায় যাব না।"

হেমচন্দ্র দরজার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাবে না? বৃষ্টি এখন শীঘ্র থামছে না। কত ক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন?

গোপাল হেমচন্দ্রের কথা শুনিয়া বৈঠকখানায় আসিলেন এবং মাটিতে পা রাখিয়া তক্তাপোশের ধারে বসিলেন। হেমচন্দ্র কহিলেন, "উপরে এসে বসুন।"

গোপাল নিজের পায়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "না মহাশয়।"

হেমচন্দ্র কহিলেন "কেন? কত ক্ষণ অমন ক'রে ব'সে থাকবেন?" গোপাল কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া অবনত মুখে কহিলেন, "আমার জুতো ছেঁড়া, পায়ে কাদা লেগেছে, বিছানার উপর পা দিলে বিছানা নষ্ট হয়ে যাবে।"

হেমচন্দ্র অবিলম্বে চাকরকে পা ধুইবার জল দিতে বলিলেন। গোপাল অত্যন্ত অনিচ্ছাপূর্বক পা ধুইয়া তক্তাপোশের উপর বসিলেন। হেমচন্দ্র তাঁহার হাত ধরিয়া তাকিয়ার কাছে লইয়া বসাইলেন। একটু বিলম্বে চাকর জলখাবার আনিল। হেম চাকরের নিকট হইতে রেকাবখানি লইয়া গোপালকে খাইতে কহিলেন।

হেমচন্দ্রের আদর দেখিয়া গোপাল প্রথমতঃ লজ্জিত হইলেন, পরে অবনত মুখে কহিলেন, "আমি কিছু খাব না। আমার এ সময় খাওয়া অভ্যাস নাই।"

হেমচন্দ্র গোপালের হাতে খাবার তুলিয়া দিলেন। গোপাল অত্যন্ত অনিচ্ছাপূর্বক জল খাইলেন। বৃষ্টি ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার হইয়া আসিল। বাটীর সম্মুখের রাস্তা জলমগ্ন হইয়া গেল। লোকজনের চলা-ফেরা বন্ধ হইল। তদ্দর্শনে গোপাল কহিলেন, "বৃষ্টি আর এখন শীঘ্র থামবে না। সন্ধ্যাও হ'ল, আমি এখন যাই।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "কি বল্লেন মহাশয়? এই বৃষ্টিতে যাবেন?" গোপাল কহিলেন, "আমার বাটীতে প্রয়োজন আছে। এখন না গেলেই নয়।" হেমচন্দ্র কহিলেন, "আপনার কি প্রয়োজন?"

গোপাল প্রকৃত না কহিয়া বলিলেন, "কাপড়-চোপড় ভিজে গিয়েছে, না ছাড়লে অসুখ হবে।"

হেমচন্দ্র উত্তর করিলেন, "আপনি কি এখানে একখান কাপড় পাবেন না?" এই বলিয়া চাকরকে একখানা ধুতি আনিতে কহিলেন।

গোপাল লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "না মহাশয়, আমার কাপড় ছাড়বার তত প্রয়োজন নাই। আমার আরও কিছু প্রয়োজন আছে।"

হেমচন্দ্র গোপালের কাপড়ে হাত দিয়া দেখিলেন, কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে। বিস্ময়াত্মক স্বরে কহিলেন, "কাপড় ছাড়বার প্রয়োজন নাই? এত ভিজলেও যদি ছাড়ার প্রয়োজন না থাকে, তবে আর কখনই প্রয়োজন হয় না।"

গোপাল কহিলেন, "মহাশয়, আমি এখন কাপড় ছাড়বো না। আমি বাসায় যাই।" এই বলিয়া উঠিবার উদ্যোগ করিলেন।

হেমচন্দ্র গোপালের হাত ধরিয়া বসাইলেন ; কহিলেন, "এ সময় আমি আপনাকে যেতে দিতে পারি না।"

গোপাল লজ্জাবনত মুখে কাতর স্বরে কহিলেন, "মহাশয়, আপনার সহিত আলাপ করা আমার বহু কাল বাসনা ছিল। আমি পুস্তক কিনিতে পারি না। আপনার নিকট হ'তে দু-একখানি নিয়ে যাব মনে করতাম, আজ আপনার সহিত দৈবাৎ আলাপ হয়ে আমার বড় আহ্লাদ হয়েছে। আমার যেতে ইচ্ছা করছে না। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন আছে ; না গেলেই নয়।"

"আপনার আবার বিশেষ প্রয়োজন কি ?'

"আপনি আমার উপর যে অনুগ্রহ করেছেন, তাতে না বল্লে আমার পক্ষে অকৃতজ্ঞতা হয়। আমি এক বাসায় পাকশাক করি এবং বেতন স্বরূপ সেইখানে থাকি আর খাই।" গোপাল এই কথা বলিয়া মাটির দিকে মুখ নামাইয়া বসিলেন।

হেমচন্দ্র গোপালের কাতর স্বর ও কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং উপস্থিত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে কথা ফিরাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সহিত এত দিন আলাপ করতে ইচ্ছা ছিল, করেন নাই কেন ?"

গোপাল কহিলেন, "আপনারা বড়মানুষ ; কি জানি, যদি আপনি কথা না কন, এই ভয়ে এত দিন আপনার এখানে আসি নাই। আজ বৃষ্টি এলো, কি করি ?"

হেমচন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, "কে আমি বড়মানুষ ? আমি ত আপনার চাইতে অধিক বড় না। যদি অধিক হই, তবে এক ইঞ্চি লম্বা হবো।"

গোপাল হাসিয়া কহিলেন, "আমি সে বড়র কথা বল্‌ছি না।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "সে যাহা হউক, এখন এই ধুতিখানা পরুন দেখি।"

গোপাল কি করেন, ধুতিখানি পরিলেন এবং আপনারখানি হাতে করিয়া লইতে গেলেন। হেমচন্দ্র লইতে দিলেন না। কহিলেন, "কাপড় ও বই এইখানেই থাকুক, কাল স্কুলে যাবার সময় নিয়ে যাবেন।" এই বলিয়া একটি ছাতি দিলেন ও চাকরের হাতে আগে আগে একটি লণ্ঠন দিয়া পাঠাইলেন।

গোপাল যে বাটীতে থাকিতেন, সেই বাটীতে কানাই নামে তাঁহার সমবয়স্ক একটি বালক ছিল। তিনি বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। গোপালকে দেখিয়া তিনি কহিলেন, "তবু ভাল, গোপালবাবুর সঙ্গে দেখা পাওয়া গেল। বাবু বুঝি এখন লণ্ঠন নৈলে চল্‌তে পারেন না ?"

গোপাল কহিলেন, "কানাই বাবু, আমার অপরাধ হয়েছে। বৃষ্টিতে আস্‌তে পারি নাই। একটু চুপ করুন, কর্ত্তাবাবু টের পাবেন।"

কানাই। কর্ত্তাবাবু আর আমি কি পৃথক ? তিনি তা টের পেয়েছেন।

কানাইয়ের কথা শুনিয়া বাবু টের পাইলেন—গোপাল আসিয়াছে। তখন কহিলেন, "চাকর বামুনের এত বাবুয়ানা কেন ? বৃষ্টি হয়েছে ব'লে কি খাওয়া-দাওয়া হবে না ? আমি এমন বাবু বামুন চাই নে। কাল অবধি যেন অন্য জায়গায় চাকরির চেষ্টা দেখে।"

গোপাল কিছু না বলিয়া বাটীর মধ্যে গেলেন। গিয়া দেখিলেন, শ্যামা সমুদায় উদ্যোগ করিয়া বসিয়া আছে। গোপালকে দেখিয়া কহিল, "আজ কোথায় ছিলে, দেখ দেখি কত বক্‌ছে ?" শ্যামার নেত্রযুগল হইতে ধারা বহিতেছে।

গোপাল কহিলেন, "দিদি, যে বাবুটির কথা রোজ বলি, যাঁর বাড়ীতে অনেক বই আছে, আজ তাঁর বাড়ীর কাছে এসে বৃষ্টি হ'ল, আর আস্‌তে পারলাম না, সেইখানে গিয়া দাঁড়ালাম। বাবু এসে আমাকে ছাড়েন না, ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে জল খাওয়ালেন, আর এই ধুতিখানা পরতে দিলেন। আস্‌তে দিতে চান না, বিস্তর ব'লে ক'য়ে চলে এলাম। আসবার সময় এক জন চাকর দিয়ে লণ্ঠন পাঠায়ে দিলেন। বাবুটি যেমন দেখতে, তেমনি ভদ্র।"

শ্যামা গোপালের কথা শুনিয়া হর্ষোৎফুল্ল নেত্রে কহিল, "তিনি বেঁচে থাকুন—আমার মাথায় যত চুল, এত প্রমাই তাঁর হউক।"

"দিদি, তাঁর নাম কি জানিস ?"

শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল, "কি নাম ?"

গোপাল উত্তর করিলেন, "আমার তাঁর নাম জানবার জন্যে বড় ইচ্ছা হ'ল, কিন্তু একে বড়মানুষ, তাতে আবার আমার চাইতে বয়সে বড়, জিজ্ঞাসা করতে ভরসা হয় না। তার পর একখান বই খুলে দেখলাম, কিন্তু ভাবলাম, যদি আর এক জনের বই হয়। তার পর দুখানা তিনখানা খুলে দেখ্‌লাম একই নাম—হেমচন্দ্র। বেশ নামটি, না দিদি ?"

শ্যামা। হাঁ, কিন্তু নামে কি করে ; গুণ থাকলে খারাপ নামও ভাল হয়।

গোপাল। দিদি, তুমি যদি দেখ, তবে টের পাবে তিনি কেমন ভদ্র, আমাকে বলেছেন, আমার যখন যে বই দরকার হবে, আমাকে নিয়ে আসতে দেবেন।

শ্যামা। আমাকে এক দিন দেখিয়ে দাও দেখি বাবুটি কে ? তাঁদের বাড়ী পরিবার আছে ?

গোপাল। না।

ক্ষণকাল পরে গোপাল রাঁধিতে রাঁধিতে কহিলেন, "দিদি, হাঁড়িতে একটু তেল দাও।"

শ্যামা। আর তেল নাই।

গোপাল। আমার তেল আর নাই ?

শ্যামা। একটুখানি আছে, কিন্তু তা দিলে তুমি পড়্‌বে কিসে ?

গোপাল। আজ আমার একে দেরি হয়েছে। তায় তেল কম হ'লে আরও কত বক্‌বে। আজ আর আমি পড়বো না।

গোপাল পড়িবার জন্যে শ্যামার বেতন হইতে পয়সা দিয়া তৈল কিনিয়া আনিতেন। প্রায়ই সেই তৈল হইতে মাঝে মাঝে ঘুস দিতে হইত। তাহা না হইলে বাবুর স্ত্রী বলিতেন, "সব চুরি করিল।"

গোপাল রন্ধনাদি করিয়া থালায় থালায় ভাত বাড়িয়া বাবুকে, বাবুর স্ত্রীকে, কানাই বাবুকে ও খোকা খুকীকে দিয়া আসিলেন। পরে শ্যামার জন্যে ভাত বাড়িয়া নিজে আহার করিতে বসিবেন, এমন সময় কানাই বাবু কি চাহিলেন; গোপাল গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর আপনাদের কিছু চাই ?"

কর্ত্তাবাবু সক্রোধে কহিলেন. "তুমি যে দিন দিন নবাব সেরাজুদ্দৌলা হচ্ছ। ভাত দিয়ে একটু দাঁড়াতে পার না ? অমন করলে আমার এখানে চাক্‌রি করা পোষাবে না।"

কানাই বাবুর মুখে আর হাসি ধরে না। গোপাল অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কানাই বাবু কহিলেন, "সেরাজুদ্দৌলা ! মাছ আছে আর ?"

গোপাল সে দিবস বাবুদিগের মনস্তুষ্টি করিবার জন্য যা কিছু ভাল জিনিস ছিল, সকলই বাবুদিগকে দিয়াছিলেন, সুতরাং কানাই বাবুকে কহিলেন, "আর মাছ নাই।"

বাবুর স্ত্রী কহিলেন, "চার পয়সার মাছ সব ফুরিয়ে গেল ?"

গোপাল। সবই আপনাদের দিয়েছি।

কানাই বাবু কহিলেন, "আচ্ছা, তরকারির জায়গাখান দেখি।"

গোপাল নিজের জন্যে ও শ্যামার জন্যে যাহা পাতে রাখিয়াছিলেন, একত্র করিয়া কানাই বাবুর কাছে লইয়া দেখাইলেন। কানাই বাবু দেখিয়া বলিলেন, "তুমি নীচে রেখে এসেছ।"

গোপাল দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "তবে আমি এইখানে থাকি, আপনাদের আহার হ'লে আমার সঙ্গে আসিয়া দেখুন।"

কানাই বাবু রাগ করিয়া কহিলেন, "যত বড় মুখ তত বড় কথা ?" গোপাল আর উত্তর করিলেন না। বাবুদিগের আহারাদি হইলে নীচে আসিয়া শ্যামাকে কহিলেন, "দিদি, তুমি খাও ; আজ আমি খাব না।"

শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন খাবে না ?"

বাবুদিগের কথা শুনিয়া গোপালের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সে কথা না বলিয়া কহিলেন, "আজ হেমবাবুদের বাড়ী জল খেয়ে আমার আর ক্ষুধা নাই।"

গোপাল কি জন্যে আহার করিলেন না, শ্যামা বুঝিতে পারিল এবং নিজেও আহার না করিয়া শয়ন করিতে গেল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শ্যামার অভিপ্রায় জানা চাই

হেমচন্দ্র গোপালকে বিদায় দিয়া রামকুমার নামক চাকরকে ডাকিলেন। রামকুমার বাটীর বহু কালের চাকর, হেমকে হইতে দেখিয়াছে, তাঁহাকে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছে, তাঁহাকে অপত্যনির্বিশেষে স্নেহ করে ও প্রভুর ন্যায় ভক্তি করে। কলিকাতায় রামকুমার হেমের অভিভাবক-স্বরূপ থাকে, চাকর-স্বরূপ নহে। যুবকেরা প্রায়ই "কর্ত্তাদের" আমলের চাকরদিগের উপর বিরক্ত। কারণ, তাহারা প্রভুকে প্রভুর মতন দেখে না; স্নেহের পাত্র-স্বরূপ জ্ঞান করে। তাহাদিগের উপর হুকুম চলে না। যখন তাদের ইচ্ছা হয়, তখনি কাজ করে। কিন্তু রামকুমার বৃদ্ধ, তাহার কাজ করিবার সামর্থ্য নাই। কেহই তাহাকে কিছু করিতে কহে না, সুতরাং তাহার উপর কাহারও রাগ হইবার কারণ নাই।

হেমের ডাক শুনিয়া রামকুমার কাছে আসিয়া তক্তাপোশের উপর বসিল। হেম জিজ্ঞাসিলেন, "রামকুমার, যে ছেলেটি এসেছিল, তাকে দেখেছ ?"

রামকুমার। হাঁ, এই ত দেখ্‌লাম।

হেম জিজ্ঞাসেলেন, "কেমন দেখ্‌লে ?"

রামকুমার উত্তর করিল, "দেখতে ত ভালই দেখলাম। বেশ শিষ্টু, শান্ত; কিন্তু পেটে কি গুণ আছে, তা আমি কেমন ক'রে জানতে পারবো ?"

হেম একটু হাসিয়া কহিলেন, "রামকুমার, তুমি সহজে কারুকে ভাল বল্‌তে চাও না।"

রামকুমার উত্তর করিল, "তোমারও যখন আমার মতন বয়স হবে, তখন তুমিও সহজে কারুকে ভাল বল্‌বে না। কিন্তু আমি ত নিন্দে করি নাই। ছেলেটির নাম কি ?"

হেমবাবু কহিলেন, "নাম ত জিজ্ঞাসা করি নাই। কিন্তু লেখাপড়ায় বেশ। কেমন মিষ্টি কথাগুলি, কেমন বিনয় !" এই কথা বলিয়া হেম রামকুমারের মুখের দিকে তাকাইলেন, রামকুমারের অভিপ্রায় কি, জানিবার জন্য।

রামকুমার কথা কহিল না। একবার ঊর্দ্ধাধোভাবে মুখ নাড়িল।

হেমবাবু কহিলেন, "রামকুমার, ছেলেটি অতি কষ্টে আছে। এক বাসায় থেকে রেঁধে খেয়ে ইস্কুলে পড়তে হয়। দেখলে ছেলেটিকে গরিব লোকের ছেলে বোধ হয় না। হাত দুইটি কেমন নরম। বোধ হয়, কোন দৈব ঘটনায় দরিদ্র হয়েছে।"

রামকুমার বিষাদিত মুখে কহিল, "হবে।"

রামকুমারের উত্তর হেমের নিকট বড় ভাল লাগিল না। গোপালের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার অবস্থার বিষয় অবগত হওয়া পর্য্যন্ত, হেমের ইচ্ছা হইয়াছে, গোপালকে আনিয়া নিজ বাটীতে রাখেন। কিন্তু এ প্রস্তাব রামকুমারের মুখ

হইতেই প্রথমে নির্গত করাইবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সুতরাং রামকুমার সে সম্বন্ধে কিছু না বলায় কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইলেন।

একটু পরে আবার কহিলেন, "আচ্ছা রামকুমার, আমরা যদি হঠাৎ গরিব হয়ে যাই, তা হ'লে কি হবে ?"

রামকুমার একটু গম্ভীর হইয়া কহিল, "মা কালীর ইচ্ছায় তা তোমরা হবে না। যদি বিদ্যা শিখিতে পার, তবে তোমার টাকার ভাবনা কি ?"

রামকুমার তথাপি পথে আইল না।

হেমচন্দ্র কহিলেন, "আচ্ছা, যদি বিদ্যা না শিখবার আগেই গরিব হই, তা হ'লে আমাদেরও হয় ত কারুর বাড়ী ভাত রান্‌তে হবে।"

রামকুমার কহিল, "না না। এমন কথা মুখের আগায়ও আনতে নাই।"

এমন সময় আহারের জায়গা করিয়া ব্রাহ্মণ হেমবাবুকে আহার করিতে ডাকিল। হেমবাবু বিরস বদনে আহার করিতে গেলেন। আহারান্তে উপরে গিয়া শয়ন করিলেন। ক্ষণকাল বিলম্বে রামকুমারও আহার করিয়া উপরে গেল। রামকুমার বাবুর শয়ন ঘরেই শুইয়া থাকে।

হেমচন্দ্র পান খাইতে খাইতে পুনরায় কহিলেন, "রামকুমার আমরা খাওয়া-দাওয়া ক'রে শুলাম ; কিন্তু সে ছেলেটি বোধ হয় এখনও রাঁধছে।"

রামকুমার উত্তর করিল, "সকলের অদেষ্ট কি সমান ? তা হ'লে পৃথিবী চলতো না। সকলেই ত তা হলে মুনীব হ'ত। চাকোর আর পাওয়া যেত না।"

রামকুমারের কথা শুনিয়া হেম ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন, পরে কহিলেন, "রামকুমার, ছেলেটিকে দেখে আমার বড় দুঃখ হয়েছে। আমার ইচ্ছা করছে, ওকে এনে আমার এইখানে রাখি। তা হ'লে ওর কষ্ট থাকবে না, অনায়াসে চারটি রাঁধা-ভাত পাবে।"

বালককালাবধি হেমচন্দ্রের যাহা যখন ইচ্ছা হইয়াছে, তাহাই সম্পাদিত হইয়াছে। বিশেষ, তাঁহার মাতার কাল হওয়া অবধি তাঁহাকে কেহ উচ্চ কথাটি কহে নাই। রামকুমার হেমের কথা শুনিয়া কহিল, "তোমার ইচ্ছে হয়ে থাকে আন।"

হেম কহিলেন, "বাবা কি কিছু বল্‌বেন ?"

রামকুমার উত্তর করিল, "তিনি কি কখন কিছু তোমাকে বলেছেন যে আজ বল্‌বেন ? তিনি চারটি ভাত দিতে কাতর ? শত শত লোক দুর্গার আশীর্ব্বাদে তোমাদের বাড়ীতে খাচ্ছে। আজ একজনের কথা শুনেই কি তিনি রাগ করবেন ?"

হেম। তবে তাঁকে একখানা পত্র লিখি ; আর ও ছেলেটিকেও কাল এখানে আনি।

রাম। পত্র লিখলেও হয়, না লিখলেও হয়।

হেম, রামকুমারের আশ্বাস-বাক্যে যার-পর-পর-নাই সন্তুষ্ট হইলেন। প্রফুল্লচিত্ত হইয়া নিদ্রা যাইবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু সহসা নিদ্রা না হওয়ায় উঠিয়া বসিলেন এবং প্রদীপ জ্বালিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন।

রজনী প্রভাত হইলে হেমচন্দ্র শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। একটু এ-পুস্তক ও-পুস্তক পাঠ করিয়া হীরে নামক চাকরকে ডাকিয়া গোপালকে ডাকিয়া আনিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। গোপাল প্রাতঃকালে রন্ধনাদিতে ব্যস্ত থাকেন, সুতরাং হেমের নিকট আসিতে পারিলেন না। কিন্তু বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি ইস্কুলে যাইবার সময় হেমবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবেন।

অন্যান্য দিবস অপেক্ষা অদ্য গোপাল সত্বরে পাকশাক সমাধা করিয়া বাবুদিগকে আহার করাইলেন এবং নিজে চারিটি নাকে মুখে দিয়া স্কুলে যাইবার জন্য বাহির হইলেন। হেমবাবুর ধুতিখানি যত্নপূর্ব্বক পাট করিয়া একখানি কাগজে মুড়িয়া লইয়া চলিলেন। হেমবাবুর বাসার কাছে আসিয়া গোপালের যেন শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। রাস্তায় একটু থামিয়া পুনর্ব্বার চলিলেন। হেমবাবু রাস্তার ধারে জানালার কাছে বসিয়া ছিলেন; গোপালকে দেখিতে পাইয়া সত্বরে বাহির আসিয়া গোপালের হাত ধরিয়া লইয়া তক্তাপোশের উপর বসাইলেন। গোপাল ধুতিখানি আস্তে আস্তে বিছানার উপর রাখিলেন। হেম জিজ্ঞাসিলেন, "এ কি? আপনি এ আনলেন কেন?"

গোপাল কহিলেন, "যখন আপনার চাকর গিয়েছিল, তখন শুখায় নি ব'লে পাঠিয়ে দিতে পারি নাই।"

হেমচন্দ্র কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "আমি হীরেকে কাপড়ের জন্যে পাঠাই নাই। আপনাকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছিলাম।"

গোপাল কথা কহিলেন না।

হেম পুনরায় কহিলেন, "কাল রাত্রে আমি এক বিষয় স্থির করেছি। আপনাকে বল্‌বো মনে করেছি, কিন্তু বল্‌তে শঙ্কা হচ্ছে।"

গোপাল মুখ তুলিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, "আমার সহিত আপনি কথা কন, এ আপনার অনুগ্রহ। শংকা কি?"

হেমচন্দ্র উত্তর করিলেন, "তবুও শংকা হচ্ছে। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, ত বলি।"

গোপাল কহিলেন, "আমি আর কি মনে করবো? কিন্তু এই মাত্র অনুরোধ করিতে ইচ্ছা করি যে, আপনি আমাকে 'আজ্ঞা মহাশয়' ব'লে কথা কবেন না।"

হেম হাসিয়া উঠিলেন। গোপালও হাসিয়া কহিলেন, "আমি রসুয়ে বামুন; আমাকে 'আজ্ঞা মহাশয়' ব'লে কথা কইলে আমার বড় লজ্জা হয়; আর লোকেই বা শুনে কি বলবে?"

হেম হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "তবে কি বলবো?"

গোপাল কহিলেন, "আমার নাম ধরে ডাকবেন।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তবে আমার একটা কথা আপনার রাখতে হবে।"

গোপাল। কি কথা?

হেম বলিতে গিয়া একটু হাসিয়া আর বলিলেন না। ইতিমধ্যে হীরে তামাক দিয়া গেল। হেম তামাক খাইতেছেন আর ভাবিতেছেন, কি প্রকারে তাঁহার মনোগত বিষয়ের প্রস্তাব করিবেন। ক্ষণকাল তামাক টানিয়া গোপালকে হুঁকা দিয়া কহিলেন, "খান মহাশয়।"

গোপাল হুঁকাটি লইয়া বৈঠকে রাখিলেন।

হেম কহিলেন, "তাও ত বটে, আপনি তামাক খান না। তবে আমাকে দিলেন না কেন, আমিই রাখ্‌তাম।"

এই কথার পর উভয়ে একটু চুপ করিয়া রহিলেন। গোপাল হেমের আলমারির দিকে চাহিতে লাগিলেন। হেম এই অবকাশ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বলেছিলেন বই নিয়ে যাবেন, কিন্তু তাতে অসুবিধা হবে না? হয় ত এক সময়ে আপনার ও আমার এক বয়েরই দরকার হ'তে পারে।"

গোপাল কহিলেন, "আপনার দরকার হ'লে অবশ্য আমি নেবো না। তবে আপনার যে-সমস্ত বই দরকার না হবার সম্ভব, তাই যদি মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে যেতে দেন, তাহা হ'লেই আমার যথেষ্ট উপকার হয়।"

হেম উত্তর করিলেন, "আমি সে অভিপ্রায়ে বলি নাই। আমার মনোগত ভাব এই যে, দু-জনে এক স্থানে থাকলে ভাল হয়।"

গোপাল হেমের মুখ পানে চাহিয়া কহিলেন, "আপনার না এক জন ব্রাহ্মণ আছে?

হেম। আপনাকে কি আমি ব্রাহ্মণ হয়ে থ্যক্‌তে বলছি? আমিও যেমন থাকবো, আপনিও তেমনি থাকবেন, এই আমার ইচ্ছা।

গোপাল কথা কহিলেন না। অবনত মুখে মাটি দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন। হেমও ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলেন?"

গোপাল গাঢ়স্বরে কহিলেন, "মহাশয়, আমি একলা নই। আমার এক দিদি আছে। আমরা দু-জনেই এক জায়গায় থাকি।"

হেম বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আপনার কেমন দিদি?"

গোপাল ছল ছল নেত্রে উত্তর করিলেন, "মহাশয়, আমাদের অবস্থা চিরকাল এরূপ ছিল না। আমার মায়ের শ্যামা নামে এক জন দাসী ছিল, সে-ই আমাকে প্রতিপালন করেছে বল্লে হয়। যত মায়ের ধার না ধারি, শ্যামার কাছে তদপেক্ষা সহস্র ঋণী আছি। এককালে কোন দুর্ঘটনাবশতঃ আমাদের অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থা হয়েছিল; তখন শ্যামার পূর্বসঞ্চিত কিঞ্চিৎ ধন ছিল, তাতেই আমাদের জীবন রক্ষা হয়েছে। মা মরবার সময় আমাকে শ্যামার হাতে সমর্পণ ক'রে গিয়েছিলেন। সেই অবধি আমরা যেখানে যাই, দু-জনেই একত্র যাই, শ্যামা আমাকে না দেখলে তিন দিনেই মরে যাবে।"

গোপালের কথা শুনিয়া হেমচন্দ্রের চক্ষে জল আসিল।

রামকুমার এমন সময় বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। হেম কহিলেন, "রামকুমার, আমি যা বলেছিলান, তাই।"

রামকুমার জিজ্ঞাসিল, "বাবু কবে বাসা তুলে আন্‌বেন ?"

হেম শ্যামার বৃত্তান্ত রামকুমারকে কহিলেন। রামকুমার কহিল, "সে ত ভালই। তুমি ত বলেছিলে, এক জন দাসী রাখবে। শ্যামা একটু একটু যদি কাজকর্ম্ম করতে পারে, তা হ'লে আর এক জন রাখবার দরকার হবে না।"

গোপাল কহিলেন, "আমি কেমন ক'রে ওখান থেকে ছেড়ে আস্‌বো ?"

হেম। তারা কি তোমাকে এত ভালবাসে ?

গোপাল কহিলেন, "না"।

হেম পুনর্ব্বার ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

গোপাল উত্তর করিলেন, "চাকরকে কে ভালবাসে মহাশয় ? কাল আপনি যেতে দেন নাই ব'লে কত বক্‌লে, আর—" এই বলিয়া থামিলেন।

হেম একটু চুপ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আর—কি ?"

গোপাল। না মহাশয় ! যার অন্ন খেয়েছি, তার নিন্দা করবো না।

হেম। আচ্ছা সে কথা যাক্‌, এখন আসবার কি ?

গোপাল। দিদির কাছে না জিজ্ঞাসা ক'রে বল্‌তে পারি না।

হেম। তবে কখন বল্‌বেন ?

গোপাল। আজ সন্ধ্যার সময় ইস্কুল থেকে এসে বলবো।

গোপাল ইস্কুল হইতে বাটী আসিয়া রান্না চড়াইয়া দিয়া শ্যামার নিকটে সমুদায় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া শ্যামার চক্ষু হইতে ধারা বহিতে লাগিল। একটু পরে কহিল, "হেমবাবুর বাড়ী গেলে কিছু ক্ষতি নাই, কিন্তু তার বাড়ীর অন্যান্য লোক কেমন ? তারা যদি দূর ছাই করে, তা হ'লে কি হবে ? এখানে তবু এক রকম চাকরের মত থাকি, কেহই জানতে পারে না। কিন্তু সেখানে তুমি সব কথা ব'লে ফেলেছ, সেখানকার চাকর-বাকরের উঁচু কথা বরদাস্ত হবে না।"

গোপাল কহিলেন, "দিদি, তিনি এমনি ক'রে জিজ্ঞাসা করতে লাগিলেন, আমি যে না ব'লে থাকতে পারলাম না।"

শ্যামা। আমি সে জন্য তোমাকে দোষ দিচ্ছি না।

ক্ষণকাল উভয়ে চুপ করিয়া থাকিয়া শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মত কি ?"

গোপাল কহিলেন, "আমার সেইখানে যেতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তুমি যদি যেতে না বলো, তবে যাব না ; আমি ত কখন তোমার অবাধ্য হয়ে কোন কাজ করি নাই।"

শ্যামা কহিল, "আমারও তাই ইচ্ছা। কিন্তু এদের ত খবর দেওয়া উচিত। কাল সকালে যদি আমরা চলে যাই তবে এদের কি উপায় হবে ?

শ্যামার কথা শুনিয়া গোপালের যার-পর-নাই আহ্লাদ হইল। রন্ধন শেষ হইলে এক দৌড়ে হেমবাবুর বাটীতে গিয়া শ্যামার মত বলিয়া আসিলেন। হেমবাবুও শুনিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নবনারী

পূজা আসিতেছে। শরতের সমাগমে বসুন্ধরা উল্লাসে নৃত্য করিতেছে। বধূেরা সম্বৎসরের পর মহামায়ার শ্রীচরণে জবা বিল্বদল দিবে বলিয়া আনন্দে ভাসিতেছে। বিদেশস্থ যুবকেরা প্রণয়িনীর মনস্তুষ্টি করিবার নিমিত্ত নানাবিধ দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেছে; বিরহিণী মনে মনে কতই রসপূর্ণ কথার হার গাঁথিতেছে। বালকেরা ইস্কুল বন্ধ হইবে বলিয়া কতই আমোদ করিতেছে। দীন দুঃখী সম্বৎসরের পর একখানি নূতন বস্ত্র পরিতে পাইবে বলিয়া মনে মনে কতই উল্লসিত হইতেছে।

এক স্থানে বাসজনিত গোপাল ও হেমের পরস্পর অত্যন্ত সৌহার্দ্দ জন্মিল। গোপাল হেমকে দাদা বলিয়া ডাকেন এবং হেমও গোপালকে সহোদরের ন্যায় স্নেহ করেন।

হেমচন্দ্র কহিলেন, "গোপাল, তুমি কি বাড়ী যাবে? যদি না যাও, তা হ'লে আমাদের বাড়ী চল।"

গোপাল উত্তর করিলেন, "আমার বাড়ী যাওয়া হবে না। আপনি যদি নিয়ে যান, তবে আপনাদের বাড়ী যাই।"

হেম ও গোপাল বাড়ী-আসা অবধি স্বর্ণলতা গোপালকে "গোপাল দাদা" বলিয়া ডাকেন। গোপাল দাদা না পড়াইলে স্বর্ণলতার পড়া হয় না। কোন বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইলে গোপাল দাদার কাছে যান। গোপাল যেন যথার্থই স্বর্ণের সহোদর।

হেম জিজ্ঞাসিলেন, "স্বর্ণ, তুমি আজ ক'দিন পড়লে না?"

স্বর্ণলতা হাসিয়া কহিলেন, "পড়বো না কেন? আমি ত রোজই পড়ি।"

হেম। তোমার বই আন দেখি, আমি পড়াই।

স্বর্ণ হাসিতে হাসিতে একখানি নবনারী আনিয়া হেমের সম্মুখে রাখিলেন।

হেম জিজ্ঞাসিলেন, "কোথায় পড়বে?"

স্বর্ণ উত্তর করিলেন, "সীতা।"

হেম সেইখানে খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং এক এক ছেদ পর্য্যন্ত পড়িয়া স্বর্ণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "বুঝেছ ত?"

স্বর্ণ ক্ষণকাল মনোনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "দাদা, তুমি বড় তাড়াতাড়ি পড়, আমি তোমার কাছে পড়বো না। গোপাল দাদার কাছে পড়'বো।"

হেম। তবে ডাক তোমার গোপাল দাদাকে।

স্বর্ণ হেমের পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। গোপালকে ডাকিবার আজ্ঞা পাইবা মাত্র গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে গেলেন। গোপাল বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন।

স্বর্ণলতা তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া কহিলেন, "গোপাল দাদা, তোমাকে দাদা ডাক্‌ছে।"

গোপাল জিজ্ঞাসিলেন, "কেন?"

স্বর্ণ। এস ত তবে টের পাবে।

স্বর্ণ গোপালের হস্ত ধরিয়া টানিয়া আনিলেন, গোপাল হাসিতে হাসিতে স্বর্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। যে ঘরে হেমচন্দ্র বসিয়াছিলেন, সেই ঘরে লইয়া গিয়া স্বর্ণ গোপালকে হেমের নিকটে বসাইলেন। গোপাল জিজ্ঞাসিলেন, "দাদা আমাকে ডেকেছ কেন?"

হেম কহিলেন, "গোপাল, তুমি অমন পরের মতন বাইরে বাইরে থাক কেন? তুমি কি এ পরের বাড়ী মনে করো?"

গোপাল কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "বৈঠকখানায় সকলে ব'সে আছে, আমিও ছিলাম।"

হেম। স্বর্ণ ত আর আমার কাছে পড়বে না। আমার পড়ান ওর মনোমত হয় না।"

গোপাল পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। একটি একটি কথা পড়িয়া তাহার একটি একটি প্রতিশব্দ দিয়া স্বর্ণলতাকে বুঝাইতে লাগিলেন। স্বর্ণের চক্ষু পুস্তকে নাই। তিনি একদৃষ্টে গোপালের মুখ পানে চাহিয়া আছেন। এক ছেদ সমাপ্ত হইলে পুস্তক হইতে চক্ষু উত্তোলনপূর্ব্বক স্বর্ণলতাকে নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বুঝেছেন ত?" স্বর্ণলতার মুখ পানে দৃষ্টি করিবার সময় মুখ আরক্তিম হইল। স্বর্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "গোপাল দাদা, তুমি 'আপনি' বলো কারে?"

গোপালের মুখ কর্ণ পর্য্যন্ত লোহিতবর্ণ হইল।

তিনি পূর্ব্বে স্বর্ণলতাকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন, আজ 'আপনি' বলিলেন কেন?

হেমচন্দ্র বিছানায় শয়ন করিয়া গোপালের পড়া শুনিতেছিলেন। ক্ষণকাল পরে তথা হইতে চলিয়া যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। তদ্দর্শনে গোপাল কহিলেন, "দাদা কোথায় যাও? একটু দেরি করো, আমিও যাব, এইটুকু পড়ানো হ'লেই হয়।"

হেম কহিলেন, তুমি পড়াও, আমি এখনই আস্‌বো।" এই বলিয়া হেমচন্দ্র চলিয়া গেলেন।

গোপাল অবনত মুখে স্বর্ণলতাকে পড়াইতে লাগিলেন। স্বর্ণলতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপাল দাদা, আজ তোমার কি হয়েছে? তুমি মাটির দিকে চেয়ে আছ কেন?"

গোপাল উত্তর করিলেন, "না, কিছু হয় নি। আপনি পড়ুন।"

স্বর্ণ কহিলেন, "গোপাল দাদা, আজ আবার ও একটা নূতন কথা শিখলে কোথা থেকে ? আমাকে ত আগে তুমি 'আপনি' বলতে না।"

গোপাল একবার স্বর্ণলতার মুখ পানে নিরীক্ষণ করিলেন। পুনরায় মৃত্তিকার দিকে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "স্বর্ণ, আমি বড় গরীব মানুষ। আমি একজনের বাড়ী রসুয়ে বামুন ছিলাম। আমার মতন লোকের মান্য ক'রে কথা কওয়া উচিত।"

এই কথা কহিয়া গোপাল পুনরায় স্বর্ণলতার মুখ পানে চাহিলেন। স্বর্ণ দেখিলেন, তাঁহার গোপাল দাদার চক্ষে জল আসিয়াছে।

স্বর্ণ গোপালের মন অন্য দিকে লইয়া যাইবার জন্য জিজ্ঞাসিলেন, "গোপাল দাদা, তোমাদের বাড়ীতে পূজা হবে ?"

গোপালের দুঃখ যে এ কথায় দ্বিগুণ হইবেক, তাহা স্বর্ণ বুঝিতে পারেন নাই।

গোপাল ম্লানমুখে কাতর স্বরে কহিলেন, "আমরা গরিব মানুষ, আমাদের বাড়ী কেমন ক'রে পূজা হবে ?" গোপালের চক্ষে জল আসিয়াছিল, তাহা এক্ষণে ঝর ঝর ঝরিতে লাগিল। গোপাল মাটির দিকে চাহিলেন।

উভয়ে ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া স্বর্ণলতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপাল দাদা, তোমার ঠাকুর-মা কোথায় ?"

গোপাল উত্তর করিলেন, "আমার ঠাকুর-মা নাই।"

স্বর্ণ। মা ?

গোপাল। মাও নাই।

স্বর্ণলতার মুখ ম্লান হইল। কাতর স্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "গোপাল দাদা, আমার মা'র কথা কিছু জান ?"

গোপাল। কেন ?

স্বর্ণ। আমি পাড়ায় যাদের সংগে খেলা করতে যাই, সকলেরই মা আছে, আমারই নাই। ঠাকুর-মাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, সকলের মা থাকে না। বাবাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি কাঁদেন। দাদাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি কথা কন না। তুমি আমার মা'র কথা কিছু জান ?

গোপাল কহিলেন, "স্বর্ণ, তোমার মা মরেছেন।"

স্বর্ণ। তোমার মাও কি মরেছেন ?

গোপাল। হাঁ তিনিও মরেছেন।

স্বর্ণ। তবে আমরা দুজেই সমান।

স্বর্ণলতার কথা শুনিয়া গোপালের শোকাবেগ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল। অধোবদনে বসিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। স্বর্ণলতা কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া হাসিয়া কহিলেন, "গোপাল দাদা, তুমি কাঁদ কেন ? আমার ত

মা নেই ; কিন্তু আমি ত কাঁদি না।" এই বলিয়া স্বর্ণলতা গোপালের হাত ধরিয়া কহিলেন, "গোপাল দাদা, চল যাই ঠাকুর দেখি গে। তোমাদের দেশে এমন ঠাকুর হয় ?"

গোপাল কথা কহিলেন না।

স্বর্ণলতা পুনর্ব্বার কহিলেন, "গোপাল দাদা শীঘ্র চল না। তুমি কি চলতে পার না ?"

কিছু দূর আস্তে আস্তে গিয়ে গোপালের চক্ষের জল শুকাইল, পরে একটু হাসিয়া কহিলেন, "স্বর্ণ, আমার এ কান্নার কথা দাদার কাছে ব'লো না।"

স্বর্ণ কহিলেন, "তবে আমি যে মা'র কথা বল্লাম, এও কারু সঙ্গে ব'লো না।" গোপাল কহিলেন, "না, আমি বল্‌বো না।" স্বর্ণ কহিলেন, "তবে আমিও ব'ল্‌বো না।"

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নূতন নূতন ভাব

এই অবধি স্বর্ণলতার সহিত গোপালের এক গোপনীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। গোপাল স্বভাবতই লাজুক ; কিন্তু এই অবধি তাহার লজ্জা যেন সহস্রগুণ বৃদ্ধি হইল। গোপাল আর অন্তঃপুরে যান না। সর্ব্বদাই বাহির্বাটীতে বসিয়া থাকেন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে সর্ব্বদাই কথাবার্ত্তা কহিতেন, কিন্তু এখন আর কথাবার্ত্তা কহিতে ভালবাসেন না। যেখানে অধিক লোক জন বসিয়া থাকে, আস্তে আস্তে তথা হইতে গিয়া অন্য এক স্থানে বসেন। হেমচন্দ্র এক বৎসর পর বাটী আসিয়াছেন। এ-বাড়ী ও-বাড়ী যাইতেই তাঁহার দিন অতিবাহিত হইয়া যায়। যখন গোপালের সহিত সাক্ষাৎ হয়, গোপালের বিরস বদন দেখিয়া মনে করেন, গোপাল বাটীর ভাবনা ভাবিতেছে। হঠাৎ দুই এক দিবস গোপালের অজ্ঞাতসারে তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহার চক্ষের জল দেখিলেন। দুই এক দিবস গোপালের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন ; গোপাল জানিতে পারেন নাই। শব্দ করিলে চমকিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "কে ও ?"

এক দিবস হেম জিজ্ঞাসিলেন, "গোপাল, তুমি এমন হয়ে গেলে কেন ? তোমার কি কোন অসুখ হয়েছে ?" গোপাল উত্তর করিলেন "অনেক দিন বাবার কোন সমাচার পাই নাই, তিনি কেমন আছেন টের পেলুম না।"

হেমচন্দ্র, গোপাল যে তক্তাপোশে বসিয়াছিলেন, তাহার উপর উপবেশন করিয়া বলিলেন, "ভয় কি, তিনি ভাল আছেন। তুমি তাঁকে পত্র লিখেছ ?" গোপাল কহিলেন, "না।"

হেমচন্দ্র বলিলেন, "তবে একখান পত্র লেখা উচিত।" এই বলিয়া কাগজ কলম আনিয়া পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। খানিক লিখিয়া কহিলেন, "গোপাল

আমার লেখাটা ভাল বোধ হচ্ছে না ; হয় ত আমার হাতের পত্র পেয়ে তিনি মনে করবেন, তোমার কোন পীড়া হয়েছে, তাই তুমি লিখতে পারলে না। তুমিই পত্রখান লেখ।”

গোপাল পত্র লিখিলেন।

চিঠির জবাব আসিল। বিধুভূষণ লিখিয়াছেন, “আমি ভাল আছি, সে জন্য চিন্তা করিবে না। হেমবাবু ও তোমার কুশল সমাচার লিখিবে।” আগে হেমবাবুর নাম, পরে “তোমার কুশল সমাচার।” হেমবাবুর তাহাতে বড় আহ্লাদ হইল। পিতার চিঠি পাইয়া গোপালের চিত্তও অপেক্ষাকৃত ভাল হইল।

যে দিবস গোপাল ও স্বর্ণলতার পূর্বপ্রকাশিত কথোপকথন হইয়া যায়, সেই অবধি স্বর্ণলতারও অন্তরে এক অভূতপূর্ব ভাবের উদয় হইল। সে কোন্ ভাব ? স্বর্ণলতা বলিতে পারে না, সে কোন্ ভাব। গোপালকে দেখিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু আর গোপালের কাছে যাইতে পারেন না। আর পূর্বের মতন তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিবার ক্ষমতা হয় না, হেম অন্তঃপুরে আসিলে যদি গোপাল সঙ্গে না থাকিতেন, তাহা হইলে স্বর্ণলতা পূর্বে পূর্বে জিজ্ঞাসা করিতেন, “দাদা, গোপাল দাদা কোথায় ?” কিন্তু এখন আর সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না।

হেমকে দেখিলেই তাঁহার হৃদয় কম্পিত হয়। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর কেহ আসিতেছে কি না, উঁকি মারিয়া দেখেন। যদি আর কাহাকে না দেখিতে পান, তবে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া কার্য্যান্তরে, কি স্থানান্তরে গমন করেন। গোপাল যখন হেমের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেন, স্বর্ণলতা আর সে দিকে নিরীক্ষণ করিতে পারিতেন না। দেবে তাঁহার ও গোপালের চারি চক্ষু একত্র মিলিত হইলে উভয়েই অন্য দিকে চাহিতেন। কিন্তু অন্য দিকে চাহিয়াও অধিক ক্ষণ থাকিতেন না। স্বর্ণলতা আর গোপালকে “গোপাল দাদা” বলিয়া সম্বোধন করেন না। নাম উল্লেখ দূরে থাকুক, কোন তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে গোপালের সহিত এক স্থানে থাকেন না। হঠাৎ একাকিনী গোপালের সম্মুখে পড়িলে তাঁহার মুখ চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। পড়াশুনা বন্ধ হইয়াছে। পুস্তকে মন লাগে না ; গোপাল দাদাকে আর পড়িবার জন্য ডাকেন না। গোপাল দাদাকে না দেখিলে চিত্ত যার-পর-নাই চঞ্চল হয়, কিন্তু গোপাল সম্মুখে থাকিলে তাহার মুখ পানে নিরীক্ষণ করিতে ভরসা হয় না।

স্বর্ণলতা যেন হঠাৎ বালিকাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনে অধিরূঢ়া হইলেন। পূর্বে যে সমস্ত আমোদ-প্রমোদে তাঁহার মন নিবিষ্ট হইত, এক্ষণে তাহাতে ঘৃণা জন্মিল ; খেলা আর ভাল লাগে না। খেলিবার নাম শুনিলে তাঁহার হাসি পায়। ঠাকুরমার উপন্যাস আর সত্য বলিয়া বোধ হয় না। চিন্তাই যেন তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।

পূজা অন্তে গোপাল ও হেম এক দিবস বসিয়া আছেন। বিপ্রদাস তথায়

আসিলেন। কর্ত্তাকে দেখিয়া তাঁহাদিগের কথা বন্ধ হইল। বিপ্রদাস হেমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কলিকাতায় যাবার দিন স্থির করা হ'ল ?"

হেম উত্তর করিলেন, "আপনি যে দিন স্থির ক'রে দেবেন, সেই দিনই যাব।"

বিপ্রদাস একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "স্বর্ণ'র ত আর বিবাহ না দিলে নয়, তার কি বলো দেখি ?"

হেম। সে বিষয়ে আমি কি বল্‌বো ? আপনার যে অভিপ্রায়, তাই হবে।

এই কথায় গোপালের বোধ হইল, যেন তাহার মুখ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। তথা হইতে উঠিয়া যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। বিপ্রদাস কহিলেন, "কোথা যাও বাবা ? ব'সো ব'সো, উঠে যাবার দরকার নাই।"

হেম কহিলেন, "না, গোপাল একটু বেড়াক। ওর শরীর বড় ভাল নাই।"

গোপাল কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া গেলেন।

বিপ্রদাস কহিলেন, "তিন চার জায়গা থেকে প্রস্তাব এসেছে, কিন্তু আমার কোনটাই মনোমত হয় না। শ্রীরামপুরের কাছে একটি পাত্র আছে; সে না-জানে লেখাপড়া, না তাকে দেখতে শুনতে ভাল; কিন্তু ঠাকুর মহাশয়" (বলিয়া বিপ্রদাস গুরুচরণে প্রণাম করিলেন) "সেইখানেই শুভ কর্ম্ম করতে অনুরোধ করেছেন।"

হেম উত্তর করিলেন, "সে পাত্র যদি ভাল না হয়, আর যদি লেখাপড়া না জানে, তা হ'লে সেখানে শুভ কর্ম্ম করা কোন মতেই উচিত নয়।"

"আমিও ত বাপু তাই বলি" বিপ্রদাস কহিলেন। "আমিও ত তাই বলি। এই জন্যে আমি কোন জবাব দিই নাই, বলেছি—তোমার সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে কোন কথা বলতে পারি না।"

হেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কোথা থেকে প্রস্তাব এসেছে ?"

বিপ্রদাস। আরও দুই তিন স্থান হ'তে এসেছিল, কিন্তু আমি তাহাদের জবাব দিয়েছি। কোনখানের পাত্রই ভাল বোধ হয় না।

হেমচন্দ্র একটু বিলম্বে কহিলেন, "গোপালের সহিত বিবাহ দিলে হয় না।"

বিপ্রদাস। কোন্ গোপাল ?

হেম। এই যে আমাদের গোপাল ; এই মাত্র উঠে গেল।

বিপ্রদাস হেমের কথা শুনিয়া একটু চিন্তা করিলেন, পরে কহিলেন, "তুমি বল্লে না, ওদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ? পাত্রটি মনোমত বটে। যেমন দেখতে শুনতে, তেমনি লেখা পড়া বোধ আছে। কিন্তু বড় গরিব।" এই বলিয়া বিপ্রদাস একটু মুখ বাঁকাইলেন।

হেমচন্দ্র উত্তর করিলেন, "আপনি স্বর্ণকে যে টাকা উইল ক'রে দিলেন, তা পেলে আর স্বর্ণের ভাবনা কি ? ঐ রেখে খেতে পারলে কত পুরুষ বড়মানুষের ন্যায় চলতে পারবে। বিশেষ, রূপ গুণ ও ধন, তিনই একত্রে মেলা সুকঠিন।"

বিপ্রদাস আবার ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "তাও বটে। গোপাল

কুলীনের সন্তান, স্বভাব ভাল। আজকাল অমন কুলীন মেলা ভার।” এই বলিয়া একটু চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু অবিলম্বে পুনরায় কহিলেন, “তোমার প্রস্তাব সংগত বটে। আমি বিবেচনা ক'রে দেখি; কিছু বিষয়-আশয় থাকলে আর কথাই ছিল না অর্থাৎ সে-ই উৎকৃষ্ট হইত। কিন্তু তুমি যা বল্লে সে সত্য, তিনই এক স্থানে মেলে না।” এই বলিয়া বিপ্রদাস ভাবিতে ভাবিতে তথা হইতে উঠিয়া গেলেন। হেমও গোপালের অনুসন্ধানে গমন করিলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দায়মাল—কিন্তু ধরা পড়িল না

গোপাল, হেমচন্দ্র ও বিপ্রদাসের নিকট হইতে বৈঠকখানার দিকে আসিলেন। দীন নয়নে গৃহে প্রবেশ করিয়া কাহাকে দেখিতে পাইলেন? স্বর্ণলতাকে। স্বর্ণলতা সেখানে কি জন্যে আসিয়াছিলেন?

প্রাতঃকালে দূর হইতে গোপাল ও হেমকে দালানের বারাণ্ডায় দেখিতে পাইয়া স্বর্ণলতা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, তাঁহার পিতা কোথায়? একটু পরে তাঁহাকেও দালানের বারাণ্ডায় দেখিতে পাইলেন। স্বর্ণলতা মনে করিলেন, এক্ষণে তাঁহারা সত্বর তথা হইতে স্থানান্তরে যাইবেন না। আস্তে আস্তে বৈঠকখানার দরজা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন—কেহই নাই। কম্পিত হৃদয়ে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, কোন শব্দ করিব না, কিন্তু যত জিনিসপত্র, আজি যেন তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভংগ করিয়া দিবার জন্যই তাঁহার সম্মুখে পড়িতে লাগিল। একখানা চেয়ারের কাছ দিয়া যাইতে সেখানা পড়িয়া যাইবার জো হইল। সেখানাকে ধরিতে গিয়া একখানা পুস্তক মেজের উপর হইতে পড়িয়া গেল। পুস্তকখানি তুলিয়া দেখিলেন, সেখানি মেঘনাদবধ কাব্য। প্রথমের সাদা পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে “গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়” লেখা রহিয়াছে। চেয়ারে বসিয়া একটু পুস্তকখানি সাদর নয়নে নিরীক্ষণ করিলেন। পরে আস্তে আস্তে সেখানিকে মেজের উপর রাখিয়া বৈঠকখানার ধারে কাপড় রাখিবার আলনার নিকট গেলেন। আলনার উপর গোপালের ধুতি ও চাদর রহিয়াছে। ধুতিখানি ও চাদরখানি স্বর্ণলতার পিতা পূজার সময় গোপালকে দিয়াছিলেন। গোপাল সেইখানি পরিয়া ভাসান দেখিতে গিয়াছিল। স্বর্ণলতা তাহা জানেন। কিন্তু হেমচন্দ্র কোন্ কাপড়খানি পরিয়া ভাসান দেখিতে গিয়াছিলেন, তাহা স্বর্ণের স্মরণ নাই। গোপালের চাদরের এক পার্শ্ব মাটিতে পড়িয়াছিল; যত্নপূর্ব্বক চাদরখানি তুলিয়া রাখিলেন। পরক্ষণেই আবার সেখানিকে পাড়িলেন। পাড়িয়া নিজের গায়ে দিলেন। পরে অস্ফুট বচনে কহিলেন, “এই রকম ক'রে গায়ে দিয়েছিলেন।”

যেই স্বর্ণলতার মুখ হইতে উল্লিখিত কথা নিঃসৃত হইল, অমনি তিনি

বৈঠকখানার বহির্দ্বারে পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, গোপাল। স্বর্ণলতার কণ্ঠার মূল অবধি কর্ণের অগ্রভাগ পর্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। ব্যস্তসমস্ত হইয়া চাদরখানি ফেলিয়া দ্রুতপদে বাটীর মধ্যে প্রস্থান করিলেন। সেখানি তুলিয়া আলনায় রাখিবার অবকাশ পাইলেন না। গোপাল জিজ্ঞাসিলেন, "কি স্বর্ণলতা?" স্বর্ণলতা সে দেশেও না। তখন তিনি আস্তে আস্তে চাদরখানি তুলিয়া আলনায় রাখিলেন এবং বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

উপুড় হইয়া বালিশের উপর মুখ রাখিয়া গোপাল ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার অজ্ঞাতসারে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস বহিতে আরম্ভ করিল। মনে মনে কহিলেন, "বামন হয়ে চাঁদে হাত কেন তোমার? দুরাশা ভাল নয়। দুরাশা ক'রে কারও কখন ভাল হয় নাই। কি আশ্চর্য্য! লোকের সহিত কিছু বলবার জো নাই, বল্লেই পাগল বলবে।" (দীর্ঘ নিশ্বাস) "টাকা না থাকলে বেঁচে থাকা বৃথা! আজ টাকা থাকলে আমার ভাবনা কি?" (দীর্ঘ নিশ্বাস) "কবিরা বলেন, টাকা অনর্থের মূল। কিন্তু তাঁরা বই লিখে মরেন কেন? বিক্রী না হ'লেই বা দুঃখ করেন কেন? পৃথিবী শঠতায় পরিপূর্ণ, এখানে কেহই মনের কথা কহে না। কহিবেই বা কেন? মনের কথা প্রকাশ করলেই লোকে যেখানে পাগল বলে, সেখানে চুপ ক'রে থাকাই ভাল।" (দীর্ঘ নিশ্বাস) "স্বর্ণলতার বাপ যদি উইল ক'রে এত টাকা স্বর্ণকে না দিতেন, তা হ'লে এক দিন কারুকে দিয়ে বলাতে পারতাম। কিন্তু উইল ক'রেই সে পথ বন্ধ হয়েছে।" (দীর্ঘ নিশ্বাস) "আমি টাকা চাই না। এখনও ত উইল ওলটান যায়। কিন্তু আমি টাকা চাই নে ব'লে স্বর্ণ টাকা ছাড়বে কেন? আমি তাকে যেমন ভালবাসি, সেও কি আমাকে তেমনি ভালবাসে? কখনই হ'তে পারে না। আমি গরিবের ছেলে, আমাকে বড়মানুষে কেন ভালবাসবে? সে দিন আমার অবস্থার কথা শুনে অবধি আর আমার সঙ্গে কথা কহে না, আমাকে ডাকে না, আমি যেখানে যাই, সেখান থেকে চলে যায়।" (দীর্ঘ নিশ্বাস) "সে যদি আমার জন্য না ভাবে, আমি কেন তার জন্যে ভেবে মরি? ভেবেই বা ফল কি? আর দুই তিন দিন পরে আমি চলে যাব। হয় ত আর এ জন্মে দ্বিতীয় বার দেখা হবে না।" (দীর্ঘ নিশ্বাস) "দূর করো ভাবনা।' এই বলিয়া একখানি পুস্তক হাতে লইয়া পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু হাতে লওয়াই সার। পড়িতে আরম্ভ করিয়া তিন চারি পংক্তি পর্য্যন্ত মন সংযোগ করিয়া পাঠ করিলেন। পরে মন অন্য দিকে গেল। খানিক পড়িয়া দেখেন, যা পড়িয়াছেন, সকলই মিথ্যা হইয়াছে। এক বর্ণও মনে নাই। আবার প্রথম হইতে আরম্ভ করিলেন। পুনর্ব্বার তিন চারি পংক্তি পড়িয়া অন্যমনস্ক হইলেন। আবার খানিক পড়িয়া টের পাইলেন, কিছুই মনে নাই। সেই প্রথমকার তিন পংক্তি ভিন্ন আর বুঝিতে পারেন নাই। বিরক্ত হইয়া সেখানা ফেলিয়া দিয়া আর একখানা পুস্তক লইলেন। সেখানিও পড়িতে গিয়া ঐরূপ হইতে লাগিল।

পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিরক্ত হইয়া সেখানিও রাখিয়া দিলেন। মনে করিলেন পত্র লিখি। কাগজ কলম লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। উপরে তারিখ দিলেন। দিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কাহাকে লিখি। এ, ও, সে, এক এক করিয়া কত নাম উপস্থিত হইতে লাগিল। কাহাকেও লিখিতে ইচ্ছা হইল না। পরে পিতাকে পত্র লিখিবেন স্থির করিলেন। কাগজের উপর ইংরাজিতে তারিখ দিয়াছিলেন, সেটুকু ছুরি দিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। পরে বাঙ্গালায় লিখিতে লাগিলেন। খানিক লিখিয়া পড়িয়া দেখিলেন, অনেক ভুল হইয়াছে। এক এক করিয়া ভুলগুলি সংশোধন করিলেন, কিন্তু তাহাতে চিঠিখানি অত্যন্ত অপরিষ্কার দেখা যাইতে লাগিল। এ জন্য সেখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। আর একখানি কাগজ লইলেন, তাহাতেও ভুল হইতে লাগিল, "দূর হোক" বলিয়া সেখানিও ছিঁড়িয়া ফেলিয়া শয়ন করিলেন।

হেমচন্দ্র এ-দিকে ও-দিকে অনুসন্ধান করিয়া বৈঠকখানায় আসিলেন। গোপালকে বৈঠকখানার বিছানায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপাল, তুমি এইখানেই আছ, তবে আমার ডাকে উত্তর দাও নাই কেন ?"

গোপাল কহিলেন, "তুমি কখন ডাক্‌লে ?"

হেম। বিলক্ষণ ; ডেকে ডেকে আমার গলা ভেঙ্গে যাবার জো হয়েছে যে ? (গোপালের হাত ধরিয়া) চল যাই, স্নান করি গিয়ে।

গোপাল জিজ্ঞাসিলেন, "কলিকাতায় যাবার দিন কবে স্থির হ'ল ?"

হেম। এখনও হয় নাই। বাবা পাঁজি দেখবেন, তবে স্থির হবে।

গোপাল। "স—র—" স্বর্ণের বিবাহের বিষয় কি কথা হইল, জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিলেন ; কিন্তু "সর" বলিয়া চুপ করিলেন, আর অধিক কহিতে পারিলেন না। ভাগ্যক্রমে হেমের মন অন্য বিষয়ে নিয়োজিত ছিল। সুতরাং গোপালের কথা তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই।

উভয়ে স্নান করিয়া আসিলেন এবং আহারাদি করিয়া বৈঠকখানার বিছানায় বিশ্রামার্থ শয়ন করিলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নীলকমল ও বিধুভূষণ তথা শশিভূষণ

গোপালকে কলিকাতায় রাখিয়া বিধুভূষণ একজন ডেপুটী-কলেক্টরের সহিত ঢাকায় গিয়াছিলেন, তাহা পাঠককে বলা হইয়াছে। যে ডেঃ কলেক্টর বাবু বিধুকে লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি বড় গীতবাদ্যপ্রিয় ছিলেন। বিধুভূষণকে ঢাকা জেলায় লইয়া গিয়া তাঁহাকে এক মুহুরিগিরি কর্ম্ম দিলেন। বিধুভূষণ প্রথমতঃ সে কর্ম্ম সুচারুরূপে চালাইতে পারিতেন না, কিন্তু সত্বরই সে বিষয়ে তাঁহার পটুতা জন্মিল। দিবসে কাজকর্ম্ম করিতেন। সায়ংকালে ডেপুটী বাবুকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ

গীতবাদ্য শিক্ষা দিতেন। যে বেতন পাইতেন, তাহাতে নিজের খরচপত্র চলিয়া যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হইত, গোপালকে পাঠাইয়া দিতেন।

এক দিবস বিধুভূষণ বাজারে এক দোকানে কাপড় খরিদ করিতেছেন, এমন সময় রাস্তায় কোলাহল শুনিতে পাইলেন। সকলেই বাহির হইয়া দেখিতে গেল। বিধুভূষণও সেই সমভিব্যাহারে বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন, আগে আগে এক কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘাকার পুরুষ আসিতেছে ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কতকগুলি বালক "বাছা হনুমান্" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে তাহার অনুসরণ করিতেছে ও রাস্তার ধূলি লইয়া তাহার গায় দিতেছে। দেখিবা মাত্রেই বিধুভূষণ নীলকমলকে চিনিতে পারিলেন। নীলকমলের আর সে পূর্ব্বের শরীর নাই। তাহার কেশ লম্বা হইয়াছে, দাড়ি বক্ষঃস্থল ব্যাপিয়া পড়িয়াছে, চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে ও শরীর যার-পর-নাই কৃশ হইয়া পড়িয়াছে। নীলকমল অগ্রে অগ্রে আসিয়াছে। বালকেরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চীৎকার করিতেছে। যখন বরদাস্ত করিতে না পারিতেছে, তখন এক এক বার বালকদিগকে প্রহার করিবার জন্য ফিরিতেছে এবং তদ্দর্শনে তাহারা প্রথমে পলাইতেছে; কিন্তু অবিলম্বেই একত্রিত হইয়া পূর্ব্ববৎ "বাছা হনুমান্" বলিতেছে।

বিধুভূষণ নীলকমলকে চিনিতে পারিয়াই তাহার নিকটে গেলেন। নীলকমল বিধুভূষণকে না চিনিতে পারিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিবা মাত্রই কহিল, "দাদাঠাকুর! আমি টের পাই নাই। আমাকে যে জ্বালাতন করেছে, আমার আর আপন পর ঠাওর নাই। এখন আমি মরতে পারলেই বাঁচি।"

বিধুভূষণ কহিলেন, "নীলকমল! কি হয়েছে? তুমি এখানে এলে কবে?"

পশ্চাৎ হইতে নিরত "বাছা হনুমান্, বাছা হনুমান্" শব্দ হইতেছে। নীলকমলের কান সেই দিকেই রহিয়াছে, বিধুভূষণ কি কহিলেন, শুনিতে পাইল না। একটু পরে কহিল, "দাদাঠাকুর আমারে আগে রক্ষা করো, পরে সব কথা শুনবো।"

বিধুভূষণ বালকদিগকে তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এক দিক্ হইতে তাড়াইয়া দিলে অপর দিকে গিয়া জোটে। বিরক্ত হইয়া তিনি নীলকমলের হাত ধরিয়া দোকানের মধ্যে লইয়া গেলেন। বালকেরা দোকানে প্রবেশ করিতে না পারিয়া চলিয়া গেল।

নীলকমলকে লইয়া বিধুভূষণ এক স্বতন্ত্র গৃহে গেলেন। গিয়া উভয়ে উপবেশন করিলেন। নীলকমল শ্রান্তি দূর করিয়া কহিল, "দাদাঠাকুর, তুমি এখানে কোথা হ'তে এলে?"

বিধুভূষণ কহিলেন, "আমি তোমাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, তুমি কোথা থেকে এলে? তোমার দিব্বি কর্ম্ম ছিল, তা ছেড়ে দিলে কেন?"

নীলকমল উত্তর করিল, "দাদাঠাকুর, অদৃষ্টে না থাকলে অতি বড় সুখও

অনেক দিন থাকে না। তোমাদের বাড়ী থেকে বাড়ী গেলাম। সেখানে এই গোলের সুরু হ'ল। তার পর যেখানে যাই, সেইখানেই এই গোল। দাদাঠাকুর, তুমি আমাকে বারণ করা অবধি আমি সে গানও গাই নে, তার কথাও কই নে, তবু আমাকে লোকে ছাড়ে না।"

বিধুভূষণ বুঝিতে পারিলেন, নীলকমল পদ্মআঁখির গানের উল্লেখ করিতেছে। তিনি আর কথা কহিলেন না।

নীলকমল জিজ্ঞাসিল, "দাদাঠাকুর, এখন কোথায় গেলে বাঁচি, আমাকে ব'লে দাও।"

বিধুভূষণ কহিলেন, "নীলকমল, তুমি খেপো কেন ? তাতেই ওরা খেপায়।"

নীলকমল। দাদাঠাকুর, ঐ কথা আমিও বলি যে, আমি খেপি কেন ? কিন্তু কথাটা শুনলে যেন আমার বুদ্ধি লোপ পায়, আমি যেন পাগল হই।

নীলকমল কথাটা শুনিয়া যে পাগলের মত হয়, তাহা আর বলিবার সাপেক্ষ রহিল না। বিধুভূষণ তাহার চেহারা দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উভয়ে সেই দোকান-ঘরে বসিয়া রহিলেন। সন্ধ্যার পরে বিধুভূষণ কহিলেন, "নীলকমল, চল আমাদের বাসায় যাই। সেইখানে খেয়ে শুয়ে থাকবে।"

নীলকমল। দাদাঠাকুর, আমার কি আর খাওয়া দাওয়া আছে ?

বিধুভূষণ। সে কি ?

নীলকমল। আজ তিন দিন জলবিন্দুও খাই নাই, তবু খিদে নেই।

নীলকমলের কাতরোক্তি শুনিয়া বিধুভূষণ কহিলেন, "নীলকমল, তুমি এইখানে ব'সো, আমি এখুনই খাবার আনি।"

নীলকমল। না না।

চন্দ্রের আলোকে বিধুভূষণ দেখিতে পাইলেন, নীলকমলের চক্ষু এই কথা কহিবার সময় ভয়ানক হইয়া আসিল। বিধুভূষণ বিস্তর সান্ত্বনাবাক্যের দ্বারা বাসা পর্য্যন্ত আনিলেন। বাহিরের ঘরে বসাইয়া নিজে কিঞ্চিৎ খাবার আনিবার জন্যে বাটীর মধ্যে আসিলেন ; কিন্তু ফিরিয়া গিয়া দেখেন, গৃহ শূন্য পড়িয়া আছে। নীলকমল নাই। এ-দিক্ ও-দিক্ অনুসন্ধান করিলেন, কোন স্থানেই তাহার উদ্দেশ পাইলেন না।

বিধুভূষণ ডেপুটী বাবুর সহিত যেরূপ সুখে আছেন, বোধ হয় ইহার পূর্ব্বে তিনি কখনও এমন সুখে কালযাপন করেন নাই। কিন্তু শশিভূষণ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া, অট্টালিকায় শয়ন করিয়া কেমন আছেন দেখা যাউক।

রামসুন্দর বাবুর ষড়্যন্ত্রের ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে ; কর্ত্রীঠাকরুণ দরখাস্ত করিয়াছেন। মেজেষ্টর সাহেব দরখাস্ত পাইয়া স্বয়ং অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছেন।

মেজেষ্টর সাহেব বাবুর বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বাবু মাটিতে

বিছানা করিয়া বসিয়া আছেন। তাহার বাম ভাগে একটি বনাত-মোড়া টেবিল। টেবিলের উপর কতকগুলি হাতীর দাঁতের পুতুল। তাহার পশ্চাদ্ভাগে কতকগুলি চিনের মাটির পুতুল, টেবিলের ধারে একখানি চেয়ার রহিয়াছে, বাবুর সম্মুখে আমলাবর্গ বসিয়া লেখাপড়া করিতেছেন। মেজেষ্টর সাহেব আসিবেন বলিয়া বাবু আজি স্বয়ং কাজকর্ম্ম করিতেছেন। তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ, নাসিকার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ স্ফীত ও জবাফুলের মতন লাল। কথা কহিতে গেলে কথা স্পষ্ট নির্গত হয় না। অনবরত পাখার বাতাস করিতেছেন, তথাপি মুখে মাছি বসা নিবারণ করিতে পারিতেছেন না।

বাবুকে দর্শন করিয়াই মেজেষ্টর সাহেবের অভক্তি হইল। পরে দুই তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। বাবু নিজের বুদ্ধিতে কোনটির উত্তর দিতে পারিলেন না। শশিভূষণ যাহা শিখাইয়া দিলেন, তাহাই বলিলেন। মেজেষ্টর সাহেব স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, শশিভূষণই সর্ব্বময় কর্ত্তা। তদ্দর্শনে মেজেষ্টর সাহেব হুকুম দিলেন যে, যত দিন পর্য্যন্ত সরকার হইতে ম্যানেজার না নিযুক্ত হয়, তত দিন কাছারির কার্য্য বন্ধ থাকে। আর শশিভূষণ কি প্রকারে জমিদারি শাসন করিয়াছেন, তাহার হিসাব তলব করিলেন।

শশিভূষণের শিরে বজ্রাঘাত হইল ; ভবিষ্যতে কাজ করিতে পারিবেন কি না, সে বিষয়ে তাঁহার কোন চিন্তা হইল না। তাঁহাকে যে পূর্ব্বের হিসাব দিতে হইবেক, এ-ই তাঁহার প্রধান ভয়ের কারণ। যদি তাঁহাকে একেবারে কর্ম্মচ্যুত করিয়া দিত, তাহা হইলে তিনি ইহা অপেক্ষা সহস্রগুণে সুখী হইতেন।

শশিভূষণ বিরসবদনে বাটী আসিলেন। অন্যান্য দিন তিনি কাছারি হইতে উঠিলে সকলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইত, আজি সকলেই নিজ নিজ কর্ম্ম করিতে লাগিল। তাঁহাকে কেহ গ্রাহ্য করিল না। রাস্তা দিয়া বাটী চলিয়া যাইবার সময় দু-ধারের লোকে সেলাম করিল না। শশিভূষণ ভরসা করিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিতে পারিলেন না। হেঁটমুখে বাটী আসিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন।

প্রমদা জিজ্ঞাসিলেন, "সাহেব এসে কি বল্লে ?"

শশিভূষণ কহিলেন, "আর কি বল্‌বে ? আমার সর্ব্বনাশ ক'রে গেল।"

প্রমদা জিজ্ঞাসিলেন, "কি সর্ব্বনাশ ?"

শশী উত্তর করিলেন, "আমার কাজ বুঝিয়ে দিতে হবে। আর যত দিন বুঝান শেষ না হবে, তত দিন অন্য কার্য্যে হাত দিতে পারবো না।"

প্রমদা শুনিয়া আর কোন প্রশ্ন বা উত্তর করিলেন না।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে শশিভূষণ গিয়া বৈঠকখানায় বসিলেন। সন্ধ্যা হইয়া গেল, আজ আর আমলাবর্গের মধ্যে কেহই আসিল না। এক এক বার দ্বারে শব্দ হয় আর শশিভূষণ উৎসাহে চাহিয়া দেখেন, কিন্তু কি দেখিতে পান ? হয় ত চাউলের মহাজন, নতুবা কাপড়ের দোকানদার আপনাপন প্রাপ্য টাকা লইতে আসিয়াছে। রাত্রি ৮টার সময় শশিভূষণ আমলাদিগের বাটী লোক পাঠাইয়া দিলেন।

পূর্ব্বে যাহারা তাঁহার বাটী ছাড়িত না, আজি তাহাদের সকলেরই "প্রয়োজন আছে।" কেহই আসিতে পারিবে না। ৯টার সময় শশিভূষণ রামসুন্দর বাবুর বাটীতে গেলেন। সেইখানে গিয়া সকলকে এক স্থানে দেখিতে পাইলেন। অন্য অন্য দিবসের মত অদ্য আর কেহ উঠিয়া অভ্যর্থনা করিল না। রামসুন্দর বাবু অগ্রে শশিভূষণের সম্মুখে তামাক খাইতেন না ; আজি বুঝি পূর্ব্বক্ষতি পূরণ করিবার জন্যেই অনবরত হুঁকা টানিতেছেন। শশিভূষণ যে তামাক খান, তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন।

শশিভূষণ বসিয়া আছেন। কেহই তাঁহার সহিত কোন কথা কহে না। ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া সকলে উঠিবার উদ্যোগ করিলেন ; তন্দর্শনে শশিভূষণ কহিলেন, "আমি আপনাদের কাছে এলাম।"

খাতাঞ্জি ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, "এত অনুগ্রহ ? আমার নিকট কি কোন প্রয়োজন আছে ?"

মুহুরি খাতাঞ্জিকে কহিলেন, "আসুন, রাত হ'ল।"

শশিভূষণ কহিলেন, "একটু অনুগ্রহ ক'রে বসুন। আমি আপনাদের সকলেরই কাছে এসেছি।"

শশিভূষণের কথা শুনিয়া সকলে বসিলেন। শশিভূষণ কিঞ্চিৎ পরে কহিলেন, "আপনারা রক্ষা না করলে ত আমার নিস্তার নাই, তাই আপনাদের শরণ নিতে এলাম।"

রামসুন্দর বাবু উত্তর করিলেন, "আমার সাধ্যই বা কি, ক্ষমতাই বা কি ? আমি কেরাণী মানুষ ; আমার হাতেও কেউ নাই, আমিও কারু হাতে নই।"

শশিভূষণ কহিলেন, "তা সত্য, কিন্তু এ বিপদে আপনি না রক্ষা করলে আর আমার উপায়ান্তর নাই।"

অন্যান্য যাঁহারা বসিয়া ছিলেন, এই কথা শুনিয়া উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। কহিলেন, "তবে আমাদের কাছে কোন প্রয়োজন নাই ?"

শশিভূষণ কহিলেন, "আপনাদের সকলেরই কাছে আমার দরবার" এই বলিয়া তিনি গলায় বস্ত্র দিয়া জোড়হস্তে এক পার্শ্বে বসিলেন। শশিভূষণের চক্ষু হইতে ধারা বহিতে লাগিল।

খাতাঞ্জি প্রভৃতি সকলেই শশিভূষণকে গলবস্ত্র দেখিয়া নরম হইলেন। অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর স্থির হইল, শশিভূষণ চারি জনকে চারি হাজার টাকা দিতে পারিলে তাঁহারা শশিভূষণের অপরাধ ঢাকিয়া লইবেন, কিন্তু এই কড়ারে যে, শশিভূষণের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হইলে তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কার্য্য ত্যাগ করিয়া যাইবেন। শশিভূষণ আর উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

"গোপাল কোথায়"

বিপদ্ কখন একক আইসে না। একবার আসিতে আরম্ভ করিলে দলবন্ধ হইয়া আসিতে থাকে। হেমচন্দ্রের পিতার মৃত্যু হইয়াছে। পরিবারেরা সে কথা বিস্মৃত হইতে না হইতেই হেমচন্দ্র বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইলেন। সে বৎসর কলিকাতায় ভয়ানক বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল এবং ঐ রোগে বহুসংখ্যক লোক কালগ্রাসে পতিত হয়। কালেজের একজন সুবিজ্ঞ বহুদর্শী ডাক্তার তৎকালে কলিকাতার বায়ু পরীক্ষা করিয়া তন্মধ্যে বসন্তের পুঁজ দেখিতে পাইয়াছিলেন। যাহাদের একবার বসন্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাদেরও পুনরায় বসন্ত হইয়াছিল।

হেমচন্দ্রের জ্বর হইয়া তৃতীয় দিবসে তাঁহার শরীরে বসন্তের গুটি দেখা দিল। হেমচন্দ্র গোপালকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "গোপাল, তোমার টীকা হয়েছে?" গোপাল উত্তর করিলেন, "হাঁ হয়েছে।" তখন হেম কহিলেন, "আমার শরীরে বসন্ত দেখা দিয়েছে; তোমরা সাবধান হয়ে থাক।"

গোপাল হেমের শরীরের প্রতি দৃষ্টি করিলেন; দেখিলেন, সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া ছোট ছোট লাল রঙের ঘামাচির ন্যায় গুটি হইয়াছে। দেখিয়া তাঁহার শরীর কম্পিত হইল। কিন্তু হেমকে কিছু বলিলেন না, নিজে চাদর লইয়া অবিলম্বে ডাক্তারের নিকট গেলেন। ডাক্তার সাহেব আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "হাঁ, বসন্তই বটে।"

দুই তিন দিবসের মধ্যে হেমের সর্ব্বশরীর স্ফীত হইল। কণ্ঠার বেদনায় কথা কহিতে পারেন না এবং জলটুকু পর্য্যন্ত গলাধঃকরণ করিবার শক্তি রহিল না। সমস্ত দিবস অনাহারে নীরবে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন।

গোপালের আর আহার নিদ্রা নাই। নিয়ত হেমের বিছানার পার্শ্বে বসিয়া থাকেন। আহারের সময় সেইখানে তাঁহাকে চারিটি অন্ন দিয়া যায়; কোন দিন খান, কোন দিন বা যেমন ভাত, তেমনি পড়িয়া থাকে। হেম এক দিবস অতি কষ্টে কহিলেন, "গোপাল, ভাই, তুমি এখানে সমস্ত দিন ব'সে থেকো না, কি জানি যদি তোমার বসন্ত হয়।" গোপাল কোন উত্তর করিলেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে হেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপাল, আমার ব্যারামের কথা বাড়ীতে কি কারুকে লিখেছ?"

গোপাল উত্তর করিলেন, "না। কাহাকেও লিখি নাই।"

হেম কহিলেন, "তবে আর কারুকে লিখো না।"

একটু পর গোপাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা, বাড়ী থেকে দুখানা চিঠি এসেছে, পড়বে কি?"

হেম উত্তর করিলেন, "তুমি খুলে পড়। প'ড়ে যে উত্তর লিখতে হয়, লিখে দাও। আমার পীড়ার কথা উল্লেখ ক'রো না।"

গোপাল চিঠি পড়িয়া জবাব দিলেন, "সকলে ভাল আছে।"

ইহার দুই তিন দিবস পরে হেমের আর সংজ্ঞা রহিল না, সমস্ত দিন রাত কেবল প্রলাপ বকেন। তম্মধ্যে স্বর্ণ ও গোপালের নামই অধিক। গোপাল শিয়রে উপবেশন করিয়া ক্রমাগত নেত্রযুগল হইতে বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে থাকেন।

শ্যামা আপনার কাজকর্ম্ম সমাধা করিয়া হেমের নিকট সমস্ত দিবস বসিয়া থাকেন। এক দিবস অশ্রুপূর্ণ নয়নে গোপাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, এমন হয়ে কেউ কি বাঁচে?"

শ্যামা উত্তর করিল, "ভয় কি? এ ত সামান্য বসন্ত হয়েছে। আমি এর অপেক্ষা কত বেশী বসন্তওয়ালা রোগীকে বাঁচতে দেখিছি।"

গোপাল কহিলেন "আমার মাথার দিব্যি, বল দেখি বাঁচে কি না?" শ্যামা কহিল, "আমি মিথ্যা কথা বলছি? কত লোক এর চাইতে বেশী বসন্ত হয়ে বেঁচে উঠেছে।"

গোপাল ক্ষণকাল অশ্রুপূর্ণ নয়নে নীরবে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে রাস্তায় গাড়ীর শব্দ হইল এবং হেমচন্দ্রের বাসার কাছে আসিয়া শব্দ থামিয়া গেল। গোপাল শ্যামাকে কহিলেন, "দিদি, দেখ দেখি, বুঝি ডাক্তার সাহেব এসেছেন।"

শ্যামা উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ডাক্তার সাহেবই এসেছেন। ডাক্তার সাহেব রোগীর শয্যার নিকট আসিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রোগীকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া নাড়ীর গতি দেখিলেন। পরে মুখ বক্র করিয়া কহিলেন, "এরূপ অজ্ঞানের ভাব কত ক্ষণ পর্য্যন্ত হয়েছে?"

গোপাল উত্তর করিলেন, "আজ সকাল বেলা পর্য্যন্ত আর একটিও কথা কন নাই।"

ডাক্তার সাহেব আবার মুখ বক্র করিলেন।

গোপাল ডাক্তার সাহেবকে জিজ্ঞাসিলেন, "রোগ কি কঠিন হয়েছে?"

ডাক্তার সাহেব উত্তর করিলেন, "খালি কঠিন নয়, রোগ সাংঘাতিক হয়েছে।

গোপালের চক্ষু হইতে জলধারা বহিতে লাগিল। তদ্দর্শনে ডাক্তার সাহেব কহিলেন, "কেঁদো না। যত্নপূর্ব্বক রোগীর সেবা শুশ্রূষা করো; এখনও বাঁচবার আশা আছে।"

গোপাল আশ্বাসিত হইলেন। ডাক্তার সাহেব যাহা করিতে বলিলেন, সে-সমস্ত লিখিয়া লইলেন এবং ঠিক সেইরূপে রোগীর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

ডাক্তার সাহেব চলিয়া গেলে গোপাল শ্যামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, এত দিন বাড়ীতে কোন খবর পাঠাই নাই, কিন্তু এখন আর চুপ ক'রে থাকা যায় না। তুমি কি বল?"

শ্যামা কহিল, "খবর পাঠান উচিত। যদি এখানে ভাল মন্দ ঘটে, তা হ'লে তাঁরা ভাববেন যে, পরের হাতে প'ড়ে কিছু শুশ্রূষা হয় নাই, বিনা-চিকিৎসায় বিনা-যত্নে মারা পড়েছে।"

গোপাল শ্যামার কথা শুনিয়া স্বর্ণলতাকে একখানি পত্র লিখিলেন।

স্বর্ণ !

> দাদার অত্যন্ত বসন্ত হইয়াছে। এত দিন তোমাদিগকে বলিতে দেন নাই। অদ্য প্রাতঃকাল অবধি তাঁহার এক রকম চৈতন্য নাই বলিলে হয়। ডাক্তার বলিয়াছেন, এখনও জীবনের আশা করা যাইতে পারে। যদি তোমরা আসিতে ইচ্ছা কর, তবে আসিবে, আমি ও শ্যামা যথাসাধ্য শুশ্রূষা করিতেছি।

শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পত্র ডাকে পাঠাইয়া গোপালের চিত্তচাঞ্চল্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক লাঘব হইল। কোন অনিষ্ট হইলে পাছে লোকে বলে, বিনা-চিকিৎসায় কিম্বা বিনা-যত্নে মারা পড়িয়াছে, এই ভয়ে তিনি প্রায় ম্রিয়মাণ হইয়াছিলেন।

গোপাল নিয়তই হেমের বিছানার পার্শ্বে বসিয়া থাকেন। তাঁহার আহার নিদ্রা নাই। আর কাহাকেও হেমের নিকট রাখিয়া তাঁহার মন স্বচ্ছন্দে থাকে না। হেম ওষ্ঠ নাড়িলেই তিনি টের পান—কোন্ দ্রব্য চাহিতেছেন। আর কেহই তাহা টের পায় না।

গোপালের চিঠি পাইয়া স্বর্ণলতা ও তাঁহার পিতামহী যৎপরোনাস্তি চিন্তিত হইলেন। গৃহে যা যেখানে ছিল, সেইখানেই রাখিয়া দুই জনে পাল্কী করিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিলেন। কিন্তু কলিকাতার মধ্যে হেমের বাসা কোথায় তাঁহারা কেহই জানেন না। শ্রীরামপুরের নিকটে তাঁহাদিগের গুরুঠাকুরের বাড়ী। স্বর্ণের পিতামহী কহিলেন, "স্বর্ণ, চল আমরা প্রথমে গুরুঠাকুরের বাড়ী যাই। আমি তাঁর বাড়ী চিনি। সেখান থেকে এক জন লোক সঙ্গে নিয়ে কলিকাতায় যাব।"

স্বর্ণ সম্মত হইলেন। উভয়ে টিকিট লইয়া বাষ্পীয় শকটারোহণে সন্ধ্যার সময় গুরুঠাকুরের বাটী পৌঁছিলেন।

গুরুদেবের নাম শশাঙ্কশেখর স্মৃতিগিরি। তিনি স্বর্ণলতার ও তাহার পিতামহীর আগমন শ্রবণ করিয়া আগ্রহ সহকারে দ্বারে গিয়া তাঁহাদিগকে আনিলেন। স্বর্ণলতার পিতামহী সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, "গুরুদেব, হেমের অত্যন্ত পীড়া হয়েছে, জীবন সংশয়। তার বাসায় যাব। কিন্তু তার বাসা কোথায় তা জানি না এ জন্য আপনার এখানে এসেছি। এক জন চাকর যদি সঙ্গে দেন, তা হ'লে আমরা অনায়াসে বাসা অনুসন্ধান ক'রে নিতে পারি।" গুরুদেব কহিলেন, "চাকর দরকার কি, আমি নিজেই যেতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু পীড়াটা কি? তজ্জন্য কিছু দৈবকার্য্য করলে ভাল হয় না?"

স্বর্ণলতার পিতামহী কহিলেন, "পীড়া বসন্ত। আপনার অভিপ্রায়ে যদি দৈব শান্তি করলে ভাল হয়, তাই করুন। খরচপত্রের জন্য সঙ্কুচিত হবেন না।" এই বলিয়া অঞ্চল হইতে একখানি ৫০ টাকার নোট খুলিয়া দিলেন।

গুরুঠাকুর আলোকের নিকট গিয়া নোটখানি দর্শন করিলেন। আহ্লাদের

হাসি তাঁহার আর অধরে ধরে না, কিন্তু মনোগত ভাব গোপন করিয়া তাঁহাদিগের নিকট আসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, আপাততঃ যা দিয়াছ, তাতেই ব্যয় সমাধা হবে কিন্তু সমস্ত স্বস্ত্যয়ন যে ঐ খরচে হবে, তাহা আমার বোধ হয় না।"

স্বর্ণের পিতামহী কহিলেন, "আপনি ঐ টাকায় আরম্ভ করুন, এর পর যা লাগবে, তা দেওয়া যাবে।"

ঠাকুর মহাশয় কহিলেন, "তা যেন হ'ল কিন্তু আজ রাত্রে তোমরা কি প্রকারে কলিকাতায় যাবে, আমি স্থির করতে পারছি না।"

স্বর্ণলতার পিতামহী কহিলেন, "কেন, আর গাড়ী নাই?"

গুরুঠাকুর উত্তর করিলেন, "না।"

স্বর্ণলতার পিতামহী কহিলেন, "তবে একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া দিন। আমাদের না গেলেই নয়।"

স্বর্ণলতার পিতামহীর আগ্রহাতিশয্য দর্শন করিয়া গুরুদেব গঙ্গাতীরে এক জন লোক পাঠাইয়া দিলেন। একটু পরে সে ফিরিয়া কহিল, "আজ নৌকা যাবে না।"

স্বর্ণলতা ও তাহার পিতামহী অগত্যা গুরুদেবের আলয়ে সে রাত্রি যাপন করিলেন। পর-দিবস প্রাতঃকালে সূর্য্য না উঠিতে উঠিতে উভয়ে শয্যা ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, ক্ষণকাল বিলম্বে শশাঙ্ক-শেখর গাত্রোত্থান করিলেন; এবং শিষ্য বাড়ী আসিয়াছে বলিয়া, কপালময় গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা কাটিয়া স্বর্ণলতা ও তদীয় পিতামহীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুরুঠাকুরকে দর্শন পাইয়া স্বর্ণলতা ও তাঁহার পিতামহী উভয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। শশাঙ্কশেখর "দীর্ঘায়ুরস্তু" বলিয়া উভয়কেই কলিকাতা যাইতে প্রস্তুত দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "স্বর্ণের টীকা হয়েছে?"

স্বর্ণের পিতামহী উত্তর করিলেন, "আমাদের পুরুষানুক্রমে টীকা নাই। স্বর্ণের টীকা হয় নাই।"

গুরুঠাকুর কহিলেন, "তবে স্বর্ণের কলিকাতায় যাওয়া আমার মতে উচিত বোধ হচ্ছে না।"

স্বর্ণের পিতামহী কহিলেন, "আপনার যে অভিপ্রায়, আমরা সেই মতেই কার্য্য করবো।"

শশাঙ্কশেখর কহিলেন, "তবে স্বর্ণকে আমার বাটী রেখে তুমি কলিকাতায় যাও। নচেৎ স্বর্ণেরও নিশ্চয় বসন্ত হবে।"

স্বর্ণলতার পিতামহী তাহাতে সম্মত হইলেন। স্বর্ণ কহিলেন, "আমি কলিকাতায় যাব, তাহাতে আমার বসন্ত হয়, তাও স্বীকার।"

তাহার পিতামহী কহিলেন, "স্বর্ণ, তোমার যাওয়া হয় না। প্রথমতঃ তোমার টীকা হয় নাই, দ্বিতীয়তঃ গুরুদেব নিষেধ করছেন। এ অবস্থায় তোমাকে কি ক'রে কলিকাতায় নিয়ে যাই?"

স্বর্ণ চুপ করিয়া রহিলেন। গুরুদেব কহিলেন, "মা, তুমি এখানেই থাক। হেম কেমন থাকে, তুমি প্রত্যহই খবর পাবে।"

স্বর্ণলতা অগত্যা গুরুর আলয়ে বাস করিতে সম্মত হইলেন। শশাঙ্কশেখর স্বর্ণের পিতামহীকে সমভিব্যাহারে লইয়া কলিকাতায় উপনীত হইলেন।

অদ্য তিন দিবস হেমচন্দ্র অজ্ঞান হইয়া আছেন। ডাক্তার সাহেব প্রাতঃকালে নিয়মিতরূপে রোগীকে দেখিতে আসিলেন। হেমের চেহারার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ডাক্তার সাহেব প্রফুল্লিত হইলেন। ঘড়ি খুলিয়া হাত দেখিয়া কহিলেন, "আর ভয় নাই, এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন।"

শুনিয়া গোপাল যার-পর-নাই আহ্লাদিত হইলেন। এমন সময় হেমের পিতামহী ও শশাঙ্কশেখর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাটী পৌঁছিবা মাত্রই তাঁহারা হেমের শয়নাগারে গমন করিলেন।

হেম চক্ষুরুন্মীলন করিয়া গোপালকে দেখিতে না পাইয়া কহিলেন, "গোপাল ?"

তাঁহার পিতামহী কহিলেন, "এই দাদা, আমি এসেছি, কি চাও ?" এই বলিয়া তিনি শয্যার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

হেম কহিলেন "গোপাল কোথায় ?

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছদ

শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি

শশাঙ্কশেখর স্মৃতিগিরি হেমের পিতামহীকে কলিকাতায় রাখিয়া সেই দিবসই বাটী আসিলেন। স্বর্ণলতা শশাঙ্কশেখরকে জিজ্ঞাসিলেন, "দাদাকে কেমন দেখে এলেন ?"

শশাঙ্ক উত্তর করিলেন, "কোন চিন্তা নাই, তাঁর পীড়া অনেক বিশেষ হয়েছে। সত্বরই আরোগ্য লাভ করবেন।"

শশাঙ্কশেখরের কথা শুনিয়া স্বর্ণলতা অনেক আশ্বস্ত হইলেন ও জিজ্ঞাসিলেন, "আমি সেখানে কবে যেতে পারবো ?"

শশাঙ্কশেখর উত্তর করিলেন, "তিনি ভাল ক'রে আরোগ্য না হ'লে তোমার সেখানে যাওয়া উচিত নয়। কি জানি, যদি তোমারও বসন্ত হয়, কিন্তু তুমি এত ব্যস্ত হয়েছ কেন স্বর্ণ ? তোমার কি এখানে অযত্ন হচ্ছে ?"

স্বর্ণলতা আগ্রহ সহকারে উত্তর করিলেন, "না না, আমার কোনই অযত্ন হয় নাই। আমি ভাবছি, দাদার পাছে কোন অযত্ন হচ্ছে। সেই জন্যই আমি যেতে এত ব্যগ্র হয়েছি।"

শশাঙ্কশেখর বলিলেন, "সে বিষয়ে কোন চিন্তা ক'রো না মা; সেখানে যে গোপাল নামে ছেলেটি আছে, সে থাকতে তোমার দাদার কোন অযত্ন হবে

না। স্বর্ণ, গোপাল তোমার দাদার যেরূপ সেবা শুশ্রূষা করছে, অমন কেউ কারুকে করে না।"

শশাঙ্কের কথা শুনিয়া স্বর্ণের হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদের সঞ্চার হইল। তিনি আর কিছু কহিলেন না। শশাঙ্কও তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

বহির্দ্বারে গিয়া শশাঙ্ক আপন ভৃত্যকে দিয়া তাঁহার প্রতিবাসী হরিদাস মুখোপাধ্যায়কে ডাকাইলেন। হরিদাস আসিয়া নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আমাকে ডাকলে কেন ?"

শশাঙ্ক কহিলেন, "একটা বড় গোপনীয় কথা আছে।"

হরিদাস। এইখানে বলবে, না অন্যত্রে যেতে হবে ?

শশাঙ্ক। চল, ঐ দিকে গিয়া বলি।

উভয়ে তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মন্দ মন্দ গতিতে গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। সূর্য্যদেব অস্তাচলে চলিয়া গিয়াছেন। পূর্ণিমার চন্দ্র প্রাচীদেশ হইতে পরম রমণীয় কিরণজাল বিস্তার করিতেছেন। বসন্তের সমীরণহিল্লোলে শরীরে অনির্ব্বচনীয় উৎসাহ অনুভূত হইতেছে। কল কল রবে কর্ণ শীতল করিয়া গঙ্গা সাগরসঙ্গমে যাইতেছেন। নিকটবর্ত্তী উদ্যান হইতে নানাবিধ পুষ্পের সৌরভ আসিয়া দশ দিক্ আমোদিত করিতেছে। এই পরম রমণীয় সময়ে কত স্থানে কত লোক ঈশ্বরের করুণায় বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিতেছে। কিন্তু শশাঙ্কশেখর ও হরিদাস সে সময়ে কি পরামর্শ করিতেছেন ?

উভয়ে গঙ্গাতীরে গমন করিয়া ঘাসের উপর উপবেশন করিলেন। হরিদাস জিজ্ঞাসিলেন, "কি কথা বলবে বলো। রাত্রি হ'ল, এর পর সন্ধ্যাহ্নিক করতে হবে।"

শশাঙ্কশেখর কহিলেন, "এত ব্যস্ত হ'লে কেন ? এ সব কি ব্যস্তের কাজ ?"

হরিদাস। তোমার কাজই কি, তাই টের পেলাম না ; তা কেমন ক'রে জানবো—ব্যস্তের, কি সুস্তের ?

শশাঙ্ক কহিলেন, "তবে শুন। আমরা এত কাল যার পরামর্শ ক'রে আসছি, আজ দেবতাই তার আনুকূল্য করেছেন। সেই বর্দ্ধমানের কন্যাটি, যার সহিত তোমার পুত্রের বিবাহ দিবার প্রস্তাব হয়েছিল ; সেটি হস্তগত হয়েছে।"

হরিদাস আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসিলেন, "সে কেমন ?" শশাঙ্ক উত্তর করিলেন, "বিপ্রদাস জীবিত থাকতেই এ প্রস্তাব করা হয়, তাহা তুমি ত জানই। বোধ হয় বিপ্রদাসের মতও হয়েছিল। আমার কথা সে কখনও লঙ্ঘন করতো না। কিন্তু তার পুত্রের জন্যই কার্য্যটা হ'তে পারে নাই। সে বৎসর পূজার আগে আমাকে বলেছিল, "আপনি যে আজ্ঞা আমাকে করেছেন, আমার তাহাই কর্ত্তব্য, কিন্তু আমার পুত্রটি এখন যোগ্য হয়েছে, একবার তাহার পরামর্শ লওয়া উচিত।"

হরিদাস কহিলেন, "ও সব কথা ত বহু কাল শুনেছি, এখন কিছু টাট্কা থাকে, তবে বলো।"

শশাঙ্ক। অত ব্যস্ত হইও না। এ সব ব্যস্তের কাজ নয়। আমি যা বলি, মনোযোগপূর্ব্বক শোন। সেই পূজার পর যখন আমি গেলাম, তখন বিপ্রদাস কহিল, "মহাশয়, আমার কোন অপরাধ নাই। আমি নিজে বৃদ্ধ লোক ; এখন উপযুক্ত পুত্রের কথা না-শোনা ভাল নয়। হেমের কোন মতেই ইচ্ছা নয় যে, আপনার প্রস্তাবিত কর্ম্ম করা হয়।"

হরিদাস। তার পর।

শশাঙ্ক। তার পর ত তুমি জানই। কত স্থান হ'তে সম্বন্ধ এল, কত স্থান হ'তে ফিরে গেল। বিপ্রদাসের ইচ্ছা এই, পাত্রটির আর কোন গুণ থাকে না-থাকে, ঐশ্বর্য্য থাকলেই হ'ল। আর ইংরাজিতে দু-চারটা কথা বলতে পারলেই হ'ল। আজকাল যে সকলেরই দালান গোত্র ইংরাজি গাঁই চাই।

হরিদাস। আমার ছেলে ইংরাজিও জানে। আমার বাড়ীতে দালানও আছে, তবে আমার ছেলের সহিত হ'ল না কেন?

শশাঙ্ক। হাঁ, যা বলছ যথার্থ। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই ত বলেছি, এতে বিপ্রদাসের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বিপ্রদাস এমনি পুত্রবৎসল যে, সেই পুত্রটির কথাতেই ভুলে গেল। তাহার মত এই, স্বর্ণের টাকার ভাবনা নাই। বাপের মৃত্যুর পর যে ধনের উত্তরাধিকারিণী হবে, তাতেই যথেষ্ট। কিন্তু পাত্রটির লেখাপড়া ভালমতে জানা চাই ও দেখতে শুনতে ভাল হওয়া চাই।

হরিদাস। তাতেও ত আমার ছেলে ফেলা যায় না। ইংরাজিতে বি. এ. পাস করেছে, দেখতে শুনতেও দশটির মধ্যে একটি।

শশাঙ্ক একটু হাসিয়া কহিলেন, "সে তোমার চক্ষে। যদি সকলেই তোমার চোক দিয়ে দেখতো, তা হ'লে আর তোমার ছেলের ভাবনা কি?"

হরিদাস কিঞ্চিৎ রাগত হইয়া কহিলেন, "কেন, কেন? আমার চক্ষে কেন?"

শশাঙ্ক কহিলেন, "চোটো না। চটবার প্রয়োজন নাই, আমরা যে-কাজ হাতে নিয়ে বসেছি, ব্যস্তসমস্ত কিম্বা চটাচটি করলে এ সমাধা হবার নয়। তোমার ছেলে মন্দ, তা আমি বলছি না। সে যে দশটির মধ্যে একটি, তাও মিথ্যা নয়। পৃথিবীতে কত কুরূপ আছে, তা বলা যায় না। তাদের মধ্যে ছেড়ে দিলে, দশটি কেন, হয় ত ৫০টির মধ্যে তোমার ছেলে একটি হ'তে পারে।" এই সময় আবার হরিদাসের চক্ষু গরম দেখিয়া শশাঙ্কশেখর কহিলেন, "চোটো না। এ চটবার কাজ নয়। আর যা বলি, মনোযোগ ক'রে শোন।"

হরিদাস কহিলেন, "আচ্ছা, বলো বলো।"

শশাঙ্কশেখর পুনর্ব্বার আরম্ভ করিলেন, "হেমের মত ছিল, যেটির সঙ্গে বিবাহ দেয়, সেটির কাছে তোমার পুত্র বানরটি।"

হরিদাস রাগত হইয়া কহিলেন, "মহাশয়, বিবেচনা ক'রে কথা কবেন।"

শশাঙ্কশেখর কহিলেন, "আমি অবিবেচনার কোন কথা বলি নাই। তুমি সেই ছেলেটিকে দেখ নাই, সেই জন্য এমন কথা বলছ। আমি তাকে দেখেছি।

ছেলেটি যেন কার্ত্তিকবিশেষ। লেখাপড়াতেও বিলক্ষণ চতুর। ছেলেটির সঙ্গে স্বর্ণলতার বিবাহ দেবার জন্য হেমের ইচ্ছা ছিল। বুঝতে পেরেছ ত। ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এক্ষণে নাই বল্লে হয়; কারণ, যার ইচ্ছা ছিল, সে-ই এক্ষণে বসন্ত রোগে শয্যাগত। এখন তখন। যদি সে পাত্রটির ঐশ্বর্য্য থাকিত, তা হ'লে ত এত দিন বিবাহ হয়েই যেত। কিন্তু তা যেখানে হয় নাই, সেখানে আর না হবারই সম্ভব।" হরিদাস আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসিলেন, "কিসে টের পেলে—না-হবার সম্ভব আছে?"

শশাঙ্ক কহিলেন, "এই জন্য বলি, যদি হেমের মৃত্যু হয়, তা হ'লে তার পিতামহী এ কর্ম্ম করবে না। তার ইচ্ছা টাকা। যে বরের টাকা বেশী, তাহারই সহিত বিবাহ দেবে। আর বোধ হয়, আমি একটা অনুরোধ করলেও রাখতে পারে। এখন তোমার ভরসা হেমের মৃত্যু; যদি হেম মরে, তা হ'লে নিশ্চয়ই আমি তোমার পুত্রের সহিত বিবাহ দেওয়ায়ে দিতে পারবো।"

হরিদাস কহিলেন, "কে কত দিন বাঁচে, তার ত স্থিরতা নাই। কত লোক অন্তর্জ্জল হ'তে ফিরে আসে। আমাদের কি এমন অদৃষ্ট হবে যে, যে—"

গুরুঠাকুর মহাশয় শিষ্যদিগের বড় হিতৈষী কি না, তিনি অবলীলাক্রমে হেমের মৃত্যুর কামনা করিলেন। হরিদাসের মনে মনে যে ভাব, তাহা ত জানাই গিয়াছে, কিন্তু তথাপি প্রকাশে তিনি অমন দুরূহ কথাটি কহিতে পারিলেন না।

শশাংকশেখর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় আরম্ভ করিলেন, "যা বল্লাম, তা যদি ঘটে, তবে ত কোন কথাই নাই; কিন্তু তা না ঘট্‌লেও আর এক উপায় আছে; তাতে তুমি সম্মত আছ কি না?"

হরিদাস কহিলেন, "সকলে প্রাণে প্রাণে বজায় থেকে যদি কোন উপায়ে শুভ কর্ম্ম হ'তে পারে, আমার মতে তাই করা কর্ত্তব্য। তাতে কিঞ্চিৎ কষ্ট, কি ব্যয় বেশী হ'লেও আমি কাতর হব না।"

শশাংক কহিলেন, "হেমের পীড়া এক্ষণ সাংঘাতিক বল্‌তে হবে। তিনি চারি দিবসের মধ্যে, কি হবে টের পাওয়া যাবে। যদি অধোগতি দেখা যায়, তবে ত কথাই নাই। সেইখানে ব'সে দুই চারি বিন্দু চোকের জল ফেলতে পারলেই কাজ হাঁসিল হ'ল; কিন্তু যদি ক্রমশঃ আরোগ্য দেখা যায়, তা হ'লে আমার মতে গোপনে বিবাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য।"

হরিদাস কহিলেন, "গোপনে বিবাহ কি প্রকারে সম্ভব হ'তে পারে? বড়-মানুষের মেয়ে, একে আনা আর বামী শামীকে আনা সমান নয় ত? সে দিবস আমার এক প্রজার বিবাহ দিলাম। কন্যাটি তার বাপের সহিত শুয়ে ছিল। নিতান্ত শৈশব, পাঁচ বৎসর বয়স। অনায়াসে দুয়ার ভেঙ্গে তার বাপকে তিন চারি জনে ধরে রইল, মেয়েটিকে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ও গোটা দুই পুতুল দিয়ে কাজ সমাধা ক'রে দেওয়া গেল। কিন্তু এ স্থলে ত আর সেটি খাটবে না। পাত্রী কি প্রকারে হস্তগত করবে?"

শশাঙ্ক কহিলেন, "পাত্রী হস্তগত করা আমার ভার রইল। টাকা হ'লে বাঘের দুদ পাওয়া যায়। তুমি খরচ করতে যদি কুণ্ঠিত হও, সে দোষ তোমার। আমার হবে না। তোমার টাকা চাই আর সাহস চাই। আমার কৌশল চাই।"

হরিদাস। তা ত আমি বুঝি, কিন্তু তুমি কি কৌশলে মেয়েটিকে আনবে বল দেখি? তার পর অন্য সব কথা।

শশাঙ্ক। আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হ'ল না? আমি বল্লাম, মেয়ে আনা আমার ভার রইল; তুমি এখন টাকার কথা বল।

হরিদাস। আগে আমি কন্যাটি দেখতে চাই, কিম্বা কি উপায়ে আনবে, তা শুনতে চাই, পরে যদি সঙ্গত বোধ হয়, তবে আমি এ কাজে প্রবৃত্ত হব।

হরিদাস শশাঙ্কের প্রতিবাসী বলিয়া তাঁহার চরিত্র বুঝিতেন। প্রবঞ্চনা করিয়া লোকের নিকট হইতে টাকা লওয়া শশাঙ্কের নিত্য কর্ম্ম। এই জন্যই তিনি এত সতর্কতাপূর্ব্বক কথা কহিতেছিলেন।

শশাঙ্ক উত্তর করিলেন, "আমি বলছি, তোমার মেয়ের জন্য ভাবনা নাই, তুমি টাকার কথা বল, তবু তুমি শুনবে না। তুমি টাকার কথা কইলেই ত আর আমি পেলাম না। আগে বন্দোবস্ত কর। তুমি কন্যা দেখে আমাকে টাকা দিও।"

হরিদাস কহিলেন, "হাঁ, এ কথা সংগত বটে। কিন্তু টাকার কথা তুমিই বল। তোমার যা বিবেচনা হয়, আমি তাই দেবো।"

শশাঙ্ক কহিলেন, "এ ত বাজারের দর নয়। এর ত মূল্য নাই। আমি যৎকিঞ্চিৎ পেলেই সাহায্য করবো।"

হরিদাস শশাঙ্কের কথায় ভুলিবার লোক নন। যদি তাঁহার চরিত্র না জানিতেন, তাহা হইলে এমন কথা শুনিলে ভাবিতেন যে, যথার্থ অল্প টাকায় শশাঙ্ক সম্মত হইবেন। কিন্তু গুরুদেবের চরিত্র জ্ঞাত ছিলেন বলিয়া তিনি ইহাতে হর্ষিত হইলেন না। কেবল মাত্র বলিলেন, "তা বটেই ত।"

শশাঙ্ক। তা বটেই ত ব'লে যে চুপ করলে? কাজের কথা কও।

হরিদাস ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিলেন, "শুভ কর্ম্ম সমাধা হ'লে আপনাকে এক হাজার টাকা দেবো।" এই বলিয়া শশাঙ্কের মুখের দিকে চাহিলেন।

শশাঙ্ক হাসিয়া কহিলেন, "ভায়া, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখ্‌ছ না কি?"

হরিদাস কহিলেন, "কেন কেন?"

শশাঙ্ক উত্তর করিলেন, "বলি, উইলখানায় কত টাকা আছে, তা জানা আছে ত?"

হরিদাস। উইলের টাকা আর জলের মাছ সমান। হাতে না আস্‌লে বিশ্বাস নাই। সেই টাকা পাব ব'লেই কি আমি এ বিবাহে এত যত্নবান্ হয়েছি মনে কর্‌লে?

শশাঙ্ক। না, তা মনে করবো কেন, তা মনে করবো কেন! কন্যাটির বিবাহ

হচ্ছে না, কেউ গ্রহণ করতে চায় না, নানান দোষ আছে ; তাই তুমি অনুগ্রহ ক'রে তোমার ছেলের সহিত বিবাহ দিতে চাচ্ছ।

চাতুরীতে হরিদাস কম নন ; শশাঙ্ক ত সে বিদ্যায় বিশারদ। "শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি।"

হরিদাস কহিলেন, "না, তা নয়, তা নয়।"

শশাঙ্ক উত্তর করিলেন, "তাই বটে। মেয়েটির বিবাহ হচ্ছে না, তুমি কৃপা ক'রে ক্ষতি স্বীকার ক'রে আপন পুত্রের সহিত বিবাহ দিলে। আর আমি কন্যাটির পক্ষে একটু উপকার করবো ব'লে আমাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দিতে স্বীকার করছ। তুমি এক জন পরম দয়াবান্ দেশহিতৈষী মহাশয় ব্যক্তি কি না ?"

হরিদাস বলিলেন, "আমি ঠাট্টা করেছিলাম।"

শশাঙ্ক। তবে এখন ঠাট্টা ছেড়ে প্রকৃত কথা কও।

হরিদাস। আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবো।

শশাঙ্ক। এবারও ঠাট্টা হ'ল। একবার ঠাট্টা ছাড় না ?

হরিদাস বলিলেন, "না, এবার ঠাট্টা করি নাই। মনে কর, পনের হাজার টাকার অধিক আর উইলে নাই। কিন্তু প্রথমতঃ এই চুরি ক'রে বিবাহ দিয়ে তা নিয়ে মোকদ্দ'মা করতে হবে ; পরে যদি উইলে কোন গোলমাল হয়···যদি কেন ? হবেই নিশ্চয়। হেম কিছু সহজে পনের হাজার টাকা ছেড়ে দেবে না। তা নিয়ে কত মামলা মোকদ্দ'মা করতে হবে ; এ ছাড়া হাজার অন্য খরচ আছে। মনে কর দেখি, সে সব বাদ দিলে আমার কিছু থাকবে ? অগ্রপশ্চাৎ দেখতে হয়।"

শশাঙ্ক। তোমার মোকদ্দ'মা করতে হবে, আর আমি কি ফাঁকে যাব নাকি ? সে হেমও ইংরাজি ম্যান। সে গুরু পুরুত কেয়ার করে না। তাদের সঙ্গে দেখা করতে এখন ভয় হয়, পাছে প্রণাম না করে। সে কি আমাকে সহজে ছাড়বে ? তবে যদি পেটে খাই ত পিঠে সবে। আমি এক কথা ব'লে যাই, যদি অর্দ্ধেক দিতে পার, তবে এর মধ্যে আছি, নচেৎ না।

হরিদাস। তা পারি নে।

শশাঙ্ক। তবে আর ও-বিষয়ে কথা ব'লে ফল কি ? চল যাই।—এই বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন ; হরিদাস তাঁহার হাত ধরিয়া বসাইলেন। "আচ্ছা, আমি এ বিষয়ে বিবেচনা ক'রে কাল বলবো। এখন তুমি মেয়ে কেমন ক'রে আনবে বল দেখি ?"

শশাঙ্ক। মেয়ে আমার ঘরেই আছে।

হরিদাস। না ?

শশাঙ্ক। যথার্থ, আমি এই গঙ্গাতীরে সন্ধ্যাবেলা কি মিথ্যা বলছি ?

হরিদাস। যাবার সময় দেখাতে পারবে ?

শশাঙ্ক। হাঁ, পারবো।

এই কথার পর শশাঙ্ক ও হরিদাস উভয়ে গঙ্গাতীরে নামিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতে গেলেন।

যাহার যে ব্যবসায়, তাহার তাহাতে ভক্তি হয় না। গয়লারা দুগ্ধ খায় না, ময়রারা সন্দেশ খায় না, চিকিৎসকেরা ঔষধ খায় না, শুঁড়ীরা মদ খায় না, আর যদি লোকজন সম্মুখে না থাকে, তবে ভট্টাচার্য্যরা সন্ধ্যাহ্নিক করেন না।

শশাঙ্ক গঙ্গাতীরে দু-এক বার জল নাড়িয়া কহিলেন, "হরিদাস, চল যাই। সংক্ষেপে সেরে নাও।"

পূজা করা হরিদাসের ব্যবসায় নহে, সুতরাং তিনি প্রতি দিন যেরূপ করিয়া জপ করেন, অদ্যও সেইরূপ করিয়া, উভয়ে একত্র হইয়া চলিয়া গেলেন।

রাস্তায় শশাঙ্কশেখরের বাটী গিয়া হরিদাস স্বর্ণলতাকে চাক্ষুষ দেখিয়া প্রত্যয় করিলেন, "কন্যা যথার্থই হস্তগত হইয়াছে।"

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

"আনায় মাঝারে"

হেমচন্দ্র এক্ষণে আরোগ্য হইতে লাগিলেন। আজ যেরূপ থাকেন, কাল তদপেক্ষা ভাল হন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বিছানা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিতে পারেন নাই। গোপাল পূর্ব্ববৎ সমস্ত দিন রাত্রি হেমের শয্যার নিকট বসিয়া থাকেন। হেম আর কাহারও নিকট কিছু চান না। গোপাল তাঁহাকে খাওয়াইবে, তাঁহার হাত ধুইয়া দিবে, তাঁহাকে শয্যা হইতে উঠাইয়া বসাইবে, তাঁহার সহিত গল্প করিবে। গোপাল হেমের জীবনসর্ব্বস্ব।

শশাঙ্কশেখর প্রত্যহ রেলগাড়ীতে কলিকাতায় যান, আবার সন্ধ্যার সময় বাটী আইসেন। হেমের পিতামহীর কৃতজ্ঞতা আর রাখিবার স্থান নাই, কিন্তু শশাঙ্ক কি অভিপ্রায়ে প্রত্যহ আইসেন যান, তাহা ত টের পান না!

স্বর্ণলতা শশাঙ্কশেখরের নিকট কতই কৃতজ্ঞ হইতেছেন। অন্য লোককে বিশ্বাস না করিয়া প্রত্যহ আপনি গিয়া হেমচন্দ্রের খবর আনেন। ইহা অপেক্ষা দয়ার কার্য্য আর কি হইতে পারে? শশাঙ্কের আসিবার সময় হইলে স্বর্ণলতা বাটীর দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া থাকেন। শশাঙ্কশেখরকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়াই দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন। এক দিবস স্বর্ণলতা কহিলেন, "ঠাকুর মহাশয়, আপনার ঋণ আমি এ জন্মে দূরে থাকুক, জন্ম-জন্মান্তরেও পরিশোধ করতে পারবো না। আপনি প্রত্যহ এত কষ্ট স্বীকার ক'রে খবর আনেন ব'লেই বোধ হয় আমি এত দিন এখানে আছি। তা না হ'লে হয় ত এত দিন লুকিয়ে কলিকাতায় যেতাম।" শশাঙ্কের দয়ার কথা কহিতে কহিতে স্বর্ণলতার চক্ষু হইতে দু-এক বিন্দু জল পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার প্রতি কথায় যেন শশাঙ্কের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল। দস্যুরা কোন বাটী আক্রমণ করিবার সময় বালকদিগকে কিছু বলে

না। মৎস্য ধরিতে বসিলে লোকে ছোটগুলিকে পুনরায় জলে ছাড়িয়া দেয়। শশাংক অতিশয় নিষ্ঠুর হইলেও সরল-হৃদয়া স্বর্ণলতার কথায় তাঁহার অন্তঃকরণ দমিয়া গেল। একবার আত্মগ্লানিও উপস্থিত হইল। স্বর্ণের চক্ষের জল যেন উত্তপ্ত দ্রবীভূত লৌহবিন্দুর ন্যায় শশাংকের হৃদয়কে পীড়িত করিতে লাগিল।

কিন্তু মরুভূমিতে সিঞ্চিত বারি কত ক্ষণ থাকে? স্বর্ণলতা তথা হইতে চলিয়া গেলেই আবার যে শশাংক, সেই শশাংকই হইলেন। রজতের মোহিনী শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তিনি হরিদাসের বাটী গমন করিলেন। দেখিলেন, হরিদাস বসিয়া লেখাপড়া করিতেছেন। শশাংকশেখর কহিলেন, "কি মহাশয়, বিদ্যাভ্যাসে মনোনিবেশ করেছেন না কি?"

হরিদাস কহিলেন, "আসুন; আমি জমাখরচটা লিখে রাখছিলাম।"

শশাংক কহিলেন, "শুভস্য শীঘ্রং। এদিকে আর সময় নাই। আর এক সপ্তাহ দেরি করলে সব অভিসন্ধিই মিথ্যা হবে।"

হরিদাস কহিলেন, 'আমার কোন দেরি নাই। কিন্তু তোমার ধনুর্ভংগ পণ দেখে আমি অগ্রসর হ'তে পারছি না। উইলের অর্দ্ধেক টাকা আমার দেবার শক্তি নাই।"

শশাংক দেখিলেন, দেরি করিলে কিছুই পাওয়া যাইবে না। অতএব যা হাতে আইসে, সেই ভাল। এই ভাবিয়া কহিলেন, "তবে তুমি কি দিতে ইচ্ছা কর?"

হরিদাস। আমি ছয় হাজার দিতে চাই।

শশাংক তাহাতেই সম্মত হইলেন; কহিলেন, "তবে পাত্রের গায়ে হলুদ দাও, পরশ্ব দিবস শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন করা যাইবেক।"

যেমন বিহংগম ব্যাধবিন্যস্ত জালের মধ্যে নিঃশংকচিত্তে নৃত্য করিয়া বেড়ায়, স্বর্ণলতা তেমনি প্রফুল্লচিত্তে শশাংকের বাটীতে বাস করেন। হেম প্রত্যহ আরোগ্য হইতেছেন; তাঁহার সেবাশুশ্রূষার কোন ত্রুটি হইতেছে না, স্বর্ণের আর ভাবনা কি? প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া গুরুকন্যা ও প্রতিবাসী সমবয়স্ক বালিকাদিগের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিতে আরম্ভ করেন। স্নানাহারের পর পান ভোজন করিয়া রাত্রে প্রফুল্লচিত্তে নিদ্রা যান। তিনি যে "আনায় মাঝারে" নিপতিত হইয়াছেন, তাহা স্বপ্নেও জানিতেন না।

সন্ধ্যা হইল। শশাংক গংগাতীরে নিত্যসায়ংক্রিয়া সমাধা করিতে গেলেন। শশাংকের একটি ছোট ছেলে অত্যন্ত রোদন করিতেছে। স্বর্ণলতা কাছে না বসিলে সে বিছানায় শুইবে না। শশাংকের স্ত্রী বিস্তর চেষ্টা করিয়া তাহাকে শয়ন করাইতে না পারিয়া স্বর্ণকে ডাকিলেন। স্বর্ণ দৌড়িয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা, আমাকে ডাকলে কেন?" শশাংকের স্ত্রী গুরুপত্নী; স্বর্ণ তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন করেন।

শশাংকের স্ত্রী কহিলেন, "মা, এস দেখি একবার; এ ছেলেটার কাছে ব'সো, একে ত আমি বিছানায় শোয়াতে পারি না।"

স্বর্ণলতা নিকটে গেলে ছেলেটি আর দ্বিতীয় কথা না কহিয়া শয়ন করিল।

স্বর্ণলতাও সেই বিছানায় শয়ন করিলেন। ঝির ঝির করিয়া বসন্তের বাতাস তাঁহার গায়ে লাগিতে লাগিল। স্বর্ণলতা আস্তে আস্তে নিদ্রিত হইলেন।

শশাঙ্ক নিয়মিত সময়ে বাটী আসিয়া স্ত্রীকে ডাকিলেন। উভয়ে গৃহে প্রবেশ করিলে শশাঙ্ক জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকার কাছে শুয়ে কে?"

শশাঙ্কের স্ত্রী কহিলেন, "স্বর্ণ।"

শশাঙ্ক। জেগে আছে, না ঘুমিয়েছে?

স্বর্ণ, শশাঙ্ক বাটী আসিবা মাত্র জাগ্রত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর সহিত ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কহিতেছেন শুনিয়া কপট-নিদ্রিত হইলেন। শশাঙ্কের স্ত্রী স্বর্ণের কাছে আসিয়া তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "ঘুমিয়েছে।"

শশাঙ্ক। (অস্ফুট স্বরে) তবে তুমি একবার আস্তে আস্তে এই দিকে এস।

শশাঙ্কের স্ত্রী অগ্রসর হইলেন। শশাঙ্ক মৃদু স্বরে দুইটা চাবি দেখাইয়া কহিলেন, "এই দুইটা চাবি দেখ্‌ছো একটা সদরে, একটা খিড়কির। আমি দু দিকেরই দ্বার বন্ধ করেছি; দেখো, যেন বাড়ী হতে অন্য কোনরূপে কেহ বাহির হ'তে না পারে।"

শশাঙ্কের স্ত্রী কহিলেন, "সে কি? বাড়ী থেকে বেরোবে কেন?"

শশাঙ্ক কহিলেন, "তোমার সে কথায় কাজ কি?"

শশাঙ্কের স্ত্রী। আমার কাজ আছে। আমাকে বল্‌তে হবে, না বল্লে আমি এখনই এ কথা প্রকাশ ক'রে দেবো।

শশাঙ্ক সমুদায় প্রকাশ করিয়া বলিলেন। তাঁহার স্ত্রী শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। এবং স্বর্ণলতার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। শশাঙ্কের স্ত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তদ্দর্শনে শশাঙ্ক কহিলেন, "তুমি ত আমাকে জানই; যদি তোমা কর্ত্তৃক আমার মনস্কামনা বিফল হয়, তা হ'লে তোমাকে—"এত দূর পর্য্যন্ত স্পষ্ট বলিয়া, পরে অস্ফুট স্বরে দুই তিনটি কথা কহিয়া শশাঙ্ক বহির্বাটীতে গমন করিলেন।

স্বর্ণের যেন নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু জাগ্রত থাকিয়া কি প্রকারে নিদ্রাভঙ্গের ভান করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া, ক্রোড়স্থ শিশুটির গায়ে একটি টিপ দিলেন। ছেলেটা কাঁদিয়া উঠিল। স্বর্ণও চক্ষু মুছিতে মুছিতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। শশাঙ্কের স্ত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কাতর স্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "মা, তুমি ঘুমিয়েছিলে?" স্বর্ণ "হাঁ" বলিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। খিড়কির দ্বারে গিয়া দেখেন, দ্বার রুদ্ধ। দৌড়িয়া সদর দরজায় গেলেন। সদর দরজা বাহির দিক্ হইতে বন্ধ দেখিলেন। স্বর্ণলতা যেন পিঞ্জরে বন্ধ পক্ষীর ন্যায় হইলেন। এত দিন ঐ বাড়ীর মধ্যে ছিলেন, তাহাতে কোন কষ্ট বোধ হয় নাই। কিন্তু আজি তথাকার বায়ু তাঁহার নিকট বিষময় বোধ হইতে লাগিল, সে বায়ু সেবন করিয়া জীবন ধারণ করা ক্লেশকর হইয়া উঠিল। দৌড়িয়া

যে ঘরে ছিলেন, পুনরায় সেই ঘরে আসিলেন। শশাঙ্কের স্ত্রী স্বর্ণলতাকে দেখিয়া ডরাইয়া উঠিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি এতই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। স্বর্ণলতা অবশেন্দ্রিয়ের মতন হইয়া ঘরের মেজেয় বসিলেন। শশাঙ্কের স্ত্রী দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কি মা, কি হয়েছে ?"

স্বর্ণ আর মনের ভাব গোপন করিয়া রাখিতে পারিলেন না। রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "আমি সকলি শুনেছি। আমারে তোমরা মেরে ফ্যালো। বিষ খাওয়ায়ে দাও।"

স্বর্ণের কথা শুনিয়া শশাঙ্কের স্ত্রী অন্তঃকরণ দ্রব হইয়া গেল। ফলতঃ তিনি তাঁহার স্বামীর ন্যায় নির্দ্দয় ছিলেন না। শয্যা হইতে উঠিয়া স্বর্ণের নিকট উপবেশনপূর্ব্বক স্বর্ণকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "তুমি কেঁদ না মা, আমি তোমার উদ্ধারের উপায় ক'রে দেব।"

শশাঙ্কের স্ত্রীর কথা শুনিয়া স্বর্ণ অমনি তাঁহার পা ধরিয়া শুইয়া পড়িলেন। তিনি স্বর্ণকে সাদরে ভূমি হইতে তুলিয়া চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। কহিলেন, "মা, তুমি ত লেখাপড়া জান ?"

স্বর্ণ কহিলেন, "একটু একটু জানি।"

"পত্র লিখ্‌তে পার্‌বে ত ?"

"পারবো ; কিন্তু কাকে লিখ্‌বো ? দাদার বিছানা হ'তে উঠিবার জো নাই। তাঁহাকে লেখাও যে, না-লেখাও সেই।"

"আর কোন লোক নাই ? যাকে লিখলে তোমাকে নিয়ে যেতে পারে।"

এই কথা শুনিয়া স্বর্ণের মুখ ঈষৎ আরক্তিম হইল। মাটির দিকে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "আর কাকেই বা লিখ্‌বো।"

"এই যে শুনেছি, তোমাদের বাসায় আর একটি কে থাকে ? কি না তার নামটা ? গোপাল। হাঁ হাঁ, গোপালকে লেখ না কেন ?"

স্বর্ণের মুখ আরও লাল হইল। তিনি কহিলেন, "না, দাদাকেই লিখি, তা হ'লে তিনি দেখতে পাবেন।"

"তোমার দাদাকে লেখায় লাভ কি ? তিনি ত শয্যাগত।"

স্বর্ণলতা মাটির দিকে মুখ করিয়া কহিলেন, "দাদাকে লিখ্‌লে গোপাল দাদা দেখতে পাবেন।"

শশাঙ্কের স্ত্রী কালি কলম কাগজ আনিয়া দিলেন। স্বর্ণলতা চিঠি লিখিলেন।

পরদিবস প্রাতে যখন শশাঙ্কের দাসী বাজার করিতে যায়, চিঠিখানি গোপনে লইয়া গিয়া ডাকঘরে দিয়া আসিল।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

গোপালের কারাবাস

পোষ্ট অফিসের সনাতন নিয়মানুসারে অগ্রে সাহেবদিগের চিঠি বিলি হয়, তৎপরে যদি সময় থাকে এবং যদি মহানুভব হরকরা মহোদয় ক্লান্ত না হন, তাহা হইলে অন্যান্য সকলের চিঠি বিলি হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু যদি হরকরা মহাশয় ক্লান্ত হন, বিশেষ যদি দূরের কোন স্থানের একখানি চিঠির অতিরিক্ত না থাকে, তবে সুবিবেচক হরকরা সে চিঠিখানিকে ব্যাগের মধ্যে রাখিয়া দেন। ক্রমে সেই স্থানের দশ পাঁচখানি একত্র হইলে এক দিবস অপরাহ্ণে গজেন্দ্রগমনে সেগুলিকে বিলি করিতে যান। স্বর্ণলতা যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন, সাধারণ নিয়মানুসারে সেখানি পরদিবস প্রাতেই হেমের বাসায় পেঁছান উচিত ছিল; কিন্তু উল্লিখিত সনাতন নিয়মের কোন এক "ধারার মর্ম্মে" চিঠিখানি দেরি করিয়া তিনটার সময় দর্শন দিল। চিঠিখানির শিরোনামায় হেমের নাম। গোপাল ইতিপূর্ব্বে স্বর্ণলতার হস্তাক্ষর দেখেন নাই। বাটী হইতে যে সমস্ত চিঠিপত্র আসিত, তাহা বাটীর গোমস্তাই লিখিত। সুতরাং এখানি বাটীর চিঠি নয় ভাবিয়া তিনি খুলিলেন না। হেম নিদ্রিত আছেন, তাঁহাকেও জাগাইলেন না।

একটু পরে হেমের নিদ্রাভঙ্গ হইল। গোপাল চিঠিখানি হেমের হস্তে দিলেন। শিরোনামা দেখিয়া হেম কহিলেন, "স্বর্ণের চিঠি গোপাল।" গোপাল কম্পিতকরে চিঠিখানি গ্রহণ করিয়া মনে মনে পাঠ করিলেন। কিন্তু কি পড়িলেন, হেমকে কহিলেন না। হেম জিজ্ঞাসিলেন, "কি লিখেছে?"

গোপাল তাচ্ছিল্য করিয়া চিঠিখানি খাটের নীচে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "আর কি লিখ্‌বে, তুমি কেমন আছ, তাই জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠায়েছে।"

হেম, সন্তুষ্ট হইয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শুইলেন, কিন্তু তখন যদি গোপালের মুখ পানে নিরীক্ষণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মুখ জবাফুলের ন্যায় লাল ও কপালে ঘর্ম্ম দেখিতে পাইতেন। "আমি আসি" বলিয়া গোপাল চিঠিখানি কুড়াইয়া লইয়া নীচে হেমের পিতামহীর নিকট আসিলেন এবং শ্যামাকে হেমের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। পরে চিঠিখানি হেমের পিতামহীকে পড়িয়া শুনাইলেন। হেমের পিতামহী শুনিয়া রাগে কম্পিতকলেবরা হইয়া গুরুদেবকে গালি দিতে লাগিলেন।

গোপাল কহিলেন, "আপনি অত গোলমাল করবেন না। দাদা শুন্‌লে অত্যন্ত কষ্ট পাবেন। আমি চল্লাম, চারটা বেজেছে, ছটার সময় বিবাহ। এখনি না গেলে গাড়ী পাব না।" এই বলিয়া একখানি চাদর স্কন্ধে ফেলিয়া ও একগাছি ছড়ি লইয়া হেমের পিতামহীকে পুনরায় কহিলেন, "আপনি এ কথা কারুকেও কইবেন না। আপনি এইখানেই থাকুন, নচেৎ উপরে গেলে প্রকাশ ক'রে ফেলবেন। দাদা আমার কথা জিজ্ঞাসা করলে বল্‌বেন, আমার কোন নিজের বিশেষ প্রয়োজন-বশতঃ ভবানীপুরে চল্লাম। হয় ত আসতে পারবো না।" এই বলিয়া বাহির

হইয়া গেলেন, একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "আমাকে কিছু খরচ দিন। শীঘ্র, দেরি না হয়।"

পিতামহী বাক্স খুলিয়া একখানি নোট দিলেন। গোপাল নোটখানি পকেটে রাখিয়া দৌড়িয়া ঘরের বাহির হইলেন।

সৌভাগ্যক্রমে রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিলেন, একখানা খালি গাড়ী যাইতেছে। গাড়োয়ানকে কহিলেন, "আমাকে গাড়ী ছাড়বার আগে যদি হাবড়া-ঘাটে পেঁাছিয়া দিতে পার, তবে তোমাকে ভাল বকশিশ দেব।"

গাড়োয়ান গাড়ী থামাইল। গোপাল অবিলম্বে গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিবা মাত্রই গাড়ী প্রবল বেগে চলিল। দেখিতে দেখিতে হাবড়া-ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। গোপাল হাবড়া-ঘাটে পেঁাছিয়া দেখিলেন, ষ্টীমার ছাড়িবার উদ্যোগ করিতেছে। পকেট হইতে নোটখানি বাহির করিয়া দেখেন কুড়ি টাকার। গাড়োয়ানকে কহিলেন, "তোমার কাছে টাকা আছে?" সে কহিল, "না"।

নিকটে একজন ভাগে ভাগে পয়সা রাখিয়া বিক্রয় করিতেছে। গোপাল নোটখানি তাহাকে দিয়া কহিলেন, "আমাকে পনের টাকা আর গাড়োয়ানকে পাঁচ টাকা দাও।" টাকাগুলি লইয়াই দৌড়িয়া ঘাটে গেলেন। দোকানী গাড়োয়ানকে পাঁচ টাকা দিল।

গোপালও নদীর ধারে গেলেন, অমনি ষ্টীমার "হুস হুস" করিয়া যেন তাঁহাকে ঠাট্টা করিতে করিতে চলিয়া গেল।

গোপাল নিরুপায় ভাবিয়া একখানি নৌকায় উঠিলেন। মাঝিকে কহিলেন, "গাড়ী ছাড়বার পূর্ব্বে যদি আমাকে পার ক'রে দিতে পার, তা হ'লে তোমাকে এক টাকা বক্‌শিশ দেবো।" এই বলিয়া টাকাটি ফেলিয়া দিলেন।

মাঝি কহিল, "হয় কর্ত্তা, তা পারুমু। আপনি বৈসেন।" এই বলিয়া টাকাটি কুড়াইয়া লইয়া নৌকা খুলিয়া দিল।

গাড়ী ছাড়ীবার পূর্ব্বক্ষণ, বংশীধ্বনিসদৃশ শব্দ হইতেছে, এমন সময় নৌকা কূলে লাগিল। গোপাল তদ্দণ্ডে লাফ দিয়া তীরে উঠিয়া যাইবেন, কিন্তু মাঝিরা আসিয়া ভাড়া চাহিল। গোপাল কহিলেন, "একবার দিয়েছি ত?"

মাঝি কহিল, "হয় কর্‌তা, ও ত বক্‌শিশ দিছেন। এখন ভাড়া দ্যান না।"

গোপাল মাঝির কথা শুনিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। গাজি বদরের চর গোপালের রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইল।

গোপাল পকেট হইতে একটি টাকা ফেলিয়া দিয়া চলিলেন। তিনিও ষ্টেশনে পৌঁছিলেন, গাড়ীও ছাড়িল। গোপাল দুঃসাহসে নির্ভর করিয়া লাফ দিয়া গাড়ীর চরণাধারে চড়িলেন এবং পরক্ষণেই দুয়ার খুলিয়া গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। টিকিট লওয়া হইল না।

গাড়ীতে প্রবেশ করিয়া গোপালের মাথা ঘুরিতে লাগিল এবং সর্ব্বাঙ্গ

শরীর অবশ হইয়া আসিল। হেমের পীড়া হওয়া অবধি তাঁহার সুচারুরূপে আহার নিদ্রা হয় নাই। তদ্ব্যতীত রেলওয়ে আসিতে যে কষ্ট হইয়াছিল, এই সমস্ত কারণে গোপাল মূর্চ্ছিত হইবার উপক্রম দেখিয়া গাড়ীতে শয়ন করিলেন। এবং ক্রমে ক্রমে সমীরণ সঞ্চালনে তাঁহার নিদ্রাবেশ হইল। গোপাল নিদ্রিত হইলেন।

কোথায় বা শ্রীরামপুর, কোথায় বা স্বর্ণলতা! গোপাল নিদ্রা যাইতেছেন। এমন গাঢ় নিদ্রা গোপালের কখনও হয় নাই। কত স্থানে গাড়ী থামিল, কত নূতন লোক আসিল, কত পুরাতন লোক চলিয়া গেল, গোপালের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। রাত্রি নয়টার সময় গাড়ী গিয়া বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইল। অনেক রেলওয়ের কর্ম্মচারী এক এক করিয়া গাড়ী খুলিয়া টিকিট লইতেছে। লোকজন চতুর্দ্দিকে গোলমাল করিতেছে। তথাপি গোপালের ঘুম ভাঙ্গে না। পরে যে গাড়ীতে তিনি ছিলেন, রেলওয়ে কর্ম্মচারী তাহার দ্বারে দাঁড়াইয়া লণ্ঠন দ্বারা তাহার অভ্যন্তরে আলোক নিক্ষেপ করিল। গাড়ীতে এক মাত্র গোপাল। রেলওয়ে কর্ম্মচারী "বাবু" "বাবু" বলিয়া দুই চার ডাকায় গোপাল উঠিলেন। "এই শ্রীরামপুর?"

কর্ম্মচারী কহিল, "তুমি স্বপ্ন দেখ্‌ছ না কি? এ বর্দ্ধমান।"

কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া গোপালের মাথা ঘুরিয়া গেল; মুহূর্ত্তে ব্রহ্মাণ্ড দেখিলেন। যেমন বসিয়া ছিলেন, অমনি বসিয়া রহিলেন। উঠিবার শক্তি রহিল না।

কর্ম্মচারী কহিল, "এখন এস, টিকিট দাও।"

গোপাল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "আমার কাছে টিকিট নাই। দাম লও।"

কর্ম্মচারী কহিল, "টিকিট নাই অনেক ক্ষণ টের পেয়েছি; এখন চল, ষ্টেশনে সাহেবের কাছে চল।" এই বলিয়া তাহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক ষ্টেশনে লইয়া চলিল।

কিন্তু সাহেব তৎকালে তথায় উপস্থিত না থাকায় বড় বাবু গোপালকে সে রাত্রি গারদে রাখিবার জন্য হুকুম দিলেন।

সে রাত্রি গোপালের কষ্ট অনুভূত হইতে পারে, কিন্তু বর্ণনাতীত। প্রথমতঃ ভাবিলেন, "স্বর্ণলতা হইতে জন্মের মতন বঞ্চিত হইলাম।" গোপাল স্পষ্ট কিছুই শোনেন নাই, তথাপি তাঁহার মনের কেমন এক বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার স্বর্ণলতা লাভ হইবেক। এক্ষণে একেবারে সে বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ হইয়া গেল। দ্বিতীয় ভাবনা এই—"কেন আমি দাদাকে চিঠির মর্ম্ম বলিলাম না? কেন আমি আপনার ইচ্ছামত এই গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলাম? হয় ত দাদা শুনিলে অন্য কোন উপায়ে উদ্ধার করিতে পারিতেন। গ্রহণ করিয়াই বা কেন আমি প্রাণপণে সে কার্য্য সাধনে যত্ন করিলাম না? হায়! কেন বা নিদ্রিত হইয়াছিলাম? এখন কি প্রকারে ফিরিয়া গিয়া দাদার নিকট মুখ দেখাইব? দাদা আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। আমি কিন্তু কি কৃতঘ্নের কাজ করিলাম। স্বর্ণলতাকে আমি চিরদুঃখিনী করিলাম। যদি আমি তাঁহার চিঠি তাঁহাকে দিতাম অথবা পড়িয়া

শুনাইতাম, তাহা হইলে হয় ত কখনই এরূপ হইতে পারিত না। স্বর্ণলতা এ বিবাহের পর আত্মহত্যা করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। আমারও তাই করা উচিত। এ পাপে আর তাহা ভিন্ন কি প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে? হায়! এত ক্ষণ স্বর্ণলতা দাদাকে নিন্দা করিতেছে, কিন্তু আমিই যে তাহার সর্ব্বনাশ করিলাম, তাহা জানিতে পারিতেছে না।"

গোপাল এইরূপ বিলাপ করিয়া রজনী প্রভাত করিলেন। কিন্তু নিজে যে কারাগারে আছেন, সে জন্য তাঁহার চিন্তার লেশ মাত্রও হইল না। মনে করিলেন, "আমি ত রজনী অবসান হইলেই মুক্ত হইব, কিন্তু স্বর্ণলতার শৃঙ্খল আর এ জন্মেও ভাঙ্গিবে না।"

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

তরী ডুবু ডুবু

আজি স্বর্ণের বিবাহ; বরের বাটীতে মহাধুম। কলিকাতা হইতে ইংরাজি বাদ্য আসিয়াছে। পাড়ার ছেলেতে এবং রাস্তার লোকে সদর-বাটীর উঠান পরিপূর্ণ। পাত্রটি সহজেই দেখিতে সুশ্রী নয়। একে কালো, তাহার উপরে লাল চেলী পরিয়া শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধের রক্তবীজের ন্যায় ভীষণাকার ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার সমপাঠী বন্ধুরা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন, বর তাহাদিগের মধ্যে বসিয়া আছেন।

বিবাহের দিবস বর কন্যার কতই আদর? দীন দুঃখী হইলেও সে দিন লোকে তাহাদিগকে যত্ন করে; যার-পর-নাই কুৎসিত হইলেও তাহাদিগকে দেখিতে আইসে। যাহারা জন্মাবধি প্রত্যহই দেখিতেছে, তাহারাও আজি এক বার নূতন করিয়া বর দেখিতে আসিতেছে। মাঝে মাঝে একজন লোক গিয়া বরকে ডাকিয়া আনিতেছে। বর বয়স্যদিগের নিকট হইতে অত্যন্ত অনিচ্ছা প্রকাশপূর্ব্বক উঠিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সে অনিচ্ছাটি আন্তরিক নয়।

শশাঙ্কশেখর প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্বর্ণকে ডাকিয়া কহিলেন, "স্বর্ণ, আজ তুমি কিছু আহার ক'রো না।"

স্বর্ণ যেন আশ্চর্য্য হইয়াছেন ভান করিয়া কহিলেন. "কেন?"

শশাঙ্ক বিকট হাস্য হাসিয়া কহিলেন, "আজ তোমার বিবাহ।"

শশাঙ্কের বিকট হাস্যে স্বর্ণের হৃৎকম্প হইল। অন্যান্য দিন শশাঙ্কের যেরূপ চেহারা দেখিতেন, আজ যেন তাঁহার চক্ষে আর সে চেহারা নাই। তিনি পুস্তকে যে সব দৈত্য দানবের কথা পাঠ করিয়াছিলেন, শশাঙ্ক যেন তাহারই একজন বলিয়া স্বর্ণের বোধ হইতে লাগিল।

শশাঙ্ক পুনর্ব্বার কহিলেন, "আজ তোমার বিবাহ স্বর্ণ" এবং কথা সমাপন করিয়া আর একবার পূর্ব্বাপেক্ষা ভীষণতর বিকট হাস্য হাসিলেন।

শশাঙ্কের ভাব ও মূর্ত্তি দেখিয়া স্বর্ণলতার লজ্জা পলায়ন করিল। রোষে কম্পিতকলেবরা হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আমার বিবাহ কে দেবে? কোথায় হবে?"

শশাঙ্ক পূর্ব্ববৎ হাসিয়া কহিল, "তোমার বাপ বেঁচে থাকলে তিনিই দিতেন, তাঁর অবর্ত্তমানে আমিই দেবো, যেখানে বিবাহ হবে, তা তুমি জান, সে দিন রাত্রে সব শুনেছ।"

স্বর্ণের শরীর রাগে ও ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি কপটনিদ্রিত ছিলেন, এ কথা শশাঙ্ক কি প্রকারে জানিতে পারিল? কোনও বিদ্যাবলে কি মনের ভাব গণনা করিয়া স্থির করিতে পারে?

স্বর্ণ কহিলেন, "তুমি পরম হিতকারী গুরুঠাকুরই বটে!".

শশাঙ্ক উত্তর করিল, "পরের হিত না করি, নিজের হিত ত করি।" একটু পরে আবার কহিল, "পরেরই বা হিত কিসে না করলাম। যে বিবাহের সম্বন্ধ করেছি, তাতে তোমার বাপেরও মত ছিল।"

স্বর্ণ সরোষে কহিলেন, "কখনও না।"

শশাঙ্ক আবার বিকট হাস্য হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা, তাঁর না ছিল, আমার আছে।"

স্বর্ণ কহিলেন, "তোমার মত থাক্‌ল, আর না-থাক্‌ল, তাতে কা'র বয়ে গেল? যার বে, তার মত নাই।"

শশাঙ্ক। তারও আছে। পাত্রের মত সর্ব্বাগ্রে হয়েছে।

স্বর্ণ। পাত্রের মত হ'ল, আর না হ'ল, তাতে আমার কি? আমার মত নাই।

"ঐ ত তোমাদের দোষ!" শশাঙ্ক আরম্ভ করিলেন, "কি দু-পাতা পড়ো আর শোন; সেই পড়ার জোরেই একবারে এত আত্মবিস্মৃত হও যে, লজ্জা সরম থাকে না, হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তোমার ভালর তরে বল্‌ছি, গোলমাল ক'রো না। শুভ কর্ম্মে গোলমাল করা ভাল নয়।" শশাঙ্ক এই বলিয়া তথা হইতে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

স্বর্ণ কহিলেন, "তুমি কোথায় যাও? কাল অবধি আমাকে চাবি বন্ধ ক'রে রেখেছ, আমাকে ছেড়ে দিয়ে যাও। আমি এখনই কলিকাতায় যাব।"

শশাঙ্ক। আজ না। বিবাহের পর কলিকাতায় যেও।

স্বর্ণ গৃহের দরজার নিকট অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "আমি এইখানে খুন হ'ল ব'লে চেঁচাই, রাস্তার লোক শুনে দুয়ার ভেঙেগ বাটীর মধ্যে আস্‌বে।" স্বর্ণ এই বলিয়া যেমন বাহির হইবেন, শশাঙ্ক তাহার হস্ত ধরিয়া ঘরের দিকে টানিতে লাগিল। স্বর্ণ দু-এক বার বাহিরের দিকে টানিলেন, কিন্তু তাঁহার সাধ্য কি যে, শশাঙ্কের সহিত জোরে পারেন? গুরুদেব তাঁহাকে গৃহমধ্যে রাখিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া দরজায় চাবি বন্ধ করিল। স্বর্ণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। শশাঙ্ক কহিল, "এখন তোমার যত খুশী কাঁদ।" এই বলিয়া আবার একবার বিকট হাস্য হাসিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল।

বরের বাটীতে গিয়া শশাংক বাদ্যকরদিগকে আপন বাটীতে আনিল এবং কহিয়া দিল, "যখন বাড়ীর মধ্যে কান্না শুনবে, তখন বাজাবে।"

স্বর্ণলতা কত কাঁদিলেন, কত রাগ করিয়া তিরস্কার করিলেন, কত করজোড়ে স্তুতি করিলেন, নিষ্ঠুর শশাংক কিছুতেই শুনিল না।

স্বর্ণ শশাংককে কহিলেন, "আমার বিবাহ দিয়ে তুমি যত টাকা পাবে, আমি তোমাকে তার দ্বিগুণ দেবো, আমাকে ছেড়ে দাও। বাবা আমাকে যত টাকা দিয়ে গিয়েছেন, আমি সকলি লিখে প'ড়ে দিচ্ছি ; আমাকে দাদার কাছে পাঠায়ে দাও।"

শশাংক কহিল, "তোমার সে টাকা দেবার অধিকার অদ্যাপি হয় নাই, নচেৎ আমার কোন আপত্তি ছিল না।"

স্বর্ণ। আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বলছি—আমি দেবো।

শশাংক কহিল, "শশাংকশেখর শর্ম্মা প্রতিজ্ঞায় ভোলেন না।"

স্বর্ণলতা কহিলেন, "তবে তোমার কিসে প্রত্যয় হয় বলো, আমি তাই করবো।"

শশাংক। তোমাকে পাত্রস্থ করতে পারলেই আমার প্রত্যয় হয়।

স্বর্ণলতা কহিলেন, "তোমার ত মেয়ে আছে ? আমাকেও তোমার মেয়ের মতন মনে করো। তোমার মেয়ের কি জোর ক'রে বে দেবে ?"

"আমার মেয়ে তোমার মতন নির্লজ্জ নয় যে, বের কথা নিয়ে এত গোল করবে। আমি যেখানে তার বিয়ে দেবো, তার সেইখানেই বিবাহ হবে। তার এ বিষয়ে তোমার মতন মতামত নাই। সে পড়াশুনা করে নি, তার ভাইও ইংরাজি জানে না।"

স্বর্ণলতা কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া চুপ করিলেন।

শ্রীরামপুর দিয়া রেলওয়ে গাড়ী আসিতেছে যাইতেছে, নিয়মিত কাল পর্য্যন্ত তথায় থামিতেছে। এক এক বার গাড়ীর শব্দ হয় আর স্বর্ণলতা মনে করেন, "এইবার আমাকে নেবার জন্য লোক আসছে।" আহা! কয়টা আশা সুফলবতী হয় ? সমস্ত আশাই সুফলবতী হইলে পৃথিবী স্বর্গসম হইত। স্বর্ণলতা একবার নৈরাশ হন, আবার মনে করেন—এ গাড়ী কলিকাতায় যাচ্ছে, এখানা কলিকাতা হ'তে আসছে না। ইচ্ছা হইলে কল্পনারূপ অনুভব করা যায়, স্বর্ণলতার কানে এমনি শব্দ হইতে লাগিল—যেন আজি সমুদায় গাড়ী কলিকাতায় যাইতেছে। কলিকাতা হইতে একখানিও আসিতেছে না।

ক্রমে দিবা অবসান হইতে লাগিল। সূর্য্যদেবের দয়া মমতা নাই। কত শত রোগী শয্যায় শয়ন করিয়া রজনীর সমাগম দেখিয়া কম্পিতকলেবর হইতেছে। সমুদ্রে কত শত তরী বিপথগমনের ভয়ে সূর্য্যদেবের পশ্চিমে গতি দেখিয়া ব্যাকুল হইতেছে। রজনী আসিলে স্বর্ণলতা চিরজীবনের জন্য শোকসাগরে নিমজ্জিতা হইবেন ভাবিয়া কতই রোদন করিতেছেন। এ সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া কি দিনকরের হৃদয়ে এক বারও করুণার সঞ্চার হয় না ? তাঁহারা কি পিতা পুত্র উভয়েই সমান ?

হায় ! যে সময় তোমার পুত্র অন্তর্জলে, সেই সময়ে কত শত লোকের পুত্রের বিবাহ হইতেছে। কত শত লোকের রাজ্য লাভ, ধন লাভ হইতেছে। সূর্য্যদেবের কি পক্ষপাত করিলে চলে ? জয়দ্রথের জন্য তিনি এক দণ্ড আগেও অস্তাচলে যান নাই। সূর্য্যদেবের বংশে পক্ষপাতিত্ব নাই, তাঁহারা পিতা পুত্র উভয়েই সমান।

যতই সন্ধ্যা হইতে লাগিল, ততই স্বর্ণলতার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এক্ষণে আবার আর এক ভাবনা উপস্থিত হইল। স্বর্ণলতা মনে করিলেন, হয় ত তাঁহার দাদার পীড়া বৃদ্ধি হইয়াছে, কিম্বা—ভাবিতে হৃদয় কম্পিত হয়—তদপেক্ষা গুরুতর অশুভ ঘটনা হইয়াছে। শশাঙ্ক অদ্য দুই দিবস আর কলিকাতায় যায় নাই। স্বর্ণ আপনার দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। হেমের শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য জানিবার জন্য তাঁহার চিত্ত যার-পর-নাই ব্যগ্র হইল। কেহই নিকটে আসিতেছে না, যাহার কাছে খবর লইতে পারেন। শশাঙ্ক এক্ষণে অত্যন্ত ব্যস্ত ; তাহার আর স্বর্ণের নিকট আসিবার অবকাশ নাই। শশাঙ্কের স্ত্রী ও কন্যাকে প্রাতঃকাল অবধি অন্তঃপুরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

সন্ধ্যা সমাগত হইল। আকাশে স্থানে স্থানে একটু একটু মেঘ দেখা দিল। বসন্তের সমীরণ বহিতে লাগিল। মালা, চন্দন ও পট্টবস্ত্রে বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বর আসিল, ইংরাজি বাদ্য বাজিল। শঙ্খধ্বনি হইল। বর সভায় বসিল। বালকেরা বরকে লইয়া ঠাট্টা তামাসা করিতে লাগিল। পুরোহিত আসিলেন। শশাঙ্ক এ সকলের একটু দূরে বসিয়া হরিদাসের নিকট হইতে টাকা গণিয়া লইতে লাগিল।

স্বর্ণলতা আপন কারাগারে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। যে কিছু পরিত্রাণের আশা ভরসা ছিল, সন্ধ্যা হইলে দূরীভূত হইল। "হা ঈশ্বর ! আমার অদৃষ্টে এই ছিল" বলিয়া স্বর্ণলতা আর্ত্তনাদ করিতেছেন। কে তাঁর কান্না শোনে! সকলেই আমোদ-প্রমোদে মত্ত। শশাঙ্ক এখনও হরিদাসের নিকট হইতে টাকা গণিয়া লইতেছে।

টাকা গণিয়া লইয়া শশাঙ্ক ও হরিদাস উভয়ে সভায় গেল। দেখিল, সমুদায় প্রস্তুত। কন্যা আনিলেই হয়। শশাঙ্ক কন্যা আনিতে আসিল।

দ্বারোদ্ঘাটন করিবা মাত্র স্বর্ণলতা দৌড়িয়া শশাঙ্কের চরণে পড়িলেন। রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "আগে আমাকে বল—দাদা কেমন আছেন, তা না হ'লে আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না।"

শশাঙ্ক কহিল, "তোমার দাদা ভাল আছেন।"

স্বর্ণ কহিলেন, "আমার মাথা খাও, তোমার ছেলের মাথা খাও, সত্যি কথা বলো।"

স্বর্ণের তখন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়াছে। কি বলেন, তাহার ঠিকানা নাই।

শশাঙ্ক কহিল, "আমি যথার্থ বলছি, তোমার দাদা ভাল আছেন। তিনি ভাল আছেন ব'লেই ত তোমার এত শীঘ্র বিবাহ দিচ্ছি। সম্পূর্ণ আরোগ্য হ'লে

কি আর এ বিবাহ দিতে দেবেন? তাঁর যদি কোন অশুভ হ'ত, তা হ'লে ত তুমি আমাদের হাতেই থাকতে, এত ব্যস্ত কখনই হতেম না।"

স্বর্ণলতা দেখিলেন, শশাঙ্কের কথা সঙ্গতই বটে। তখন তিনি কহিলেন, "আমার অসম্মতিতে বিবাহ দিও না, দিও না, দিলে তোমার ভাল হবে না। আমি নিশ্চয়ই গলায় ফাঁসি দিয়ে মরবো।"

পাষণ্ড শশাঙ্ক কহিল, "এক বার সাত পাক দিয়ে দিলে তার পর তুমি বিষই খাও, আর গলায়ই ছুরি দাও, আমার তাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই; আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক সাত পাক পর্য্যন্ত।" এই বলিয়া শশাঙ্ক পুর্ব্বের ন্যায় হাসিল।

স্বর্ণলতা শশাঙ্কের পা ধরিয়াছিলেন। শশাঙ্ক হেঁট হইয়া হস্ত দ্বারা তাঁহার হস্ত ধরেন, এমন সময় স্বর্ণ উঠিয়া দৌড়িয়া গৃহের কোণে গিয়া আপনার অঞ্চল দ্বারা গলদেশ বন্ধনপুর্ব্বক কহিলেন, "তুমি যেখানে দাঁড়ায়ে আছ, ওখান থেকে যদি এক পা আগে এস, তা হ'লে আমি ফাঁসি টেনে মরবো।"

শশাঙ্ক কহিল, "স্বর্ণ, তুমি ছেলেমানুষ, তাতেই এত জোর করছ। তোমার আর কি সাধ্য আছে, আমার হাত থেকে উদ্ধার হও। এই বেলা সহজে এস। লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে যায়। তোমার বিবাহ এই রাত্রে দেবই দেবো, লগ্ন বহির্ভূত হ'লে ভবিষ্যতে তোমারই অমঙ্গল।" এই বলিয়া শশাঙ্ক এক পদ অগ্রসর হইল।

স্বর্ণলতা কহিলেন, "এই টানলাম ফাঁসি। আমার মৃত্যুও যে, এমন বিবাহও সেই।" এই বলিয়া ফাঁসি টানিবেন, এমন সময় বহির্বাটী হইতে এক প্রকাণ্ড আলোক দেখা গেল। উভয়ে চমকিয়া সেই দিকে দৃষ্টি করিলেন। আলোক মুহূর্ত্তমধ্যে দশ দিক্ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। শশাঙ্ক টের পাইল, তাহার বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপে আগুন লাগিয়াছে।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

শশীর চক্ষু ফুটিল

শশিভূষণ রামসুন্দর বাবুর বাটী হইতে নিজবাটী আগমন করিয়া প্রমদার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। প্রমদা শুনিয়া দুই চারি বার দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না। ক্ষণকাল নীরবে পতির নিকট বসিয়া থাকিয়া তথা হইতে যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। শশিভূষণ জিজ্ঞাসিলেন, "কোথায় যাও? আমার কথা শুনে চুপ করলে যে?" প্রমদা উত্তর করিলেন, "আমি আসি।" এই বলিয়া নীচে মায়ের নিকট আসিলেন।

শশিভূষণের যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল, সকলই প্রমদার নামে। প্রমদার নামে কাগজ, প্রমদার নামে বাটী, প্রমদার নামে জমি জমা। নগদ টাকাও প্রমদার কাছে। প্রমদা শশিভূষণকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, স্ত্রীর নামে ধন রাখিলে সে ধনে কোন সরিকের অংশ থাকে না, দায় বিবাদের সময় সে বিষয় কেহ নিলাম

করিয়া লইতে পারে না ; পুরুষের নামে থাকিলে কোন একটা দাবিতে লোকে বিষয় বেচিয়া লইতে পারে ; স্ত্রীর নামে থাকিলে তাহার কোনই ভয় থাকে না। শশিভূষণ এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কায়মনোবাক্যে এত কাল ইহারই অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন। বিধুভূষণের জমি জমার খাজানা দিবার উপায় ছিল না, এ জন্য প্রথমতঃ শশিভূষণ সমুদায় খাজানা দিতেন। না দিলে যদি বিক্রয় হইয়া যায়, তাহা হইলে উভয়েরই ক্ষতি। প্রমদার পরামর্শে ক্রমে তিনি খাজানা দেওয়া বন্ধ করিলেন ; পরে নিলাম হইবার সময় সেগুলি সমুদায় প্রমদার নামে কিনিয়া রাখিয়াছিলেন। নগদ টাকা যখন যাহা হাতে থাকিত, প্রমদার উপদেশক্রমে তদ্দ্বারা অলঙ্কার প্রস্তুত করিতেন। প্রমদা কহিতেন, "হাতের টাকা একবার গেলে আর পাওয়া যায় না। একখান গয়না গ'ড়ে রাখলে সে টাকা মজুত থাকে। দরকার হলেই বন্ধক দেওয়া যায়, বিক্রী করা যায়। আবার টাকা হাতে আসিলে ছাড়াইয়া লওয়া যায়।" শশিভূষণের ঘরে স্বয়ং লক্ষ্মী অবতীর্ণা।

আজি শশিভূষণের চারি হাজার টাকার প্রয়োজন হইয়াছে। শশিভূষণ নিঃশঙ্কচিত্তে বাটী আসিলেন। প্রমদাকে বলিলেই টাকা পাইবেন। এমন কি, চাহিতেও হইবেক না। তাঁহার মুখে সমুদায় অবস্থা অবগত হইয়াই প্রমদা টাকা দিবেন। কিন্তু প্রমদা যখন কথা না কহিয়া উঠিয়া গেলেন, তখন শশিভূষণের কিঞ্চিৎ চিত্তচাঞ্চল্য হইল। চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ কি ? প্রমদা কি টাকা দেবেন না ? শশিভূষণের মনে যখন এই প্রশ্ন উদিত হইল, তখন মাথা নাড়িয়া ভাবিলেন, "তাও কি কখন হইতে পারে ?"

প্রমদা নীচে গিয়া মাতাকে ডাকিলেন। মাতা অবিলম্বে প্রমদার নিকট আসিলেন। প্রমদা জিজ্ঞাসিলেন, "মা, ওদিকে কেও আছে কি ?" তাঁহার জননী উত্তর করিলেন, "না।" প্রমদা কহিলেন, "তবে এই তক্তাপোশে ব'সে শোন।"

প্রমদার মাতা অস্ফুট স্বরে "কি কি" বলিয়া প্রমদার পার্শ্বে বসিলেন। তাঁহার শরীর প্রমদার শরীরে স্পর্শ হইল। প্রমদা কহিলেন, "একেবারে গায়ের উপর চেপে পড়লে যে ?"

প্রমদার জননী সকাতরে কহিলেন, "না মা, না মা, আমি দেখতে পাই নাই।"

প্রমদা। তোমার চোখ নাই বুঝি ? এর মধ্যে কাণা হ'লে ? কান থাকে শোন ; না থাকে ত বলো, আমি চুপ করি।

জননী। বলো মা বলো, আমি শুনছি।

প্রমদা জননীকে ক্ষমা দানে বাধিত হইয়া কহিলেন, "শুনেছ কি হয়েছে ?"

জননী। না।

প্রমদা। তুমি কি সমস্ত দিন কানে ছিপি দিয়ে ব'সে থাক ?

জননী কাতর স্বরে কহিলেন, "আমাকে তোমরা না বল্লে আমি কার কাছে শুনবো ? তুমি ত আমাকে কোন কথাই কও নাই।"

প্রমদা উত্তর করিলেন, "তবে আর ভূমিকায় কাজ নাই, এখন শোন। সে দিন

সাহেব এসেছিল ; সে হুকুম দিয়ে গিয়েছিল, 'যদি ওরা (অর্থাৎ তাঁর স্বামী) কাগজ না বুঝে দিতে পারে, তবে কর্ম্ম থাক্‌বে না'।"

জননী আশ্চর্য্য হইয়াছেন ভান করিয়া একটু উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "কি সর্ব্বনাশ ! এখন কি হবে ?"

প্রমদা। তুমি যদি অমন ক'রে চ্যাঁচাও, তা হ'লে এখান থেকে উঠে যাও।

জননী। না মা, আর চ্যাঁচাব না।

প্রমদা আবার ক্ষমা করিয়া কহিলেন, "কাগজ ত বুঝবার জো নাই। বাবুকে মাতাল পেয়ে যে যা পেয়েছে, তাই চুরি করেছে, আমাদের এরা চুরি করেন নি, কিন্তু পরে যা নিয়েছে, তার ত ভাগ পেয়েছেন ; এখন হয় জেলে যেতে হবে, নয় পুলিপোলাও যেতে হবে।" পিলোপিনাংকে লোকে প্রায়ই পুলি ও পোলাওকে দ্বন্দ্ব সমাস করিলে যে রূপ হয়, তাহাই প্রয়োগ করিয়া থাকে।

জননী আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসিলেন, "এর আর কি উপায় নাই ?"

প্রমদা উত্তর করিলেন, "আছে এক উপায়, কিন্তু সেও না থাকার মধ্যে। এখন যদি চার হাজার টাকা অন্য অন্য আমলাদের ঘুষ দেওয়া যায়, তবে রক্ষা হয়। এঁরা বলছেন রক্ষা হয়, কিন্তু আমার মনে ত ভরসা হয় না।"

জননী দরিদ্রের কন্যা, দরিদ্রের বধূ, ৫০টি টাকা একত্র কখনও দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ। চারি হাজার টাকার নাম শুনিয়া তিনি ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। চারি হাজার কি ঢেঁকি, না কুলো, তা জানেন না। কিন্তু কথা কহিলে পাছে প্রমদা রাগ করেন, এ জন্য চুপ করিয়া রহিলেন।

প্রমদা জিজ্ঞাসিলেন, "কথা কও না যে ?"

জননী একটু ভাবিয়া বলিলেন, "কত টাকা বল্লে ?"

প্রমদা। চার হাজার।

জননী একটু ভাবিয়া—"সে ক' কুড়ি ?"

প্রমদা সক্রোধে কহিলেন, "মরণ আর কি ? তুমি কচি মেয়ে না কি ?"

জননী নীরব।

প্রমদা পুনরায় কহিলেন, "চার হাজার টাকা দিতে হ'লে আর প্রায় কিছু বাকি থাকে না। কোম্পানির কাগজগুলি আর গহনাগুলি সব যায়, এখন উপায় কি ?"

জননী বিষম বিপদে পড়িলেন, লোকে বলে, বোবার শত্রু নাই, কিন্তু কার্য্যতঃ সে কথা প্রলাপবাক্য মাত্র। তিনি কথা কহিলেও প্রমদা তিরস্কার করেন, না কহিলেও তিরস্কার করেন। আকাশ পাতাল ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না—কি বলিবেন। এমন সময় প্রমদা কহিলেন, "আমার বিবেচনায় এ টাকা দিলেও নিস্তার নাই। লাভের মধ্যে টাকাও যাবে, প্রাণেও যাবে। তাই আমি বলি, কোম্পানীর কাগজ, নগদ ও গয়না যা কিছু আছে, এক দিন নিয়ে চলে যাই। এখানে থাকলে চক্ষুলজ্জার খাতিরে দিতে হবে, তফাতে থাকলে আর চক্ষুলজ্জা

থাকবে না। আজ যদি টাকাগুলি দি, আর কাল উনি পুলিপোলাও যান, তবে আমরা ভিক্ষে ক'রে বেড়াই আর কি ? তা হবে না। মা কি বলো তুমি ?"

মাতার এক্ষণে দিঙ্‌নির্ণয় হইল ; এখন যতই চাবুক মার, ততই দৌড়াইবেন। কহিলেন, "তার কি ভুল আছে ? আপনার পাঁজি পুঁথি পরেরে দিয়ে দৈবজ্ঞি বেড়ায় হাবাতে হয়ে। সে কাজে যেন আমার বংশের কেউ না যায়।"

পরামর্শ স্থির করিয়া প্রমদা শশিভূষণের নিকট আসিলেন। শশী জিজ্ঞাসিলেন, "কোথায় গিয়েছিলে ?"

প্রমদা। ঐ একবার মার কাছে গিয়েছিলাম। তাঁর ব্যাম হয়েছে, তাই দেখে এলাম।

শশী। এই টাকাগুলি দিতে হবে, তার কি ?—শশী অত্যন্ত কাতর স্বরে কথাটি কহিলেন।

প্রমদা উত্তর করিলেন, "যখন দিতে হয়, তখন দেওয়া যাবে।" শশিভূষণের আর অধিক কথা কহিতে সাহস হইল না।

পরদিন প্রাতে রামসুন্দর বাবু দুই জন পেয়াদা সমভিব্যাহারে শশী বাবুর বাটী আসিয়া শশী বাবুকে ডাকিলেন। শশী নীচে আসিয়া রামসুন্দর বাবুকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। রামসুন্দর কহিলেন, "যদি কারুকে কিছু দেবার ইচ্ছা থাকে, এই বেলা আমার কাছে দাও। নচেৎ আর সময় পাবে না। হিসাব বুঝে নিতে সরকার থেকে একজন ম্যানেজার এসেছে। ঐ পেয়াদা তোমার তলবে এসেছে। এখন না দিলে কাছারিতে সকলই প্রকাশ হবে।"

শশিভূষণ এই কথা শুনিয়া উপরে স্ত্রীর নিকট আসিয়া প্রমদাকে কহিলেন, "তবে দাও, সেই ক'খানা কাগজ দাও। আর যাতে হাজার টাকা হয়, এমন খানকতক গয়না দাও।"

প্রমদা কহিলেন, "এখনই না দিলে নয় ?"

শশী। না।

প্রমদা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, "দিলে কিছু লাভ হবে ?"

শশী। আমি তা হ'লে বেঁচে যাব, নচেৎ আমাকে পুলিপোলাও যেতে হবে।

প্রমদা আবার খানিক নীরবে থাকিয়া কহিলেন, "টাকা দিলে কেমন ক'রে বেঁচে যাবে, আমি বুঝতে পারি না। আমার মনে নিচ্চে, টাকা দিলে টাকাও যাবে, তুমিও যাবে।"

শশিভুষণের তখন হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। অতি কাতর স্বরে কহিলেন "আমিই যদি যাই, তবে আর আমার টাকা থেকে কি হবে ?"

প্রমদা মুখখানি আঁধার করিয়া কহিলেন, "তা হ'লে আমাদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে খেতে হবে ; সে কি তোমার পক্ষে ভাল হবে ?"

শশিভুষণের বুক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। পূর্বাপেক্ষা বিনীত ভাবে প্রমদার কাছে বসিয়া কহিলেন, "তোমরা ভিক্ষা করবে কেন ? আমার

জমিজমা আছে, বাটী থাক্‌লো, তোমাদের স্বচ্ছন্দে চলবে। আর এই টাকা দিলে আমিও নিষ্কৃতি পাব।"

প্রমদা অবনত-বদন হইয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে শশিভূষণ কহিলেন, "শীঘ্র দাও—লোক এসে ব'সে আছে। দেরি হ'লে পর দেওয়া না-দেওয়া সমান হবে।"

প্রমদা তথাপি কথা কহিলেন না। তখন শশিভূষণ একটু রাগত হইয়া কহিলেন, "দেবে কি না বলো?"

শশিভূষণকে রাগত দেখিয়া প্রমদার কথা কহিবার অবকাশ হইল। কহিলেন, "অমন জোর কর যদি, তবে দেবো না।"

শশিভূষণ পুনরায় কাতর স্বরে কহিলেন, "আমার অপরাধ হয়েছে, এখন দাও।"

প্রমদা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "তোমাদের মতন কঠিন লোক আর নাই। কতক দিন তোমার ভায়া জ্বালাতন করলেন, এখন তিনি গেলেন, তুমি লাগলে, আমার কপালে আর সুখ হ'ল না। বাবা কেনই বা আমাকে এমন জায়গায় বিয়ে দিলেন?" প্রমদা আর কথা কহিতে পারিলেন না। অনতি-উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

শশিভূষণের শিরে বজ্রাঘাত হইল। চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। একটু পরে প্রমদা চক্ষু মুছিয়া কহিলেন, "তুমি ত চল্‌লে, রাঁড়ের কি ক'রে গেলে?"

শশিভূষণ কহিলেন, "আমাকে তুমিই ভাসালে। তুমি টাকা দিলে আর আমার বিপদ্‌ থাকে না।" প্রমদা ফোঁস ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ছাড়িতে লাগিলেন।

নীচে থেকে রামসুন্দর বাবু ডাকিতেছেন, "শশী বাবু আসুন, বেলা হ'ল।"

শশী উচ্চৈঃস্বরে "এই যাই" বলিয়া প্রমদার পদযুগল ধরিয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "প্রমদা, আমাকে রক্ষা কর। তুমি না রক্ষা করলে আমি আর রক্ষা পাই নে। প্রমদা, তোমার পায়ে পড়ি, রক্ষা কর।"

প্রমদাকে যেন কে কতই প্রহার করিতেছে, এইরূপ করিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন,—"বাবা আমার স্বপ্নেও জানতেন না, আমার এমন দুরাদেষ্ট হবে। আমার জীবনটা দুঃখে দুঃখেই গেল। আমাকে কেন এখানে বিয়ে দিলেন?"

প্রমদার কান্না শুনিয়া প্রমদার জননী দৌড়িয়া আসিলেন এবং প্রমদার শেষ কথাটা শুনিতে পাইয়া তাহারই উপর দ্বিতীয় মল্লিনাথের ন্যায় টীকা করিতে আরম্ভ করিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "আমি তখনই তোমার বাপকে বলেছিলাম, এ কাজে সুখ হবে না। তোমার বাপ আমার কথা না শুনে বাছা তোমাকে এখানে বিয়ে দিলেন। আমাকে গালি দিও না বাছা। ও রে গদাধরচন্দ্র, তুই এখন কোথায়?" প্রমদা ও প্রমদার মা, ঝড় আর আগুন একত্র হইয়া শশিভূষণের সর্বনাশ করিতে বসিলেন।

রামসুন্দর বাবু বৈঠকখানা হইতে কহিলেন, "শশী বাবু সত্বর আসুন, নইলে

পেয়াদারা বাটীর মধ্যে চল্লো।"

রামসুন্দরের কথা শুনিয়া শশী উম্মত্তের মতন হইয়া কহিলেন, "প্রমদা, এত দিন তোমার সব সৎপরামর্শের অর্থ বুঝতে পারলাম। তুমি আমাকে বোকা বলতে, আমি যথার্থই বোকা, তাহা না হ'লে তোমার মতন পাপীয়সীর কথায় আমার প্রাণের ভাই বিধুকে বাড়ী হ'তে তাড়িয়ে দেবো কেন? আমার ঘরের লক্ষ্মী সরলাকেই বা মেরে ফেলবো কেন? সরলা আমার ঘরে আসা পর্য্যন্ত আমার দুঃখ হয় নাই, ক্লেশ হয় নাই, আমার সংসার রাজার সংসার ছিল। তোর পরামর্শে আমি এমন সরলাকে পৃথক্ ক'রে দিলাম। সে যখন অন্নাভাবে মরে, তখন তোরই পরামর্শে আমি অন্ন দিলাম না। সরলা যখন অনাহারে প্রাণত্যাগ করলে, তখনই আমি জানতে পারলাম, আমার আর ভদ্রত্ব নাই। তুই সরলাকে মেরেছিস, তুই আমার সোনার ভাইকে পথের ভিখারী করেছিস। অবশেষে আমি ছিলাম, তুই আমাকেও খুন করলি। আমার যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল। তারই বা দোষ কি? আমার সোনার প্রতিমা সরলাকে বিসর্জ্জন দেবার ফল এত দিনে ফল্‌লো।"

এই কথা বলিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় ভীষণ নেত্রে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শশিভূষণ গৃহের অভ্যন্তর হইতে চলিয়া গেলেন এবং অবিলম্বে বহির্দ্বারে গিয়া রামসুন্দর বাবুর সহিত একত্র হইলেন। কাছারিতে সকলে শশিভূষণের মুখ পানে নিরীক্ষণ করিয়া ভীত হইল। কেহ কোন কথা না বলিতে তিনি নিজেই সমুদায় আত্মদোষের পরিচয় দিয়া কহিলেন, "আমি এই অপরাধ করিছি, আমার উচিত দণ্ড বিধান করুন।" সকলে দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিল।

ম্যানেজার একজন ডেপুটী কলেক্টর, শশিভূষণের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার অত্যন্ত দুঃখ হইল। কিন্তু ন্যায়মত কার্য্য না করিলেও নয়, সুতরাং শশিভূষণ যাহা যাহা বলিলেন, তিনি সকলই লিখিয়া লইলেন. শশিভূষণের কথায় অল্প অধিক পরিমাণে সকলে দোষী হইলেন। মুহুরি, খাতাঞ্জি, হিসাবনবিস ও রামসুন্দর বাবু, এঁরা সকলেই শশিভূষণের সহিত হাজতে চলিলেন।

সকলকে গারদে দিয়া ডেপুটী কলেক্টর মনে করিলেন, শশিভূষণের অপরাধ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর, তাহার বিষয়-আশয় বিক্রী করিয়া জমিদারের ক্ষতি পূরণ হওয়া উচিত, কিন্তু পাছে অস্থাবর বস্তু সমুদায় স্থানান্তর হয়, এই ভয়ে শশীর বাটীতে পুলিস পাহারা রাখিয়া দিলেন।

সন্ধ্যা বেলা। আকাশমণ্ডল মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া বেগে বায়ু বহিতেছে। দেখিতে দেখিতে অল্প একটু বৃষ্টি হইয়া গেল। বৃষ্টি হইয়া কিঞ্চিৎ শীত বাড়িল। দারোগা দীনবন্ধু বাবু ও কনষ্টেবল রমেশ, শশিভূষণের বাটী পাহারা দিতেছেন। দারোগা আজি নিজে আসিয়াছেন, অপরকে পাহারা রাখিয়া তাঁহার প্রত্যয় হইল না। শীতে পাহারা দেওয়া বড় আমোদজনক কাজ নহে। বিশেষ অনভ্যাসপ্রযুক্ত অল্প ক্ষণের মধ্যেই দীনবন্ধু বাবু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "রমেশ, তুমি ত জান

ভাই, আমি কোন সরকারী লোক দিয়া নিজের কাজ করিয়ে লই না। কিন্তু তোমাকে যে দুই একটা কথা বলি, সে কেবল তোমাকে স্নেহ করি ব'লে। তুমি ভাই, আজ রামধনার দোকান থেকে আদ পোয়া এনে দিতে পার? বড় শীত-শীত করছে।" "রামধনের" নাম উল্লেখ করিয়া পরে ওজন বলিয়া দিলে আর জিনিসের নাম বলিতে হয় না।

রমেশ কহিল, "আজ্ঞা, আপনার একটা কাজ করবো, তার জন্যে এত কথা বলছেন কেন? আপনার অনুগ্রহ থাকলেই হ'ল!"

ক্ষণকাল বিলম্বে আদ পোয়া আসিল। দারোগা বাবু বোতলের গলায় তর্জ্জনী প্রবেশপূর্ব্বক বোতলটি উপুড় করিলেন, পরে সেটিকে আবার স্বাভাবিক ভাবে রাখিয়া নিজের অংগুলিটি দীপ-শিখায় ধরিলেন। ভাল জ্বলিল না। ঈষৎ মুখ বক্র করিয়া দারোগা বাবু কহিলেন, "রমেশ, তোমাকে নূতন লোক পেয়ে ব্যাটা ঠকিয়ে দিয়েছে।" কিন্তু দারোগা বাবু সে জন্য আদ পোয়া ফেরত দিলেন না। অল্প অল্প করিয়া সেটুকু সেবন করিলেন।

দারোগা বাবু একটু পান করিতেছেন, এমন সময় রমেশকে কে ডাকিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে রমেশ শুনিয়া আসিলেন।

দারোগা বাবুর আদ পোয়ায় কিছু হইল না. এ জন্য রমেশকে পুনরায় কহিলেন, "তুমি ত জান ভাই, আমি সরকারী লোক দিয়ে নিজের কাজ ইত্যাদি।" অর্থাৎ আর আদ পোয়া আন।

রমেশের এবার মদ আনিতে দেরি হইল।

দারোগা বাবু আবার সেটুকু সেবন করিলেন, এবার আর অংগুলি দ্বারা পরীক্ষা করেন নাই, কেমন জিনিস, সেবন করিয়া এক মিনিটের মধ্যেই দারোগা বাবুর মনে হইতে লাগিল, যেন তিনি দুগ্ধফেনসন্নিভ শয্যায় বসিয়া আছেন। যাই এই কথা মনে হইল, অমনি দারোগা বাবু তথায় শয়ন করিলেন। যাই শয়ন করিলেন, অমনি নাসিকাধ্বনি হইল, যাই নাসিকাধ্বনি হইল, অমনি রমেশ বাবু কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য দ্বারে শব্দ করিলেন। যাই শব্দ করিলেন, অমনি দ্বার খুলিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গ্রন্থকর্ত্তারা সর্ব্বস্থানেই যাইতে পারেন। যাই রমেশ বাবু বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, অমনি সংগে সংগে গ্রন্থকর্ত্তাও প্রবেশ করিলেন। করিয়া কি দেখিতে পাইলেন? প্রমদা ও তাঁহার জননী সমুদায় গয়নাপত্র, টাকা-কড়ি, কাপড়-চোপড় একত্র করিয়া মোট বাঁধিয়া প্রস্তুত! রমেশ বাবুকে প্রমদার মাতা ফিস্ ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কোন্ দরজা দিয়ে যাব? খিড়কি, না সদর?"

রমেশ। সদর।

তখন প্রমদার জননী প্রমদাকে কহিলেন, "তবে আর বিলম্ব ক'রো না মা।"

প্রমদা রমেশ বাবুর হাতে টাকা গণিয়া দিলেন। রমেশ বাবু গণিয়া লইলেন।

অনন্তর প্রমদার মাতা কাপড়ের মোট লইলেন, এবং প্রমদা একটি বড় হাত-বাক্স লইয়া বাটীর বাহির হইলেন ; রমেশ বাবু তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া তাঁহাদিগকে বাটীর বাহিরে রাখিয়া গেলেন।

বিপিন, কামিনী, দাস দাসী, সকলেই বাটীতে রহিল।

প্রমদা নিজে পিত্রালয়ে গিয়া জিনিসপত্র রাখিয়া আসিবেন মানসে, দিন থাকিতেই নৌকা ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঘাটে গিয়া দেখিলেন, নৌকা প্রতীক্ষা করিতেছে ; নিঃশব্দে দু-জনে নৌকায় উঠিলেন। নাবিকেরা নৌকা ছাড়িয়া দিল। কিয়দ্দূর গমন করিয়া সন্ধ্যাবধি যে ঝড় হইতেছিল, তাহার বেগ পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ প্রবল হইল। গগনমণ্ডল দেখিতে দেখিতে ঘোরতর ঘনঘটায় আবৃত হইল, দশ দিক্ অন্ধকার হইয়া গেল। তড় তড় শিলাবর্ষণ হইতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের আলো চক্ষুকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সমুদায় উৎপাটিত হইতে লাগিল। ভীষণ বজ্রনিনাদ হইতে লাগিল। শীতে শরীর জড়সড় হইয়া আসিল। পবনের গর্জ্জনে কর্ণে তালা লাগিল। বৃক্ষ হইতে রাশি রাশি বিহঙ্গম মরিয়া নদীতে পড়িল। বাটী ঘর সমুদায় দেখিতে দেখিতে সমভূম হইয়া গেল। প্রমদার নৌকা জলমগ্ন হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে হাহাকার উঠিয়া গেল। কেহই কাহাকে দেখিতে পায় না, কাহারও কথা কাহারও কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। নাবিকেরা সাঁতার দিয়া কূলে উঠিল। প্রমদার মাতা কাপড়ের মোটে ভর দিয়া ভাসিতে ভাসিতে তীরে উত্তীর্ণ হইলেন।

প্রমদার বাক্স অত্যন্ত ভারী ছিল। বাক্স ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন না। জলে হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া আসিল ; এবং তাঁহার হস্ত হইতে বাক্স খসিয়া জলমগ্ন হইল। পরক্ষণেই একটি প্রবল তরঙ্গ কর্ত্তৃক তিনি কূলে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

"অসৎ কার্য্যের বিপরীত ফল"

শশাঙ্ক চণ্ডীমণ্ডপে আগুন লাগিয়াছে দেখিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় ক্ষণকাল এক স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে অগ্নি ও আলোকের বৃদ্ধি দেখিয়া দৌড়িয়া সে দিকে গেল। স্বর্ণলতার গৃহে প্রবেশ করিবার সময় দ্বার খুলিয়া চাবি সহ তালাটি চৌকাটের মাথায় আংটায় রাখিয়াছিল ; যাইবার সময় লইয়া যাইতে বিস্মৃত হইল। স্বর্ণলতাও জানালা দিয়া দেখিলেন, শশাঙ্কের চণ্ডীমণ্ডপ পুড়িতেছে এবং তাহার পরক্ষণেই তাহার নিকটবর্ত্তী আর একখানি ঘর জ্বলিয়া উঠিল। দেখিয়া শুনিয়া স্বর্ণের অন্তর কাঁপিতে লাগিল। হু হু করিয়া ঘর জ্বলিতেছে, লোক-জন কোলাহল করিয়া পলাইতেছে ; কেহ কাহারও অন্বেষণ করিবার অবকাশ নাই ! নিজ নিজ প্রাণ লইয়াই সকলে শশব্যস্ত। স্বর্ণ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া

পরে কি করিবেন, ভাবিয়া পাইতেছেন না। একবার সদরের দিকে গমন করিলেন, কিন্তু সম্মুখে লোকের সমারোহ দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক খিড়কির দিকে গমন করিলেন। খিড়কির দিকে ভাল আলো আসিতেছে না। স্বর্ণ ত্রস্ত হইয়া চলিয়া যাইতে দুই তিন বার পড়িয়া গেলেন। কিন্তু জীবনের ভয়ে পলায়ন করিতেছেন, একটু আঘাতে তাঁহার কি হইবে? খিড়কির দরজার কাছে গিয়া দেখিলেন, দরজা খোলা। হরষিতচিত্তে শশাংক-কারাগার হইতে বহির্গত হইলেন। রাস্তার বায়ু সেবন করিয়া তাঁহার দেহে যেন জীবন সঞ্চার হইল। সেখানেও অত্যন্ত লোকসমারোহ দেখিয়া সম্মুখে দৌড়িয়া গেলেন। স্বর্ণলতা কোন্ দিকে যাইতেছেন, তাহা টের পাইতেছেন না, অথচ চলিতেও ক্ষান্ত হইতেছেন না। বিবেচনা করিলেন, শশাংকের বাটী হইতে যে-কোন স্থানে যাইবেন, সেইখানেই আশ্রয় পাইবেন। এমন সময় এক দ্বিশাখা রাস্তায় আসিলেন। কোন্‌টিতে যাইবেন, স্থির করিবার জন্য ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বাম দিকে চলিলেন। অনুমান, অর্দ্ধ রসি গমন করিয়াছেন, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার অঞ্চলাকর্ষণ করিয়া কহিল, "কোথায় যাও?" স্বর্ণলতা আতংকে চীৎকার করিয়া পশ্চাদ্ভাগে চাহিয়া দেখিলেন, একটি স্ত্রীলোক। দেখিয়া তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ সাহস হইল। স্ত্রীলোকটিও আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইল। স্বর্ণলতা দেখিলেন, শশাংকের বাটীর দাসী। সে তাহাকে ধরিতে আসিয়াছে ভাবিয়া স্বর্ণলতা পুনর্ব্বার আতংকে চীৎকার করিয়া কহিলেন, "আমাকে ছেড়ে দাও, আমি যাব না। না ছাড় ত আমি চ্যাঁচাব।" দাসী কহিল, "ভয় কি? আমি তোমাকে ধরতে আসি নাই। আমিও তোমার মতন পালাচ্ছি। এই দেখ, বামুনের সর্ব্বনাশ ক'রে এসেছি।" এই বলিয়া একটি বাক্স দেখাইল। স্বর্ণলতা বাক্স দেখিয়া মনে স্থির করিলেন, দাসী যাহা বলিতেছে, যথার্থ। তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন্ দিকে যাবে?"

দাসী কহিল, "রেলের রাস্তায় যাওয়া হবে না, তা হ'লে ধরা পড়'ব। চল, আমরা বাঁ-দিকে যাই। নদী পার হয়ে ওপারে আমার এক মাসীর বাড়ী আছে, আজ সেইখানে গিয়া থাকি। পরে কাল যেখানে হয় যাব।"

দাসীর কথা সংগত মনে করিয়া স্বর্ণলতা দাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। ক্ষণকাল এ-গলি ও-গলি করিয়া উভয়ে গংগাতীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। কিন্তু স্বর্ণলতা যেখানে যান, নৈরাশ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়। গংগার ঘাটে প্রথমতঃ নৌকা পাইলেন না। অনেক ক্ষণ কূলে প্রতীক্ষা করিয়া পরিশেষে পার হইলেন।

গংগা পার হইয়া স্বর্ণলতা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "এত ক্ষণে রক্ষা পেলাম।" দাসী কহিল, "তোমার আর ভয় কি? কিন্তু আমার এখন বিপদ্ আছে।"

স্বর্ণ জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি এ কর্ম্ম করলে কেন? চুরি করলে কেন?"

দাসী কহিল, "চুরি করবো না। খুব করেছি। ওর মতন পাষণ্ড কি আর আছে? রাজ্যের লোকের টাকা চুরি ক'রে ক'রে বড়মানুষ হচ্ছে। আমি ওর কিই বা নিয়েছি।" স্বর্ণলতা জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি এ কেমন ক'রে নিলে?"

দাসী কহিল, "বামুন যে সিন্দুকে টাকা রাখত, তা আমি জানতেম। অনেক বার নিতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কখনও সুবিধা পাই নাই। আজ যখন তোমার ঘরে এলো, তখন বাইরে তালার গায়ে চাবি রেখে গিয়েছিল। আমি ভাবলাম, তখনই নি। কিন্তু নিতে গিয়েও ভরসা হ'ল না। তার পর যখন ঘরে আগুন লাগলো, তখন ও দৌড়ে গেল; চাবি প'ড়ে রইল। আমি ভাবলাম এই সময়; এখন যদি না নি, তবে আর কখন নিতে পারবো না। বামুন যাই চলিয়া গেল, আমিও অমনি চাবি দিয়ে সিন্দুক খুলে এই বাক্সটা নিয়ে বেরুলাম। তুমি আমার আগে আগে বেরিয়েছিলে। তার পর তুমি যখন সদর-দরজার দিকে গেলে, তখন আমি খিড়কির চাবি খুলে বেরুয়ে এলাম। তাইতেই তুমি দুয়ার খোলা পেলে। আমি বেরুয়েই দেখলাম, জনকতক লোক যাচ্ছে, অমনি আবার খিড়কির পিছু এলাম। তোমাকে এত ডাকলাম, তুমি শুনতে পেলে না। তার পর তুমি যখন উত্তরের দিকে যাও, তখন দেখলাম, তোমাকে না ফিরালে হয় না, তাই তোমার আঁচল ধরে টানলাম, তুমি মনে করলে, আমি তোমাকে ধরতে এসেছিলাম।" এই বলিয়া দাসী হাসিয়া উঠিল।

স্বর্ণলতা কহিলেন, "আমার যথার্থই মনে হয়েছিল, তুমি আমাকে ধরতে এসেছিলে।"

দাসী স্বর্ণলতাকে কহিল, "চল, ঐ আমার মাসীর বাড়ী দেখা যাচ্ছে, ঐখানে গিয়ে আজ রাত্রে থাকি।"

স্বর্ণলতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কলিকাতায় যাব কেমন ক'রে? আবার ত কাল পার হ'তে হবে, নইলে গাড়ী পাব না। আমার সঙ্গেই বা কে যাবে?"

দাসী কহিল, "কালকার কথা কাল হবে, আজ ত এখন চল।" এই বলিতে বলিতে উভয়ে দাসীর মাসীর বাটী পৌঁছিলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, যে-গৃহে স্বর্ণলতা ছিলেন, শশাঙ্ক সেই গৃহ হইতেই প্রথমে অগ্নি দেখিতে পায়। শশাঙ্ক তাহার পূর্ব্বক্ষণেই চণ্ডীমণ্ডপের পার্শ্বস্থ ঘরে তক্তাপোশের দেরাজের মধ্যে হরিদাস-দত্ত টাকাগুলিন রাখিয়া আসিয়াছে। শশাঙ্ক অব্যবস্থিতচিত্তে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চণ্ডীমণ্ডপের দিকে দ্রুতগতিতে গমন করিল। ফাল্গুন মাস; সমুদায় জিনিস শুষ্ক হইয়া আছে; অগ্নিস্পর্শ মাত্রেই জ্বলিয়া উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে চণ্ডীমণ্ডপের পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে আগুন লাগিল। লাগিবা মাত্রেই হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। দুই পার্শ্বে দুই ভয়ানক অগ্নিস্তম্ভ হইল। ক্ষণকাল মধ্যেই বায়ু পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হওয়ায় নিকটস্থ অন্যান্য লোকের ঘর জ্বলিয়া উঠিল। সকলে কোলাহল করিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। হরিদাস এক হাতে পুত্রের হস্ত ও অপর হাতে

পুরোহিতের হস্ত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে পুত্রের বিবাহ দিবেন।

শশাংক বহির্বাটী আসিয়া দেখিল, যে-ঘরে টাকা রাখিয়াছে, সে ঘর হু হু করিয়া জ্বলিতেছে। কিন্তু তথাপি সেই ঘরে প্রবেশপূর্ব্বক তক্তাপোশের উপর হইতে বিছানা দূরে নিক্ষেপ করিল। পরে দেরাজ খুলিবার জন্যে আপনার ঘুনসিতে চাবির অনুসন্ধান করিতে লাগিল; কোমরে চাবি পাইল না। কি মনস্তাপ! দৌড়িয়া যে-ঘরে স্বর্ণলতা ছিলেন, পুনরায় সেই ঘরের দ্বারে গেল। গিয়া দেখিল, তালাটি পড়িয়া আছে, কিন্তু চাবি নাই। তদ্দর্শনে কপালে করাঘাত করিয়া শশাংক কাঁদিয়া উঠিল, "হায়! আমার সর্ব্বনাশ হ'ল!" একখানি কুঠারের জন্যে ক্ষিপ্তের ন্যায় চতুর্দিকে ভ্রমন করিতে লাগিল; প্রয়োজনের সময় কোন দ্রব্যই হাতের কাছে পাওয়া যায় না। এদিক্ ওদিক্ অনুসন্ধান করিয়া কুঠার মিলিল। তখন সেই কুঠার-স্কন্ধে চণ্ডীমণ্ডপের দিকে ছুটিল। গিয়া দেখিল, তখনও ঘরে প্রবেশ করা যাইতে পারে। প্রবেশ করিবে, এমন সময় হরিদাস পশ্চাৎ হইতে তাহার বস্ত্রাকর্ষণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, "পাত্রী কোথায়? চলো, অন্য এক বাড়ী গিয়ে বিবাহ দি।" শশাংক বাক্যদ্বারা তাহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান না করিয়া তাহার মস্তকোপরি কুঠার উত্তোলন করিল। হরিদাস 'বাবা রে' বলিয়া দূরে পলাইল। শালকাষ্ঠের তক্তাপোশ সহজে ভাঙিতেছে না। এদিকে শশাংকের মস্তকোপরি অগ্নি প্রবল বায়ুভরে নৃত্য করিয়া জ্বলিতেছে। শশাংক শরীরের সমস্ত পরাক্রমে তক্তাপোশের উপর এক ভীষণ প্রহার করিল। প্রহারে ঘর কাঁপিয়া উঠিল ও তৎক্ষণাৎ চাল হইতে এক জ্বলন্ত আড়কাঠা ভাঙিয়া শশাংকের পৃষ্ঠদেশে পড়িল; শশাংকও অমনি তক্তাপোশের উপর নিপতিত হইল। হস্তস্থিত কুঠারে তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল। ক্ষত স্থান হইতে প্রবল বেগে শোণিত বহিতে লাগিল। এদিকে জ্বলন্ত আড়কাঠার আগুনে শশাংকের বস্ত্র জ্বলিয়া উঠিল! শশাংক ভীষণ রবে আর্ত্তনাদ করিয়া কহিল, "আমার প্রাণ যায়, রক্ষা কর, আমাকে টেনে বার কর।" বাহিরের লোকেরা পরস্পর পরস্পরের মুখ পানে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। শশাংক পুনর্ব্বার আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "আমাকে রক্ষা কর, আমার যথাসর্ব্বস্ব তোমাদিগকে দেব।" ঘর পড়ে পড়ে হইয়াছে। বাহির হইতে কেহই তাহার মধ্যে যাইতে সাহস করিল না। দেখিতে দেখিতে মহাশব্দে অগ্নিস্তম্ভের ন্যায় জ্বলন্ত চাল শশাংকের উপর নিপতিত হইল। শশাংকের জীবনের শেষ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

হরিদাস শেষ পর্য্যন্ত আশা করিয়াছিলেন, অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে তনয়ের বিবাহ দিবেন। এক্ষণে সে ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন। হরিদাসের পুত্র ক্ষুণ্ণমনে সমপাঠী বয়স্যাদিগের সহিত ইংরাজি ভাষায় কথোপকথন করিতে লাগিলেন এবং ক্ষণকাল এ-রাস্তায় ও-রাস্তায় বেড়াইয়া পরিশেষে তিনিও পিতার অনুসরণ করিলেন। তাঁহার উপবাস মাত্র লাভ।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

শেষ হ'য়ে। হবে।

যে রাত্রে প্রমদার নৌকা জলমগ্ন হইল, তাহার পর-দিন প্রাতে তিনি উক্ত সংবাদ থানায় পাঠাইয়া দিলেন। হেড্ কনষ্টেবল সেই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করণার্থে দারোগা বাবুর নিকটে আসিলেন। দারোগা বাবু তখন বেহুঁস। বড় বড় নিশ্বাস বহিতেছে, চক্ষু মুদ্রিত, ডাকিলে কথা নাই, হস্ত পদ অবশ। রমেশ বাবুকে প্রশ্ন করিলে, রমেশ উত্তর দিলেন, তিনি কিছুই জানেন না। তিনি খিড়কির দুয়ারে পাহারায় ছিলেন, সকাল বেলা পাহারা বদ্‌লি হইয়া আসিয়া দেখিলেন, বাবু অজ্ঞান ও শুনিলেন যে, বাড়ীর মধ্য হইতে লোক বাহির হইয়া গিয়াছে। পরে জানিতে পারিলেন, বাহির হইয়া যাইবার সময় তাহাদের নৌকা ডুবিয়াছে। হেড্ কনষ্টেবল ও রমেশ, উভয়ে একত্র হইয়া দারোগা বাবুর পদদ্বয় পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কি জানি, সর্পাঘাতই বা হইয়াছে। কিন্তু তাহার কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। শরীরে কোন আঘাতের দাগও নাই। কপালে একটা পুরাতন দাগ মাত্র আছে। হঠাৎ রমেশ দারোগা বাবুর মুখের কাছে মুখ লইয়া গেলে তাঁহার বোধ হইল, যেন দারোগা বাবুর নিশ্বাসে মদের গন্ধ নির্গত হইতেছে। তিনি হেড্ কনষ্টেবলকে ডাকিয়া কহিলেন, "জমাদার সাহেব, আমার বোধ হচ্ছে যেন বাবুর নিশ্বাসে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে! আপনি একবার দেখুন দেখি?"

হেড্ কনষ্টেবল দারোগা বাবুর মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কহিলেন, "রমেশ, ঠিক ধরেছ।"

রমেশ কহিলেন, "মহাশয়, আমরা পুলিসের লোক কি না। কত ফন্দি ক'রে মকদ্দমা আস্কারা করতে পারি।"

হেড্ কনষ্টেবল কহিল, "তবে এখন উপায়? এস, কেউ না টের পেতে পেতে বাবুর মাথায় জল ঢেলে দেখি, তাতে আরাম হন কি না!"

রমেশ কহিলেন, "মহাশয়, এটা কি ভাল কথা বল্লেন? শেষে যদি ভদ্রাভদ্র হয়, তা হ'লে আমাদের ঘাড়ে ঝুঁকি পড়বে। আমার মতে ডিপুটী কলেক্টর বাবুর নিকট গিয়া এৎলা দেওয়া উচিত।"

হেড কনষ্টেবল কহিল, "তা হ'লে বাবুর চাকরির উপর দোষ পড়বে।"

রমেশ উত্তর করিলেন, "যিনি যে কর্ম্ম করবেন, তিনিই তার ফলভোগ করবেন। আমরা ঘাড়ে ঝুঁকি রাখবো কেন?"

রমেশের মুখ কালির মত। কথা কহিতে ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতেছে, কিন্তু হেড্ কনষ্টেবলের সেরূপ হইতেছে না। উভয়ে ক্ষণকাল পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, ডেপুটী বাবুর কাছে খবর দেওয়াই উচিত। লোকজন আনিয়া দারোগা বাবুকে তুলিয়া লইয়া যাইবার সময় তিনি যেখানে শুইয়া ছিলেন, তাহার নিকট একটা বোতল দেখা গেল। ঘ্রাণ লইয়া রমেশ কহিলেন, "বোধ হয় এই বোতলেই

মদ ছিল। বোতলটা আর কি হবে, ফেলে দি।"

হেড্ কনষ্টেবল কহিল, "এমন কর্ম্মও করতে আছে ? ও বোতলটা চালানের সঙ্গেই পাঠাতে হবে। দেখি, ওর মধ্যে কিছু আছে কি না ?"

হেড্ কনষ্টেবলের কথা শুনিয়া রমেশ কম্পিতহস্তে বোতলটি উপুড় করিলেন। ক্ষুদ্র ধারে একটু কাল জলের মতন জিনিস বোতল হইতে পড়িল। রমেশ কহিলেন, "কিছুই নাই।"

হেড্ কনষ্টেবল কহিলেন, "ঐ যে কি একটু পড়লো, ওটুকু ফেল্লে কেন ? তুমি পুলিসের লোক হয়ে এমন কাচা কাজ করলে ! দাও, বোতল আমার কাছে দাও।"

বোতলটি দেবার সময় রমেশের হাত ঠক ঠক করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। হেড্ কনষ্টেবল বিস্মিত নেত্রে রমেশের মুখ পানে নিরীক্ষণ করিলেন। জিহ্বা দ্বারা ঠোঁট ভিজাইয়া রমেশ কহিলেন, "কাল সমস্ত রাত জেগে যেন গা কাঁপছে। স্নান ক'রে একটু ঘুমাতে পারলে বাঁচি।" তৎকালে হেড কনষ্টেবলের মুখ দেখিলে বোধ হইতে পারিত যে, রমেশের কথায় তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। বরঞ্চ তাঁহার মনে বিলক্ষণ সন্দেহ উদয় হইল।

রমেশ মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

হেড্ কনষ্টেবল দারোগাকে লইয়া ডেপুটী কলেক্টর বাবুর নিকটে শোয়াইয়া বোতলটি তাহার নিকট রাখিলেন। ডেপুটী কলেক্টর উভয়কেই কৃষ্ণনগর চালান করিয়া দিয়া জমাদারকে নৌকা ডোবার তদারকের ভার দিলেন।

জমাদার, রমেশ ও অন্যান্য কনষ্টেবল সকলে একত্র হইয়া যে স্থানে নৌকা ডুবিয়াছিল, তথায় উপস্থিত হইয়া মাঝিদিগকে জলে ডুব দিয়া জিনিসপত্র তুলিতে কহিলেন। তাহারা বস্ত্রাদি ভিন্ন আর কিছুই পাইল না। তখন জমাদার আরও অন্যান্য লোকজন আনাইয়া নৌকা জল হইতে তুলিলেন, কিন্তু তাহার মধ্যে প্রমদার বাক্স পাইলেন না। অনন্তর হেড্ কনষ্টেবল, কি প্রকারে প্রমদা ও প্রমদার মাতা বাটী হইতে বাহির হইলেন, তাহার অনুসন্ধানার্থ শশিভুষণের বাটীতে গমন করিলেন। গমন করিয়া প্রথমতঃ রমেশকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। রমেশ কিছুই জানেন না। তিনি খিড়কিতে পাহারায় ছিলেন। সে দিক্ হইতে কেহই বাহির হয় নাই। পরে হেড কনষ্টেবল গদাধরের জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের কাল রাত্রে কে ছেড়ে দিয়েছিল ?"

গদাধরের জননী উত্তর করিলেন, "যে আমার জামায়ের বাড়ী কাল চৌকি দিচ্ছিল।"

"তার নাম কি ?"

গদাধরের জননী উত্তর করিলেন, "তার নামটি বেশ, ঐ যে আমাদের বাটী আসতো, আমার গদাধরচন্দ্রের সঙ্গে যার বড় প্রণয় ছিল। তার পর যে গদাধর-চন্দ্রের সর্ব্বনাশ ক'রে টাকাও নিলে, মেয়াদও দিলে।"

হেড্ কনষ্টেবল কহিলেন, "আপনি তাকে দেখ্‌লে চিন্‌তে পারবেন ?"

গদাধরের জননী কহিলেন, "তা কেন পারবো না ?"

পুনরায় হেড্ কনষ্টেবল জিজ্ঞাসিলেন, "গদাধরের কাছ থেকে কে সর্ব্বনাশ ক'রে টাকা নিলে ?"

গদাধরের জননী কহিলেন, "গদাধর আর সে, দু-জনে কার চিঠি খুলে টাকা নিত। আমার ছেলের কোন দোষ ছিল না। সেই পাহারাওয়ালাই আমার ছেলেকে শিখায়ে দেয়। তার পর যখন এর অনুসন্ধান হ'ল, তখন এক দিন এসে বল্লে, আমাকে ১০০ টাকা দাও, না দিলে আমি সব ব'লে দেবো। কি করি বাবু, আমি গরিব মানুষ, টাকা কোথায় পাবো। আমার জামাই বড়মানুষ, কিন্তু তা ব'লে ত আমি বড়মানুষের মাগ নই ; আমার যে দু-একখানা গয়না ছিল, আমার মেয়ের কাছে বন্দক রেখে টাকা দিলাম, কিন্তু আবার তার পরদিন সেই পাহারাওয়ালা দারোগাকে ডেকে এনে গদাধরকে ধরিয়ে দিল।" প্রমদার মাতা এত দূর বলিয়াছেন, এমন সময়ে রমেশ, কার্য্যান্তর হইতে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। গদাধরের জননী তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, "পাহারাওয়ালা, তোমাকে বৃথা টাকা দিলাম। দেখ, আমার প্রমদার তাও গেল, বাকি যা ছিল, তাও গেল।" হেড্ কনষ্টেবল পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, "কা'কে টাকা দিয়েছিলেন ?"

গদাধরের জননী রমেশের দিকে অংগুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন।

রমেশ বিস্ময় ভান করিয়া কহিল, "তুমি কি আমাকে টাকা দিয়েছিলে ?"

গদা জননী। তোমাকেই ত।

রমেশ। না, তুমি ভুলেছ।

গদাধরের জননী কহিলেন, "কেন বাপু মিথ্যা কথা কও? আমি কি তোমাকে চিনি নে ? তুমি একবার গদাধরের কাছ থেকে এক-শ টাকা নিলে, কাল আবার আমার মেয়ে তোমাকে ২৫ টাকা দেন। আমি তোমাকে বেশ চিনি। আর চিনবোই বা না কেন ? এক বার দু-বার ত দেখা না। গদাধরের সংগে তোমার কতই ভাব ছিল। তুমি রোজই আমাদের বাড়ী আসতে।"

এই কথা শুনিয়া রমেশ আর কথা কহিতে পারিল না। হেড্ কনষ্টেবলের মনেও আর সন্দেহ রহিল না। অবিলম্বে তিনি রমেশকে বন্ধন করিয়া চালান দিলেন।

রমেশ তথাপি একবার কহিল, "দেখবেন মহাশয়, আমার কিন্তু কোন দোষ নাই। আপনাকে এর ফল ভুগতে হবে। আমাকে চাষা মনে করবেন না। আমি পুলিসের লোক।"

হেড্ কনষ্টেবল কহিলেন, "তুমি পুলিসের লোক, আর আমি কি পুলিসের কেউ নই ?" এই বলিয়া একখানি কাগজে চালান লিখিয়া আর দুই জন কনষ্টেবলের হাতে রমেশকে সমর্পণ করিলেন।

দীনবন্ধু বাবু তিন দিবস নিদ্রার পর গাত্রোত্থান করিলেন। ডাক্তার সাহেব

বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন বলিয়াই দারোগা বাবুর সে নিদ্রা মহানিদ্রা হয় নাই। জাগ্রত হইয়া তিনি মেজেষ্টর সাহেবের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। এদিকে ডাক্তার সাহেব বোতল পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "বোতলে সুরা ও অহিফেন ছিল।"

রামধনের হাজত হইল। কিন্তু রামধন নির্দ্দোষিতার প্রমাণ দিয়া খালাস হইয়া আসিল। সে মদের সহিত কিছুই মিশ্রিত করে নাই। তবে কে করিল ?

এই গোলযোগের সময় শশিভূষণের বাটীর নিকট একটি লোক ডাক্তারি করিত। সে কহিল, "রমেশ বাবু এক দিন রাত্রে পেটের পীড়া হয়েছে ব'লে লডেনম্ (অহিফেনের আরক) লইয়া গিয়াছিলেন। রমেশ বাবু নগদ মূল্য দেন নাই, এ জন্য তাঁহার খাতায় তাঁহার নামে চারি আনার লডেনমের খরচ লেখা রহিয়াছে।" এই কথা প্রকাশ হইবা মাত্র থানায় খবর হইল। তিন দিবস পরে তাঁহার নামে কৃষ্ণনগরে গিয়া সাক্ষ্য দিবার হুকুম আসিল। ডাক্তার কৃষ্ণনগরে গিয়া সাক্ষ্য দিল যে, অমুক দিবস রাত্রে রমেশ পেটের পীড়া হইয়াছে বলিয়া চারি আনার লডেনম্ লইয়াছিল। তারিখ ঐক্য করায় প্রকাশ হইল যে, সেই রাত্রেই দীনবন্ধু বাবু অজ্ঞান হন। রমেশের ভরা সম্পূর্ণ বোঝাই হইল। রমেশের নানাবিধ দোষ বাহির হইতে লাগিল। প্রথমতঃ গদাধরের সহিত নোট চুরি, পরে উৎকোচ গ্রহণ, তদনন্তর উৎকোচ লইয়া প্রমদা ও তাঁহার জননীকে ছাড়িয়া দেওয়া, দীনবন্ধু বাবুকে সুরার সহিত আফিং সেবন করান, হয় ত ইহাতে দীনবন্ধু বাবুর মৃত্যু হইতে পারিত। এই সমস্ত দোষ একত্র হওয়ায় রমেশ পুলিসের লোক হইয়াও আর কথা কহিতে পারিল না। জজ সাহেব জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার কোন ছল আছে ?" রমেশ অধোবদনে নীরব হইয়া রহিল। তদ্দর্শনে জুরিরা তাহাকে সমুদায় অপরাধেই দোষী করিলেন। অনন্তর জজ সাহেব তাঁহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম দিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

এই হলো

দুঃসহ মনঃকষ্টে গোপাল রজনী অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার নিকট সে রাত্রি অবসান হয় না। এক এক দণ্ড যেন এক এক প্রহরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। রজনীকে শান্তিদায়িনী বলিয়া লোকে ব্যাখ্যা করে, কিন্তু তিনি কাহাকে শান্তি প্রদান করেন ? যাহারা মনাগুনে দগ্ধ হইতেছে, তাহাদিগকে না ; যাহারা শয্যা-গত রোগী, তাহাদিগকে না ; যাহারা দীন দুঃখী, তাহাদিগকে না ; এ সমস্ত লোকের চিন্তাক্লেশ যামিনীযোগেই বৃদ্ধি হয়। রজনী সমাগত হইলেই ইহারা আপন আপন মনের হুতাশনে দগ্ধ হইতে থাকে। যাহারা দুগ্ধফেনসন্নিভ পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া থাকে, অনবরত দাস দাসী যাহাদিগকে ব্যজন করে, রতি

হইতে রূপবতী কামিনী যাহাদিগের তুষ্টি বর্দ্ধন করে, রজনী তাহাদিগকে শান্তি দান করেন। করিবেন না কেন? সকলেই যাহাদিগের পদলেহন করে, যামিনী কোন্ মুখে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন?

রজনী প্রভাত হইলে পূর্ব্বদিক্ হইতে দিবাকর দর্শন দিলেন। সাহেব বাহাদুর জানালা খুলিয়া দ্বিতীয় দিবাকরের ন্যায় বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলেন। রেলওয়ের বাবুরা পিরান ও লালবঁধকরা জুতা পায়ে যে যাহার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তারের খবর চলিতে লাগিল, ঘোর রোলে ঘণ্টা বাজিয়া টিকিট-গ্রাহীদিগকে আহ্বান করিল। হুস্ হুস্ শব্দ করিয়া ট্রেন আসিল। আবার ঘণ্টা বাজিল, পতাকা উড়িল, ষ্টেশন-মাষ্টার "অল্ রাইট্" বলিল। সদম্ভে ধরণী কাঁপাইয়া লৌহ-অশ্ব পুনরায় ধাবমান হইল।

দু-বার তিন বার গাড়ী এল গেল। গোপালের চিন্তায় শরীর শুকাইয়া যাইতেছে। এক রাত্রের মধ্যেই তাঁহার এরূপ চেহারা হইয়াছে, যেন তিনি কত দিন উপবাস করিয়া আছেন। ক্রমে ক্রমে দশটা বাজিল। তখন সাহেব বাহাদুর গোপালের নিকট হইতে মূল্য লইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলেন।

গোপাল একটার সময় শ্রীরামপুর আসিবার জন্য পুনরায় বাষ্পীয় শকটারোহণ করিলেন।

গাড়ীতে আসিতে আসিতে গোপালের মনে কত ভাবনা উপস্থিত হইতে লাগিল। কখন ভাবিতে লাগিলেন, "স্বর্ণলতা চিরদুঃখ-হ্রদে নিমজ্জিত হইয়াছেন। কখন ভাবিতে লাগিলেন, স্বর্ণ তেমন নয়! হয় ত আত্মহত্যা করিয়াছেন। ভাবিতে কি ভয়ানক? যদি আত্মহত্যা করিয়া থাকে, তবে আমার দোষেই করিয়াছে। কেনই বা আমি ঘুমাইয়াছিলাম? স্বর্ণলতার যদি বিবাহ হইয়া থাকে, কিম্বা স্বর্ণ যদি আত্মহত্যা করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার আর এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছেন। লৌহ-অশ্ব যথাকালে শ্রীরাম-পুর পেঁৗছিল। ব্যগ্র হইয়া গোপাল গাড়ী হইতে নামিয়া টিকিট দিয়া ষ্টেশনের বাহিরে গেলেন। শশাঙ্কের বাটী জিজ্ঞাসা করিয়া অনেক ক্ষণের পর সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বাড়ী ঘর কিছুই নাই, কেবল কয়েকটি ভস্মরাশি রহিয়াছে, আর পুলিসের লোক তাহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। দেখিয়া গোপালের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, পদদ্বয় বলহীন হইয়া পড়িল, এবং মস্তক ঘুরিতে লাগিল। গোপাল ভাবিলেন, স্বর্ণলতা যথার্থই আত্মহত্যা করিয়াছেন। এই চিন্তা মনে হওয়াতে গোপাল আর চলিতে পারিলেন না। রাস্তায় শিরে কর সংলগ্ন করিয়া উপবেশন করিলেন। একটি কনষ্টেবল তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। গোপালের এমন সাহস হইল না যে, কনষ্টেবলকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করেন।

ক্ষণকাল তথায় বসিয়া, গোপাল সাহসে ভর করিয়া ভস্মরাশির নিকট গমন করিয়া বিনীতভাবে দারোগাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়, এখানে কি হয়েছে?"

আপনারা কিসের তদারক করছেন ?"

দারোগা গোপালের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, গোপাল কোন দুঃসহ মনঃপীড়া পাইয়াছেন। তখন উত্তর করিলেন, "ঘরে আগুন লেগে এ বাটীর কর্ত্তা শশাঙ্কশেখর স্মৃতিগিরির মৃত্যু হয়েছে। আমরা তাহারই অনুসন্ধান করছি। শশাঙ্কশেখর কি আপনার কেউ ছিলেন ?"

গোপাল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তর করিলেন, "না মহাশয়, শশাঙ্কশেখর আমার কেউ ছিলেন না। কিন্তু এখানে আর কোন ঘটনা হয় নি ? কেউ কি আত্মহত্যা করেছে ?"

দারোগা বাবু হাসিয়া কহিলেন, "না না। কেন, সে কথা তোমার মনে হ'ল কেন ?"

গোপাল কহিলেন, "আমার ভগ্নী এইখানে ছিলেন। শশাঙ্ক জোর ক'রে তার বিবাহ দেবার উদ্যোগ করেছিলেন। আমি সন্ধ্যাবেলা ভগ্নীকে নিয়ে যেতে আসছিলাম। কিন্তু গাড়ীতে অজ্ঞান হয়ে পড়ায় আমার চৈতন্য রহিত হয়। বর্দ্ধমানে গিয়ে আমার চেতনা হ'ল। আমার ভগ্নী লিখেছিলেন, যদি কেউ তাঁকে না নিতে আসে, তা হ'লে তিনি আত্মহত্যা করবেন।" এই কথা বলিতে বলিতে গোপালের চক্ষু হইতে সহস্রধারে বারি বর্ষণ হইতে লাগিল।

দারোগা বাবু তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "ভয় নাই, আপনার ভগ্নী নিরাপদে আছেন। এখানে কেবল এক মাত্র শশাঙ্কেরই কাল হয়েছে। সাক্ষী পাওয়া গিয়েছে, আপনার ভগ্নী আগুন লাগতে লাগতেই পালিয়েছিলেন।"

গোপাল দারোগা বাবুর কথা শুনিয়া আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল ও চক্ষু রক্তবিহীন হইল এবং হস্ত পদ কম্পিত হইতে লাগিল। দারোগা বাবু তাঁহাকে সাদরে বিছানায় বসাইয়া, তাঁহার মুখে ও মস্তকে জল দিতে লাগিলেন। একটু পরেই গোপাল সুস্থ হইলে দারোগা বাবু জিজ্ঞাসিলেন, "আপনার কি কোন পীড়া আছে ?"

গোপাল কহিলেন, "না।"

দারোগা বাবু জিজ্ঞাসিলেন, "আপনার আহার হয়েছে ?"

গোপাল উত্তর করিলেন, "কাল রাত অবধি কিছু আহার করি নাই।"

দারোগা বাবু অবিলম্বে গোপালের জন্য খাবার আনাইলেন। গোপাল কোন মতেই আহার করিবেন না। কহিলেন, "আমার ভগিনীর অনুসন্ধান না ক'রে জলগ্রহণ করবো না।"

দারোগা বাবু কহিলেন, "আপনার গায়ে শক্তি না থাক্‌লে কি প্রকারে অনুসন্ধান করবেন ? আপনি আগে আহার করুন, পরে আমার একজন লোক আপনার সঙ্গে পাঠায়ে দেবো।"

দারোগা বাবুর কথায় গোপাল কিঞ্চিৎ আহার করিলেন। আহার করিয়া দারোগা বাবুকে কহিলেন, "আপনি তবে অনুগ্রহ ক'রে একজন লোক আমার

সহিত দিন।"

দারোগা বাবু একজন কনষ্টেবল দিলেন। গোপাল কনষ্টেবলের সহিত প্রতি গৃহে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, কোনখানেই স্বর্ণের দেখা পাইলেন না। কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, "স্বর্ণলতা হয় আত্মহত্যা করিয়াছে, নচেৎ পুড়িয়া মরিয়াছে।" গোপাল আর ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। একটু পরে কনষ্টেবলকে বিদায় দিয়া গোপাল গঙ্গাতীরে গিয়া ভূমিতে শয়ন করিয়া রহিলেন।

গোপাল যেখানে শয়ন করিয়াছিলেন, তাহার অনতিদূরে জন-কতক নৌকার মাঝি তর্ক-বিতর্ক করিতেছে। একজন কহিল, "তুই ত এর কিছু চিনিস্ নে? এর দাম কত জানিস্?" আর এক জন কহিল, "এর আবার দাম কি? তুই আমার সঙ্গে যাস্, তোর যত খুশী, আমি তোকে এমনি পাথর দেবো।"

তৃতীয় এক ব্যক্তি কহিল, "ওর দাম থাকুক আর না-থাকুক, সোনার দাম ত আছে?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি পুনর্ব্বার কহিল, "এ ত সোনার না। বড়মানুষে কি আজকাল সোনা পরে?"

প্রথম ব্যক্তি কহিল, "বড়মানুষে পিতলের গয়না পরে, আর তোর ঘরে সব সোনার গয়না, না?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, "আমার বাড়ী সোনার গয়নাই ত? তার আর মিথ্যা কথা কি? বড়মানুষে পেতল প'রলে লোকে বলে সোনা, কিন্তু আমরা যদি মোহর গলায় গেঁথে দি, তবু লোকে বলে পেতলের মোহর।"

যাহার সেই সোনা ও পাথরটি, সে কহিল, "আচ্ছা, তোমাদের গোলযোগে কাজ নাই। আমার জিনিস, আমাকে দাও। সোনা হয় আমার থাক্‌বে, পেতল হয়, তাও আমার থাক্‌বে।"

প্রথম ব্যক্তি কহিল, "আমি বল্লাম ঠিক। এর দাম ঢের টাকা। বিশ্বাস না হয়, চল—ঐ একটি ভদ্রলোক শুয়ে আছে। ওর কাছে জিজ্ঞাসা করি।"

সকলেই তাহার কথায় সায় দিয়া, গোপালের নিকট আসিয়া, তাঁহার হস্তে একটি আংটি দিয়া কহিল, "মহাশয়, এ আংটিটির কি দাম আপনার পছন্দ হয়?"

গোপাল আংটিটি হাতে পাইয়া উঠিয়া বসিলেন, পরে আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ আংটি তোমরা কোথায় পেলে?"

গোপালের চক্ষু হইতে যেন জ্যোতি বাহির হইতে লাগিল। পূর্ব্বে মৃতের মতন ছিলেন, হঠাৎ যেন তাঁহার দেহে উৎসাহ বর্দ্ধন হইল। আংটিটি স্বর্ণলতার, গোপাল দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছেন।

নাবিকেরা তাঁহার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া চুপ করিয়া রহিল। যাহার আংটি, সে কহিল, "মশাই, কাল সন্ধ্যার পর আমি দুটি স্ত্রীলোককে পার ক'রে দিয়েছিলাম। তাদের পয়সা ছিল না। পয়সার বদলে আমারে এই আংটি দিয়েছে।"

নাবিকের কথা শুনিয়া গোপাল উঠিয়া দাঁড়াইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক কহিলেন, "তবে এখনও জীবিত আছে।" পরে আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসিলেন, "সে স্ত্রীলোক দুটি কোথায় গিয়েছে?" নাবিক কহিল, "শশাঙ্কশিকর ঠাকুরের চাকরাণীর মাসীর বাড়ী গিয়েছে।"

গোপাল কহিল, "এ আংটিটির দাম অতি কম হ'লেও ত্রিশ টাকা হবে। তোমরা কেউ যদি আমাকে সেই বাড়ী রেখে আসতে পার, তবে আমি আর পাঁচ টাকা দি।"

চারি জন নাবিক সকলেই কহিল, "আমি যাব, আমি যাব।" যে স্বর্ণলতাকে পার করিয়াছিল, সে কহিল, "তোরা কেউ যেতে পাবি নে। আমি সে বউটিকে পার করিছি, তার সোয়ামিকেও পার করবো।" নাবিক কেন স্বর্ণকে বউ মনে করিল, আর গোপালকেই বা কেন স্বর্ণের স্বামী ভাবিল, তাহা সেই নাবিকই জানে।

গোপাল তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। পার হইয়া নাবিক তাঁহাকে পথ প্রদর্শন করাইয়া লইয়া চলিল। খানিক দূর গিয়া নাবিক কহিল, "ঐ সে বাড়ী। আমার বকশিশ দাও।"

গোপাল নাবিককে যে পাঁচ টাকা দিবেন বলিয়াছিলেন, তাহা তদ্দণ্ডে প্রদান করিলেন। পরে দুই চারি পা সম্মুখে গিয়া স্বর্ণলতা ও তাঁহার কাছে আর একটি স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইলেন। গোপাল দ্রুতপদে তথায় গিয়া, "স্বর্ণ" বলিয়া ডাকিলেন। এবং স্বর্ণ তাঁহার নিকটে না আসিতে আসিতেই অজ্ঞান হইয়া ভুতলে পতিত হইলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

এই হইয়াছে

চেতনা পাইয়া গোপাল দেখিলেন, তিনি স্বর্ণলতার জানুর উপর শির স্থাপন করিয়া শয়ন করিয়া আছেন। স্বর্ণলতা দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তালবৃন্ত ব্যজন করিতেছেন এবং শশাঙ্কের দাসী নিকটে ঘটিতে জল লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিলে স্বর্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কেমন আছ? একটু ভাল বোধ হচ্ছে কি?"

গোপাল কহিলেন, "আমি কোথায় আছি?"

স্বর্ণ উত্তর করিলেন, "তুমি আমার কাছে আছ, আমি স্বর্ণ; এখন কি একটু ভাল বোধ হচ্ছে?"

গোপাল যেন সমুদায় স্মরণ করিয়া লইবার জন্য একটু চুপ করিয়া রহিলেন, পরে কহিলেন, "আমি ভাল হইছি।"

গোপাল স্বর্ণলতার জানু হইতে শির উত্তোলন করিলেন। গোপালের মনে

হইতে লাগিল, "এমন উপাধান পাইলে যাবজ্জীবন মূর্চ্ছিত হইয়া কাটাইতে পারি।"

আবার ক্ষণকাল পরে গোপাল চক্ষু মেলিলেন। স্বর্ণলতা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কেমন আছ ?"

গোপাল অতি অনিচ্ছাপূর্ব্বক আস্তে আস্তে মস্তক উঠাইয়া কহিলেন, "আমি ভাল হইছি। কিন্তু তুমি এখানে কেমন ক'রে এলে ?"

স্বর্ণলতা কহিলেন, "এখন তুমি সে কথা শুনতে পারবে না ; একটু পরে বলবো।" এই বলিয়া স্বর্ণলতা তথা হইতে উঠিয়া গেলেন। একটু পরেই পুনরায় গোপালের নিকট আসিয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া গমন করিলেন। স্বর্ণ বহু দিবস গোপালকে দাদা বলিয়া ডাকা ছাড়িয়াছেন। গোপাল মনে করিতেন, তিনি দরিদ্র বলিয়া স্বর্ণ তাঁহাকে আর দাদা বলিয়া সম্বোধন করেন না, কিন্তু স্বর্ণলতার জানুর উপরে শয়ন করা অবধি তাঁহার সে চিন্তা দূর হইয়া আর এক প্রকার চিন্তা উপস্থিত হইল। তিনি এক্ষণে আদ্যোপান্ত দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন। গোপালের আহ্লাদের আর সীমা রহিল না।

স্বর্ণলতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া দেখিলেন, ঘরের মধ্যে স্বর্ণলতা তাঁহার জন্য জলখাবার সাজাইয়া রাখিয়াছেন। গোপালকে স্বর্ণলতা সেই জলখাবার খাইতে কহিলেন।

গোপাল যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া বসিলেন। স্বর্ণলতা আদ্যোপান্ত আপনার ইতিহাস বর্ণনা করিলেন। স্বর্ণলতা কখন গোপালকে রাগ করিতে দেখেন নাই, কিন্তু অদ্য যখন তিনি শশাঙ্কের শঠতার কথা শ্রবণ করিলেন, তখন স্বর্ণ-লতা সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, তাঁহার নেত্রদ্বয় লোহিতবর্ণ হইল। দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত হইতে লাগিল, এবং দক্ষিণ হস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হইল। স্বর্ণলতার কথা শেষ হইলে গোপাল কহিলেন, "তবে আর আমার শশাঙ্কের মৃত্যুতে এক বিন্দুও দুঃখ নাই।"

স্বর্ণলতা জিজ্ঞাসিলেন, "শশাঙ্কের ঘরে কি রকম ক'রে আগুন লেগেছিল ?" গোপাল আরক্তিম মুখ অবনত করিয়া কহিলেন, "শুনলাম, লুচি ভাজতে ভাজতে সেই ঘৃত জ্বলে উঠে আগুন লেগেছিল।"

এই কথা বলিয়া গোপাল আপনার ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিলেন। স্বর্ণলতা যেই শুনিলেন যে, পাছে হেমের পীড়া বৃদ্ধি হয় বলিয়া গোপাল স্বর্ণের আসন্ন বিপদের কথা তাঁহাকে না জানাইয়া নিজে স্বর্ণের উদ্ধারার্থে বাহির হইয়া গেলেন, অমনি তাঁহার চক্ষু হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। গোপালের বর্দ্ধমানে গমন ও কারাবাসের কথা শুনিয়া স্বর্ণলতা পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল বেগে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

সে রাত্রে গোপালের ও স্বর্ণের কাহারও নিদ্রা হইল না।

পর-দিবস প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া শশাঙ্কের পূর্ব্ব দাসী ও স্বর্ণলতাকে

সমভিব্যাহারে লইয়া গোপাল বারাকপুর ষ্টেশনে গিয়া রেলওয়ে উঠিলেন। অবিলম্বে শিয়ালদহে পৌঁছিলেন এবং তথা হইতে গাড়ী করিয়া বকুলতলা ষ্ট্রীটে হেমের বাসায় উপস্থিত হইলেন।

হেম এক্ষণে চলিয়া বেড়াইতে পারেন। সকালে গাত্রোত্থান করিয়া বারাণ্ডায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে গাড়ী গিয়া দ্বারে উপনীত হইল। গোপাল অগ্রে বাহির হইলেন, হেম হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক গোপালের হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "তোমার ভবানীপুরে কি এমন কর্ম্ম ছিল যে, আজ তুমি তিন দিন সেইখানেই ব'সে আছ?"

গোপাল কথা, কহিবেন, এমন সময় গাড়ীর অভ্যন্তর হইতে শশাঙ্কের দাসী ভূমে অবতরণ করিল। হেম জিজ্ঞাসিলেন, "এ আবার কে?" হেমের প্রশ্ন শেষ হইতে না হইতে স্বর্ণলতা নামিলেন। হেম পূর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "স্বর্ণ কোথা হ'তে এলে? এস দিদি এস।" এই বলিয়া হেম স্বর্ণের কাছে গেলেন। স্বর্ণ কাঁদিতে কাঁদিতে হেমের হস্ত ধারণপূর্ব্বক গৃহের মধ্যে আসিলেন।

এক দিবস গোপাল ও হেম একত্র বসিয়া আছেন। হেম এক্ষণে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছেন। গোপালের চেহারা কিন্তু আর পূর্ব্বের মত নাই। হেম এত দিনের পর ইহার কারণ জানিতে পারিলেন, জানিতে পারিয়া হেমের যার-পর-নাই আহ্লাদ হইল। তিনি দেখিলেন যে, উভয়ের অনুরাগ উভয়ের প্রতি সমান, ইহাদিগের বিবাহ হইলে পরমসুখে কাল যাপন করিবে।

হেম ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "গোপাল, তোমাকে একটা কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে।"

গোপাল জিজ্ঞাসিলেন, "কি কথা?"

হেম কহিলেন, "তোমার সেই——————বৎসরকার পূজার সময়ের কথা মনে পড়ে?"

গোপাল কহিলেন, "হাঁ, পড়ে।"

হেম কহিলেন, "আচ্ছা, এক দিন তুমি আর আমি দালানের রোয়াকে বসেছিলাম, এমন সময়ে বাবা এসে তথায় বসলেন এবং একটু পরেই স্বর্ণলতার বিবাহের কথা উত্থাপন করলেন। সে কথা তোমার মনে আছে?"

গোপাল কহিলেন, "হাঁ, আছে।"

হেম। "স্বর্ণলতার বিবাহের কথা উত্থাপন হ'লে তুমি তথা হ'তে চলে যাচ্ছিলে। বাবা বল্লেন, তোমার উঠবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমি বল্লাম, তোমার শরীর অসুস্থ আছে। উঠে যাওয়াই ভাল। তাই শুনে তুমি মুখ বাঁকিয়ে উঠে গেলে। সে কথা মনে পড়ে?"

গোপাল লজ্জাবনতমুখে উত্তর করিলেন, "পড়ে।"

হেম কহিলেন, "আচ্ছা, এখন বলো দেখি, আমি উঠে যাওয়ার পোষকতা

করেছিলাম কেন ?"

গোপাল। আমি বলতে পারলাম না।

হেম কহিলেন, "পারলেও তুমি বলবে না। আমি বলি শোন। তোমার সহিত স্বর্ণের বিবাহ দেবার প্রস্তাব করবো ব'লেই তোমাকে আমি সরায়ে দিলাম। তুমি মুখ বক্র করলে, তা আমি দেখেছিলাম। কিন্তু কিছু বল্লাম না।"

গোপালের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি মাটির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তোমার সহিত স্বর্ণের বিবাহ দিতে বাবার এক মাত্র আপত্তি এই ছিল যে, তোমার ধন নাই। গোপাল, রাগ ক'রো না। আমি আমার কথা বলছি না। বাবা যা মনে করতেন, তাই বলছি। তাঁহার এক মাত্র আপত্তি এই ছিল যে, তোমার ধন নাই। তিনি যদি বেঁচে থাকতেন, তা হ'লে এত দিন আমি তোমার সহিত স্বর্ণের বিবাহ দেওয়াতাম। তাঁর কাল হয়েছে ব'লেই তোমাদের বিবাহের দেরি হয়ে পড়েছে। এখন আমার কথা এই, যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে তোমার পিতাকে চিঠি লিখে আনিয়ে তুমি স্বর্ণের পাণিগ্রহণ কর।"

হেমের কথা শুনিয়া গোপালের চক্ষু হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল। গোপাল কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। হেম কহিলেন, "আর তোমার কথায় কাজ নাই, আমি সব বুঝেছি। এখন তোমার বাপকে পত্র লেখ।"

গোপাল ও স্বর্ণলতার বিবাহ হইয়াছে।

শশিভূষণের মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। সত্য কথা বলিয়াছিলেন বলিয়া শশিভূষণ অব্যাহতি পাইয়াছেন। মুহুরি, হিসাবনবিস ও খাতাঞ্জি, প্রত্যেকেরই কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। শশিভূষণের সমুদায় সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে বিপিন, কামিনী ও তিনি গোপালের বাটীতে থাকেন।

প্রমদা পিত্রালয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁহার ভরণপোষণের ব্যয় গোপালকে দিতে হয়। এ জন্য গোপাল তাঁহাকে নিজ বাটী আনিবার জন্য যত্ন পাইয়াছিলেন। কিন্তু শশিভূষণ তাঁহাকে সে যত্ন হইতে নিরস্ত করিলেন। পিত্রালয়ে প্রমদার কাহারও সহিত বাক্যালাপ নাই। সকলেরই সহিত কলহ করিয়াছেন। কেবল মাত্র তাঁহার মাতার সহিত মাঝে মাঝে কথা কহেন।

বিধুভূষণ ডেপুটী কলেক্টর বাবুর নিকট হইতে আসিয়া বাটী বাস করিতেছেন। তাঁহার অল্প বয়সেই সমুদায় কেশ শুক্ল হইয়াছে। তাঁহাকে এক্ষণে শশিভূষণ অপেক্ষা বয়সে জ্যেষ্ঠ দেখায়। স্বর্ণলতার একটি পুত্র হইয়াছে। বিধুভূষণ সমস্ত দিবস সেই পুত্রটিকে ক্রোড়ে লইয়া খেলা দেন। স্বর্ণলতা আদর করিয়া পুত্রটির নাম ন্যাপাল রাখিয়াছেন।

হেমচন্দ্র বৎসরের মধ্যে ছয় মাস স্বর্ণলতার বাটীতে আসিয়া থাকেন। তিনি

যখন আসেন, তখন গোপালের ও স্বর্ণলতার আনন্দের সীমা থাকে না। একবার আসিলে হেমচন্দ্র সহজে আর নিজ বাটী গমন করিতে পারেন না। যদি তিনি কোন কারণবশতঃ নিয়মিত মাসে না আসিতে পারেন, তাহা হইলে স্বর্ণলতা ও গোপাল উভয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হন ও রাগ করেন।

শ্যামা বাটীর গৃহিণীস্বরূপ থাকেন। স্বর্ণলতা তাহাকে নিজের শাশুড়ীর ন্যায় ভক্তি ও যত্ন করেন।

নীলকমলের উপর বিধুভূষণের অত্যন্ত স্নেহ জন্মিয়াছিল। উভয়েই বড় দুঃখে প্রথমেই বাটী হইতে অর্থোপার্জ্জনে নিষ্ক্রান্ত হন। বিধুভূষণ এক্ষণে সুখী হইয়া নীলকমলকে সুখী করিবার জন্য তাঁহার বড় ইচ্ছা জন্মিল। কিন্তু নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, কোথাও নীলকমলের দেখা পাইলেন না।

—